মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

নারী ও সামাজিক অবিচার

গান্ধী স্মারক নিধি

• বাংলা •

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

নারী ও সামাজিক অবিচার

[মহাত্মা গান্ধী কৃত 'Women and Social Injustice'

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত

গান্ধী স্মারক নিধি

বাংলা

নবজীবন ট্রাস্টের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৫৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ১৯৬১
তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৪

প্রকাশক :
শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু,
সম্পাদক,
গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলা,
১৪, রিভারসাইড রোড,
পোঃ ব্যারাকপুর, (জিলা ২৪-পরগনা)

কলিকাতা শাখা :
প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

মূল্য : ৪·৫০

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীসুমুখ মিত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

গান্ধীজীর 'Women and Social Injustice' গ্রন্থের শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় কৃত অনুবাদ 'নারী ও সামাজিক অবিচার' কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে বিশেষ আদৃত হয়। অনুবাদক নিজব্যয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলা শাখার অনুকূলে এই গ্রন্থখানির স্বত্ব হস্তান্তর করে দিয়েছেন। মূল গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী নবজীবন ট্রাস্ট এই স্বত্ব-হস্তান্তর অনুমোদন করেছেন। উভয় পক্ষের লিখিত স্বীকৃতি লাভের পর আমাদের প্রকাশনা বিভাগ থেকে বইটিকে কিছু সংস্কার ও পরিমার্জনা করে নূতন আকারে প্রচার করা হল। ভরসা করি গ্রন্থের এই নবতন সংস্করণ তার পূর্ববর্তীর মতই পাঠকসাধারণ কর্তৃক আদরের সহিত গৃহীত হবে।

গান্ধীজীর বহুবিধ রচনা বিদ্যমান। তন্মধ্যে তাঁর নারীর ভাগ্যোন্নয়ন সম্বন্ধীয় রচনাবলীকে অগ্রপ্রাধান্য দেবার ও নতুন করে প্রচার করার একটা বিশেষ অর্থ আছে। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের মাতৃজাতির অবস্থা অবদমিত রেখে জাতির গঠনমূলক কোন পরিকল্পনাই প্রকৃত কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। দেশকে সুগঠিত করতে হলে নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দিতে হবে। গান্ধীজীর এই উপলব্ধির মূল্য স্বাধীনতা লাভের পর আরও একান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করেছেন, শুধু আইনগত ভাবে নয়, নারী ও পুরুষের সমানাধিকার কার্যতঃ স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত দেশের মঙ্গল নেই। এই গ্রন্থের বিভিন্ন নিবন্ধে নারী পুরুষের সেই আকাঙ্ক্ষিত সমমর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এ দেশের নারীজাতির সমস্যা গান্ধীজী কত গভীরভাবে ও কত বিভিন্ন দিক্ থেকে চিন্তা করেছিলেন, গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় বিকীর্ণ রয়েছে। গান্ধীজীর এই সমৃদ্ধ চিন্তার পরিচয় সর্বসাধারণের গোচর হলে জনসমাজ তদ্দ্বারা প্রভূত উপকৃত হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮ **শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু**

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

'নারী ও সামাজিক অবিচার' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রচারিত হল। বইখানি যে পাঠকসমাজে সবিশেষ আদৃত হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কালের মধ্যে এই সংস্করণান্তর তার প্রমাণ। এই জাতীয় গ্রন্থের নূতন সংস্করণ হওয়ার পক্ষে তিন বৎসর সময় খুব বেশী নয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তা বুঝবেন। ভরসা করি বর্তমান সংস্করণখানি পূর্ববর্তী দুই সংস্করণের মতই পাঠকসাধারণের আদরণীয় হবে।

১৫ই আগস্ট, ১৯৬৪

শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু

অনুবাদকের নিবেদন

রাজকুমারী অমৃত কাউরের ভূমিকার পর অনূদিত পুস্তক সম্বন্ধে আরো কিছু নিবেদন করিবার আছে মনে হয় না। তথাপি দুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

যে যুগ-পাবন মহাপুরুষের বাণী বাংলায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার অনুবাদ করার যোগ্যতা আমার নাই। ভারতের নবজীবনের প্রতিষ্ঠাতা তিনি. সব্যসাচীর ন্যায় দুই হাতে প্রাণপণে লোককল্যাণের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। উপেক্ষিত নারীজীবনের দুর্দশা যে ভারতের বহু অনর্থ ও দুঃখ-দুর্গতির মূলে গান্ধীজী তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেইদিকে ভারতের এবং জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণীগুলি নারীজীবনের নব-অভ্যুত্থানের সূচনা করিবে—যে অভুত্থানে বিদ্রোহের বর্বরতা নাই, যাহার মধ্যে সত্য ও শালীনতার অমৃতস্পর্শ মানবসমাজকে শ্রেয়ের পথে চিরকাল পরিচালিত করিবে।

গান্ধীজীর নারীজাতিসম্বন্ধীয় ইংরেজী প্রবন্ধগুলি যাহা 'Young India' এবং 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহা আহমদাবাদ নবজীবন ট্রাস্ট *Women and Social Injustice* নাম দিয়া গ্রন্থাকারে ছাপাইয়াছেন। উক্ত ট্রাস্টের অনুমতিক্রমে উহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

নারীর প্রতি মহাত্মা গান্ধীর কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং তাহাদের শক্তির উপর তাঁহার কিরূপ অটল বিশ্বাস ছিল, এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন।

তাঁহার ইংরেজী ভাষা বাইবেলের ভাষার মতো সরল, সতেজ, প্রাণস্পর্শী। মূলের সৌন্দর্য ও ভাব সর্বদা রক্ষা করিয়া তাহার অনুবাদ সহজসাধ্য নহে। অনুবাদের বহু ত্রুটীবিচ্যুতি রহিয়াছে, আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ আমার অক্ষমতা মার্জনা করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায়

নবজীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ

সূচীপত্র

রাজকুমারী অমৃত কাউরের লিখিত ভূমিকা

জগতের ইতিহাসে গান্ধীজীর ন্যায় কোন নেতাকেই তাঁহার জীবদ্দশায়, নিজদেশে বা পৃথিবীতে এত অধিকসংখ্যক লোককে তাঁহার অনুবর্তী করিতে দেখা যায় নাই। এবং ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়, অপর কোনও মানবই নারীজাতির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি এত গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ খুঁজিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। অপরের সহিত, বিশেষতঃ তাঁহার অনুবর্তিগণের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে মিশাইয়া লইবার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁহার।

প্রাচীন ভারতের অতুলনীয় কৃষ্টি এবং সমাজজীবনের অপূর্ব আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা একটি বিষাদের চিত্র দেখিতে পাই; আমরা বুঝিতে পারি, সেই সুখময় অবস্থা হইতে আমাদের পতন কত গভীর এবং ভারতীয় নারীজীবনের ধারায় সেই পতন যতটা ব্যাপক সম্ভবতঃ অন্য কোন ক্ষেত্রে তত নহে। পুরুষের সম-মর্যাদা-পরায়ণা, সহযোগিনী ও সঙ্গিনীর স্থান হইতে নারী আজ পুরুষের অধীন হইয়া, নিজের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া শুধু তাহার খেয়ালখুশির ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পুরুষের রচিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি নির্মমভাবে নারীজীবনকে নিষ্পেষিত করিতেছে। বস্তুতঃ এই অধীনতা জগদ্ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যজগতের "উন্নত" নারীগণ মাত্র সম্প্রতি বহু প্রচেষ্টার পর নিজেদের স্থান অধিকার করিতেছে এবং সেখানেও তাহারা যাহা চায়, তাহা এখনও সম্যক্ লাভ করিতে পারে নাই; কারণ কোনও কোনও দেশে এখনও তাহারা নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে।

ঐকান্তিক বিশ্বজনীন প্রেম এবং সর্বপ্রকারে ও সর্বক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচারের প্রতি অমননীয় বিমুখতা অল্পবয়সেই যে গান্ধীজীকে নারী-জাতির উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ইহাতে আশ্চর্যের বিষয়

কিছু নাই। তাঁহার প্রচারিত প্রত্যেকটি বিষয়ের অনুরূপ তিনি এই সংস্কারের সূত্রপাত করেন নিজের গৃহে। সত্যের ন্যায় কঠোর এবং নির্মম আত্মসমালোচক গান্ধীজী যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন তিনি "ক্রীতদাসীর অধিকারী"—এই ভাষায় তিনি নিজেই নিজেকে আখ্যাত করিয়াছিলেন—তখনই তাঁহার স্ত্রীর প্রতি তাঁহার ভাবের পরিবর্তন হইয়া গেল এবং তৎসঙ্গেই সমগ্র নারীজাতিকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি সমাজসংস্কারে সচেষ্ট হন। তাঁহার সুদীর্ঘ লোক-কল্যাণ-প্রচেষ্টায় আইন, অতীতের ইতিহাস, এমনকি ধর্মের নামে নারীর প্রতি যতপ্রকার অন্যায়-অবিচার করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার সবল লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন এবং সকল সভা-সমিতিতে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বাধ্যতামূলক বৈধব্য, পর্দাপ্রথা, মন্দিরে দেবদাসীর আত্মবিলোপ, গণিকাবৃত্তি, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নারীজাতির আর্থিক পরাধীনতা এবং বিবাহিত জীবনের দাসত্ববন্ধন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। "পুরুষ ও নারী সমমর্যাদার অধিকারী", "নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলি অনমনীয়। আমার মতে আইনতঃ এমন কোন বাধা বা অসুবিধা থাকিতে পারে না, যাহা পুরুষের নাই। আমি কন্যা ও পুত্রকে সম্পূর্ণ সমপর্যায়ে গণ্য করিব।" "যাঁহারা নারীজাতির স্বাধীনতাকে নিজেদের স্বাধীনতার ন্যায় মূল্যবান মনে করেন এবং যাঁহারা নারীকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা নারী-বিষয়ে স্মৃতির অনেক বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন না।" "মনুস্মৃতির কথিত উক্তি 'নারী কখনও স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না' (ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি) আমার নিকট অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না।"

অবজ্ঞাত নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ হইতে যে

কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করা গেল, যদি প্রমাণ আবশ্যক হয় তবে এইগুলিই যথেষ্টরূপে প্রমাণ করিবে নারীকে তাহার স্বাভাবিক ও যোগ্য অধিকারে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কতটা তীব্র।

তাঁহার নিজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং নিজ কর্মধারা নির্দেশকালে তিনি বালিকা ও নারীদিগকে সমদৃষ্টিতে দেখেন এবং সমান স্থান দিয়াছেন। সবরমতি, সেবাগ্রাম বা অন্যত্র তাঁহার সহিত যে সকল বালিকা ও নারী একত্রে বাস করিয়াছে বা তাঁহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, তাহারা স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিবেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছে—ইহা দেখিলে প্রাণ পুলকিত হয় এবং ইহা বর্তমান ভারতীয় সমাজে বিরল। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে নারীদিগকে সাফল্য অর্জন করিতে দেখিলে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ করেন। বয়নকারী সমিতি (The Spinners' Association) প্রকৃতপক্ষে একটি নারী-প্রতিষ্ঠান এবং তাঁহার কল্পনাপ্রসূত যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় ইহা তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তিনি নিরর্থক ইহার এইরূপ নামকরণ করেন নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে শুধু "বাপু"—বিজ্ঞ পিতা বলিয়াই দেখেন নাই, পরন্তু তদপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মাতারূপেই দেখিয়াছেন। তাঁহার সর্বজনীন স্নেহ ও ভালবাসা সকলের মন বুঝিতে পারে এবং সকলের ভয় ও বাধানিষেধের অন্তরায় দূরীভূত করিয়া দেয়।

"নারী ত্যাগ ও ধৈর্যের প্রতীক"—এই বাক্যদ্বারা তিনি আমাদের জাতিকে সর্বোৎকৃষ্টরূপে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তিনি নারীসমাজের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সমর্থন করিলেও এবং আমাদের অসুবিধা প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হইলেও, আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ

করিয়া ন্যায্য সমালোচনা করিতে বিরত হন নাই। জন্মনিরোধ-ব্যাপারে গান্ধীজীর লিখিত বিষয়ে নারী আন্দোলনের নেতৃবর্গের অনেকে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি সমস্যাটিকে উচ্চ নৈতিক ভিত্তির উপর রাখিয়া নারীগণকে কাচের বিনিময়ে তাহাদের জন্মগত অধিকার বিক্রয় না করিবার আবেদন জানাইয়াছেন; জন্ম-নিরোধযন্ত্রাদি ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি দ্বিধাশূন্যভাবে মতপ্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা নারীগণের পুনঃপুনঃ সন্তানপ্রসবের যন্ত্রণাবিষয়ে তাঁহার সহানুভূতির অভাব বুঝা যায় না। তাহার কারণ এই, তিনি জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারী যাহাতে তাহার নৈতিক বল না হারাইয়া বসে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়া থাকেন—যেহেতু এই নৈতিক চরিত্রবলই নারীজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এবং সর্বপ্রকার আক্রমণ ও প্রলোভনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার অমোঘ কবচস্বরূপ। কারণ তিনি আমাদিগকে যেমন বহু প্রশংসা করিয়াছেন, শিক্ষিত নারীসমাজ হইতে জাতীয় কল্যাণের বহু আশাও তিনি পোষণ করেন। তাঁহার মত এই—আমরা যদি আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করিতে পারি তবে পুরুষেরা বা পৃথিবীর কোন শক্তির অধীনতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা নারীগণ দুর্বলতর জাতি বলিয়া অভিহিত হইতে রাজী হইয়াছি, পুরুষের আশ্রয় না নিয়া আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে নিজদিগকে অক্ষম মনে করিয়াছি,—আমরা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছি, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পুরুষের সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নহি, পুরুষের মুখে নারীর দেহসৌন্দর্যের এবং আকর্ষণীশক্তির উচ্চপ্রশংসায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এইভাবে সমাজে আমাদের স্থান ও জীবনাদর্শ আমরা খর্ব করিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ আমরা স্বেচ্ছায় "জোর যার মুলুক তার" এই মত স্বীকার করিয়া লইয়াছি। গান্ধীজীর

চিন্তা ও কর্মের মূল উৎস—অহিংসা বা প্রেম। এইজন্য স্বাভাবিকভাবে তিনি এই অহিংসার পথই প্রদর্শন করিয়াছেন—তদ্দ্বারা শুধু নারীই তাহার নিজ শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিবে না, পরন্তু জগতের সকল অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হইবে। "যদি নারীগণ নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার ধারণা একবার ভুলিতে পারে তবে তাহারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করিতে পারে"—এই কথা ১৯৩২ সালে তিনি প্যারীনগরীর নারীগণকে বলিয়াছিলেন এবং পুনরায় সুইজারল্যাণ্ডে বলিয়াছিলেন, "আপনারা ইউরোপের নারীগণের প্রতি যে বাণীর জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছেন, আমি জানি না আমার সেই বাণী দেওয়ার সাহস আছে কিনা। তাহাদের রোষভাজন না হইয়া যদি আমাকে তাহা করিতে হয় তবে আমি তাহাদিগকে যে সকল ভারতের নারী গত বৎসর একযোগে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাদের নিকট যাইতে বলিব এবং ইহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি যে ইউরোপ যদি অহিংসার শিক্ষাগ্রহণ করিতে চায় তবে ইউরোপের নারীগণের ভিতর দিয়াই তাহা সাধিত হইবে।" হায়! এই উপদেশ প্রস্তরময় ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। ফলে আজ ইউরোপ রক্তে স্নাত হইয়া হিংসা ও বিদ্বেষের ভয়াবহ দাবানলে দগ্ধ হইতেছে। গান্ধীজী ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারীকে অহিংস-নীতি অবলম্বনের ক্ষেত্র প্রদর্শন করিরাছিলেন; এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, ভারতে নারীজাগরণের পক্ষে যতগুলি বিষয় সহায়তা করিয়াছিল তন্মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইয়াছিল। অবিচলিতচিত্তে অগ্নিময় পরীক্ষা-কুণ্ডের সম্মুখীন হইবার জন্য উহা শত সহস্র নারীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের গৃহের অবরুদ্ধ অন্ধকার কোণ হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করে যে, অমঙ্গল বা অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার

শক্তিতে নারী পুরুষের সমকক্ষ। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকটও ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, বিনা অস্ত্রে প্রতিরোধ শুধু সমভাবে ফলপ্রসূ হয় নাই, বরং প্রতিরোধকারী ও প্রতিরুদ্ধ উভয়ের পক্ষেই উহা অধিকতর উন্নত মানবতার পরিচয় দিয়াছে। অন্ততঃ ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে ইহা নারীকে বিশিষ্ট স্থান প্রদান করিয়াছে।

বর্তমানে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরী। যাঁহারা অহিংস-নীতিতে আস্থাবান এবং উহাকে সাফল্য লাভের সরল ও সঙ্কীর্ণ পথ বলিয়া বিবেচনা করেন, গান্ধীজীর বাণী তাঁহাদিগকে সদলবলে তাঁহার অনুবর্তী হইয়া মিলিত হইবার জন্য উদাত্ত সুরে আহ্বান করিতেছে। মাত্র সেই দিন তিনি কতিপয় বন্ধুর সহিত জাতির সম্মুখে প্রস্তাবিত গঠনমূলক কার্যপ্রণালী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অহিংস-নীতিই স্বরাজ অর্জন করিবার সুনির্দিষ্ট উপায় এবং তাহাতে নারীর অবদান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় আশা নারীগণের উপর। তাহাদিগকে যে কূপে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে হইলে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার লোকের প্রয়োজন। অতি সামান্য বিষয় আশ্চর্যজনক ফল উৎপাদন করিবে। ১৯৩১-৩২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাহাদের অবদান বিশেষ প্রশংসনীয়। এখনও তাহারা তাহাদের কাজ উন্নত মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া করিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে না। বলিতে গেলে, তাহাদের ভিতর বিশেষ কাজ কিছুই করা হয় নাই। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অহিংস প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত দুঃখকষ্ট সহিবার ক্ষমতা তাহাদের প্রচুর। তাহারা নীরবে সকল প্রতিকূলতা সহ্য করিয়া যাইবে।" আমরা কি সেই আশা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি?—ইহাই প্রশ্ন। দেশ ও জগতের জন্য, পরন্তু নিজেদের জন্য, যাঁহারা

সহায়তা করিবার উপযুক্ত স্থানে আছেন তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিবেন কি ?

নারীজাতির বিষয়ে গান্ধীজীর বাণী ও লেখা মানবের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়তন্ত্রীতে সহানুভূতির উদ্রেক করিবে, এমনকি ঘোর রক্ষণশীল ব্যক্তিকেও উহা বিচলিত করিবে। কিন্তু সেগুলি মুখ্যতঃ নারীজাতির উদ্দেশ্যেই কথিত এবং লিখিত হইয়াছে ; কারণ নারীজীবনের প্রত্যেক বিভাগের সহিত সেগুলির সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং দুঃখকষ্ট ও বিপদের মধ্যেও নারীকে তাহার গন্তব্য লক্ষ্যে উপনীত হইতে অব্যর্থরূপে সহায়তা করিবে। সর্বোপরি, এই সকল বাণী নারীকে তাহার নিজ জাতির, দেশের ও মানবমাত্রেরই ঐকান্তিক আপ্রাণ সেবার জন্য আহ্বান করিতেছে। এই মানসিক ভাব লইয়া প্রত্যেক নারী এই পুস্তক পাঠ করিবেন। যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত আমাদিগকে করিতে হইবে। আমরা যেন জ্ঞানে ও শক্তিতে যাহা ভাল তাহা বাছিয়া লইতে পারি এবং তাহা হইলে গান্ধীজীর বাক্যানুযায়ী আমাদের মধ্যে "সীতা, দময়ন্তী এবং দ্রৌপদীর ন্যায় পূতচরিত্রা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মসংযমী নারীগণ" আবির্ভূত হইবেন। অতীতের অমর-আদর্শ নারীগণের ন্যায় যুগে যুগে তাঁহারা সমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করিবেন।

(অনূদিত)

বার্দোলি,
জানুয়ারী ১৯৪২

উৎসর্গপত্র

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়ক
মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ সেবক ও ভক্ত
শ্রীমদ্‌ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহানুভবের
করকমলে অর্পিত হইল।

নারী-জীবনের নবজাগরণ

[মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯১৮ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই 'ভগিনী-সমাজের' বাৎসরিক অধিবেশনে গুজরাটী ভাষায় প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণের সহজ ইংরেজী অনুবাদের মর্ম বাঙ্গালা ভাষায় দেওয়া গেল।]

নারী-সমাজের উন্নতি-সাধন বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা জানা আবশ্যক। উন্নতির কথা বলিলেই অবনতি ঘটিয়াছে বুঝা যায় এবং তাহা হইলেই আমাদের আরও বিবেচনা করিতে হয়, কি কারণে এবং কি ভাবে সেই অবনতি ঘটিল। এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, বর্তমানে যে সব আন্দোলন চলিতেছে তাহা জনসাধারণের অতি ক্ষুদ্রতম অংশেই নিবদ্ধ। বিশাল আকাশের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে উহা একটি বিন্দুর মতো। কোটি কোটি নর-নারী এই আন্দোলনের তিলমাত্রও জানে না। এই দেশের শতকরা ঠিক পঁচাশি জন লোক তাহাদের চারিদিকে কি ঘটিতেছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া নিরীহভাবে তাহাদের জীবন কাটাইয়া দেয়। এই সকল অজ্ঞ নর-নারী তাহাদের আপনাপন কাজগুলি নিখুঁত ভাবেই করিয়া যায়। উভয়ের শিক্ষা বা শিক্ষার অভাব একই প্রকারের। একে অন্যকে যথাযথরূপেই সাহায্য

করিতেছে। তাহাদের জীবন যদি কোনরূপে অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, বাকী শতকরা পনের জনের জীবনের অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। 'ভগিনী-সমাজের' আমার ভগিনীগণ যদি আমাদের জনসাধারণের এই শতকরা পঁচাশি জনের জীবনের ধারা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, নারী-সমাজের উন্নতি বিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নিরূপণ করিবার যথেষ্ট উপকরণ তাহার মধ্যে পাইবেন।

আমি যে সকল উক্তি করিতে যাইতেছি তাহা উক্ত শতকরা পনের জন সম্বন্ধেই। তাহা হইলেও নারী ও পুরুষের সাধারণ অসুবিধাগুলির আলোচনা করা এক্ষেত্রে অবান্তর হইবে। আমাদের বিবেচ্য বিষয়, পুরুষদের সহিত তুলনায় নারী-সমাজের উৎকর্ষ সাধন। আইন-কানুন অধিকাংশই পুরুষের হাতে গড়া এবং স্বয়ংপ্রণোদিত ব্যবস্থায় পুরুষ সব সময় ন্যায় ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় নাই। আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির যে সকল দোষ প্রকৃতিগত ও মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে, নারীগণের উৎকর্ষসাধনকল্পে আমাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টা সেই সেই দোষগুলি দূর করিবার জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে। সেই চেষ্টা কে করিবে এবং কিরূপে করিবে ? আমার বিনীত মত এই যে, সেই চেষ্টা করিতে হইলে আমাদিগকে তৈয়ারি করিতে হইবে সীতা দময়ন্তী এবং দ্রৌপদীর মতো পূতচরিত্রা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মসংযমশীলা নারী। সেইরূপ নারী-জীবন গঠন করিতে পারিলে এই সকল ভগিনীরা অতীতযুগের তাহাদের আদর্শস্থানীয়া নারীগণের মত হিন্দুসমাজ হইতে অনুরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন

করিতে পারিবে। তাহাদের কথার শক্তি শাস্ত্রবাক্যের ন্যায় বলবৎ হইবে। স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাদের সম্বন্ধে এখানে-সেখানে যে সকল অশ্রদ্ধেয় ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেগুলির জন্য আমরা লজ্জিত হইব এবং সমাজচিত্ত হইতে তাহা শীঘ্রই মুছিয়া যাইবে।

অতীতে হিন্দুধর্মে এরূপ যুগপরিবর্তন ঘটিয়াছে ; ভবিষ্যতেও তাহা ঘটিবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের ধর্মবিশ্বাস আরো নির্মল, আরো দৃঢ় হইবে। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন এই সমিতি শীঘ্রই এই শ্রেণীর নারীজীবন গঠনে সমর্থ হয়।

আমাদের নারীগণের অবনতির মূল কারণ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এবং যে আদর্শ অনুসরণ করিলে তাহাদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি করা যায়, তাহাও বিবেচিত হইয়াছে। সেই সকল আদর্শ জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারে এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা স্বভাবতঃ খুব অল্পই হইবে। সেইজন্য এখন আমরা আলোচনা করিব চেষ্টা করিলে সাধারণ স্ত্রীলোক কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদের প্রথম চেষ্টা হইবে, যত বেশী সংখ্যক সম্ভব স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের বর্তমান দুর্গতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা। শুধু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষাদ্বারা এইরূপ চেতনা জাগানো যাইতে পারে, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে নহি। কেবল লেখাপড়া শিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইলে আমাদের উদ্দেশ্যসাধন অনিশ্চিতভাবে পিছাইয়া যাইবে ; প্রতি পদে আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে অতি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। প্রথমে লেখা-পড়ার ভিতর দিয়া কোন শিক্ষা না দিয়াও আমরা আমাদের

নারী-সমাজকে তাহাদের বর্তমান দুর্গতির বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি। সমান মানসিক শক্তি লাভ করিয়া নারী পুরুষের সহচরী হইবার মর্যাদা লাভ করে। পুরুষের কার্যাবলীর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের যতখানি অধিকার, তাহারও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। তাহার নিজ কর্মের পরিবেশের মধ্যেও নারী সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারিণী, যেমন পুরুষ তাহার নিজ কর্মক্ষেত্রে পাইয়া থাকে। ইহাই হওয়া উচিত স্বাভাবিক অবস্থা.—শুধু লেখাপড়া শিখিবার ফলরূপে নয়। কেবল কুপ্রথার বলে নিতান্ত মূর্খ ও অপদার্থ পুরুষগণও নারীদিগের এরূপ প্রভুত্ব উপভোগ করিতেছে, যাহার যোগ্যতা তাহাদের নাই এবং যাহা তাহাদের থাকাও উচিত নয়। আমাদের নারীগণের হীন অবস্থার জন্যই আমাদের অনেক আন্দোলনের গতি মধ্যপথে থামিয়া যায়। অনেক অনুষ্ঠান ফলপ্রসূ হয় না ; যে ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ে যথেষ্ট মূলধন খাটায় না, সেই অতিচতুর ও গণ্ডমূর্খ ব্যবসায়ীর অদৃষ্টের ন্যায়ই আমাদেরও তেমন পরিণাম ঘটে।

কিন্তু যদিও লিখন, পঠন ও অঙ্ককষা এই তিন বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া অনেক ভাল ও হিতকর কার্য করা সম্ভবপর, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত সব সময় আমাদের চলে না। এই জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত ও তীক্ষ্ণ করে এবং ভাল কাজ করিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয়। এই তিন বিষয়ের জ্ঞানের মূল্য আমি কখনও অস্বাভাবিকরূপে

বেশী দেই না ; আমি শুধু ইহার যথাযথ স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সময় সময় ইহা আমি প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, নিরক্ষরতার দোহাই দিয়া নারীগণকে সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোন সঙ্গত যুক্তি পুরুষের নাই। কিন্তু তাহাদের এই সকল স্বাভাবিক অধিকার দাবী করিবার এবং সেগুলি বুদ্ধিমত্তার সহিত পরিচালনা করিবার এবং সেগুলি আরও বাড়াইবার ক্ষমতা অর্জন করিবার জন্য নারীগণের শিক্ষালাভ করা অত্যাবশ্যক ; এবং এইরূপ শিক্ষা ব্যতীত লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে তাহাদের নিজের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করাও অসম্ভব। অনেক বই পাঠ করিয়া আমরা নির্দোষ আমোদ লাভ করিতে পারি, কিন্তু লেখাপড়া না জানিলে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইব। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে শিক্ষাবিহীন মানব ও পশুর মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নয়। কাজেই শিক্ষা পুরুষের ও নারীর পক্ষে সমান প্রয়োজন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, উভয়ের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় ও প্রণালী ঠিক একই রকম হইবে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় প্রবর্তিত শিক্ষার পদ্ধতি ভ্রমপূর্ণ এবং অনেক বিষয়ে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। পুরুষ ও নারীদিগের পক্ষে এই শিক্ষা বর্জনীয় হওয়া উচিত। এই শিক্ষার বর্তমান দোষগুলি বিদূরিত হইলেও আমি ইহাকে সব দিক দিয়া নারীগণের পক্ষে উপযুক্ত মনে করিব না। পুরুষ ও নারী স্বকীয় মর্যাদা ও অধিকারাদি সম্বন্ধে সমান হইলেও তাহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহারা একে অন্যের সহায়কারী এক অতুলনীয় যুগল ; একে অন্যের সহযোগিতায় পূর্ণতা লাভ

করে এবং সেইজন্য একজন না থাকিলে অন্যজনের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না ; ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয় যে, যাহা কিছু এক পক্ষের অধিকারাদি ব্যাহত করে তাহা উভয়ের সর্বনাশ সমানভাবে আনয়ন করিবে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে কোন পরিকল্পনা তৈয়ারি করিবার সময় এই মৌলিক সত্যটি অবশ্যই সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। দম্পতিযুগলের বহির্জগতের কার্যাবলী সম্বন্ধে পুরুষই সর্বেসর্বা এবং সেইজন্যই এই সকল বিষয়ে তাহার অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অপর পক্ষে পারিবারিক জীবনের কার্যাবলী সর্বতোভাবে নারীর প্রভাবের অন্তর্গত এবং সেইজন্য গৃহস্থালী এবং সন্তানগণের লালন-পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে নারীদিগের সমধিক জ্ঞান থাকা উচিত। ইহা বুঝিতে হইবে না যে, জ্ঞান নির্দিষ্ট কোন সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিবে অথবা জ্ঞানের কোন কোন শাখা কাহারও অপরিজ্ঞাত থাকিবে ; কিন্তু যদি শিক্ষার ব্যবস্থা এই সকল মৌলিক নীতির বিশ্লেষণ ও যথাযথ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে পুরুষ ও নারীর পূর্ণ জীবন বিকশিত হইতে পারে না।

আমাদের মেয়েদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য আমাদের স্ত্রী ও পুরুষদিগকে যে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতেই হইবে এমন নয়। ইহা সত্য, জীবিকা উপার্জনের জন্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের জন্য ইংরাজী জানা প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি না যে, মেয়েদের

জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করিতে হইবে অথবা তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যাইবে। যে কয়েকজন অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছা করেন, অথবা যাঁহাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে, তাঁহারা পুরুষদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে খুব সহজেই তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। স্ত্রীলোকদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করিলে আমাদের নিরুপায় অবস্থার মিয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। আমি প্রায়ই পাঠ করিয়াছি এবং লোককে বলিতে শুনিয়াছি যে, ইংরাজী সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার স্ত্রীপুরুষ সকলেরই জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এইরূপ মনোবৃত্তির ভিতর কিছু বুঝিবার ভুল আছে। পুরুষের জন্য ঐ রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া স্ত্রীলোকের জন্য তাহা বন্ধ করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তোমাকে সারা পৃথিবীর সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে বাধা দিতে পারে, যদি তোমার সেদিকে অনুরাগ থাকে। কিন্তু যখন শিক্ষার ধারা কোন সমাজবিশেষের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিকল্পিত হয়, সাহিত্যানুরাগী মুষ্টিমেয় লোকের প্রয়োজন সেই শিক্ষা-ব্যবস্থায়' তখন তুমি মিটাইতে পার না। আমাদের স্ত্রী ও পুরুষদিগকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য বর্তমান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় ব্যয় করিতে বলার আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁহারা উহা হইতে সম্ভবতঃ যে আনন্দ লাভ করিবেন তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হউন। কিন্তু আমি এই মত পোষণ করি যে, যদি আমরা আরও স্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করি,

তবে তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং অল্প আয়াসে সেই আনন্দ লাভ করিতে পারি। পৃথিবীর সাহিত্য সুন্দর সুন্দর অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ; কিন্তু এই সকল ভাবসম্পদ্ সবই ইংরেজী সাহিত্যের ছাঁচে গড়া নয়। অন্যান্য ভাষাও অনুরূপ উৎকৃষ্ট সাহিত্যের গর্ব যথেষ্ট করিতে পারে; আমাদের সাধারণ লোকেরা যাহাতে এইগুলি সমস্তই পাইতে পারে তাহা করিতে হইবে এবং যদি আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষিত সমাজ নিজ নিজ ভাষায় সেগুলির অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন তবেই তাহা সম্ভব হয়।

শুধু শিক্ষার একটি উক্তরূপ পরিকল্পনা করিলেই আমাদের সমাজ হইতে বাল্যবিবাহের ব্যাধি দূরীভূত হইবে না অথবা আমাদের নারীগণকে সমান অধিকার প্রদান করা হইবে না। এখন আমরা সেই সকল মেয়েদের বিষয় বিবেচনা করিব যাহারা বলিতে গেলে বিবাহের পর বহির্জগত হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহারা সম্ভবতঃ বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিবে না। অতি অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দিবার পাপ অর্জন করিয়া তাহাদের মায়েরা পরবর্তীকালে তাহাদের পাপাচরণ সম্বন্ধে অবহিত হইলেও, তাঁহারা কন্যাদিগকে আর শিক্ষা দিতে পারেন না অথবা তাহাদের নিরানন্দ জীবনকে অন্যরূপে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারেন না। যে পুরুষ একটি অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করেন, তিনি কোন মহান্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহা করেন না,—নিছক ভোগবৃত্তির বশীভূত হইয়াই করেন। এই সকল বালিকাদিগকে কে রক্ষা করিবে? এই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব পাইলে স্ত্রীলোকদের সমস্যারও সমাধান হইবে।

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাই একমাত্র সম্ভবপর উত্তর। অবশ্য তাহার স্বামী ছাড়া এ বিষয়ে তাহাকে সহায়তা করার আর কেহ নাই। একটি বালিকাবধূ তাহার স্বামীকে পথে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে, ইহা আশা করা বৃথা। অতএব এই কঠিন কাজ আপাতত কিছুকাল পুরুষের উপরই ফেলিতে হইবে। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হইত, তবে বালিকাবধূগণের সংখ্যা গণনা করিতাম এবং তাহাদের স্বামীদের সন্ধান নিতাম এবং তাহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে বালিকাবধূগণের সহিত তাহাদের অদৃষ্ট জড়িত করিয়া তাহারা কি ভীষণ অপরাধ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতাম যে যতদিন পর্যন্ত শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের পত্নীগণকে সন্তানধারণ ও সন্তানদিগকে উপযুক্তরূপে লালনপালন করিবার জন্য সমর্থ করিয়া তুলিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না এবং সেই সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচারীর ন্যায় সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে।

'ভগিনী-সমাজের' সভ্যদের সম্মুখে আত্মনিয়োগের বহু ফলপ্রসূ কর্মক্ষেত্র মুক্ত রহিয়াছে। সেই কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই ক্ষেত্রে মনোনিয়োগ করা যায় তবে সমাজসংস্কার বিষয়ে বড় বড় আন্দোলনগুলি বর্তমানে স্থগিত রাখিয়া, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক কাজ করা যায়; এবং সেই সম্বন্ধে মৌখিক কিছু বলিবার আবশ্যকতাও হয় না। যখন ছাপাখানার অস্তিত্ব ছিল না, বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার

করার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ ছিল, এবং বর্তমানে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার মাইল ভ্রমণের স্থলে যখন দিনে মাত্র ২৪ মাইল অতিকষ্টে ভ্রমণ করা সম্ভবপর হইত, তখন আমাদের আদর্শ-সকল প্রচার করিবার একটিমাত্র উপায় ছিল, আমাদের নিত্য-দিনের অনুষ্ঠানগুলি নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করা ; তাহার ফল অমোঘ। আমরা বর্তমানে যতই বায়ুবেগে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছি, বক্তৃতা দিতেছি, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ততই আমরা আমাদের আদর্শ হইতে বহুদূরে গিয়া নিরাশার ক্রন্দনে বায়ুমণ্ডল ব্যথিত করিয়া তুলিতেছি। অন্ততঃ আমার এই ধারণা যে, বর্তমান কালে আমাদের প্রতিদিনের নিখুঁত কর্মানুষ্ঠানগুলি অতীতের ন্যায় জনমনের উপর বহুসংখ্যক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে অধিকতর কার্যকর হইবে। আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা এই—তোমাদের এই 'ভগিনী-সমাজের' সভ্যগণ যাহা কিছু অনুষ্ঠান করুন, তাহা যেন নীরব নিষ্কাম আড়ম্বরহীন কর্মের মাহাত্ম্য লাভ করে।

২

নারী-জীবন স্বপ্রতিষ্ঠ কর

মাদ্রাজের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ডাঃ এস্. মথুলক্ষ্মী রেড্ডি (Dr. S. Mathulaksmi Reddi) আমার অন্ধ্র দেশের বক্তৃতাগুলিকে ভিত্তি করিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। তাহা হইতে নিম্নের কৌতূহলজনক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বেজোয়াড়া হইতে গুণ্টুর ভ্রমণকালে আমাদের লোকদের প্রাত্যহিক আচারব্যবহারের এবং সংস্কারাদির উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যগুলি আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।

"আমার বিনীত নিবেদন এই যে, মেয়ে ডাক্তার হিসাবে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আপনার সম্মতি নিয়া বলিতে চাই যে, যদি শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সংস্কার, জনসাধারণের উন্নততর স্বাস্থ্যবিধানে সহায়তা করে, তবে এই ফল লাভ করিতে গেলে একমাত্র নারীগণের শিক্ষার দ্বারাই নারী-সমাজের উন্নয়ন সম্ভব।

"বর্তমান সামাজিক পরিবেশে আপনি কি মনে করেন না যে খুব কম নারীই শিক্ষার, শরীর ও মনের পূর্ণতা লাভের এবং সর্বাঙ্গীণ আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া থাকেন?

"আপনি কি মনে করেন না লোকাচার এবং কৌলিক অন্ধসংস্কারের চাপে তাহাদের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে?

"বাল্য-বিবাহ কি শারীরিক, মানসিক, এমনকি আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার বিকাশের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে না ?

"বালবধূ ও শিশুমাতাগণের দারুন যাতনা এবং সমাজের বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীগণের দুর্বহ দুঃখরাশি কি আশু প্রতিকারের অপেক্ষা করে না ?

"ধর্মের নামে যে কুপ্রথা অল্পবয়স্কা নির্মল কুমারীদিগকে অধঃপাতিত ও পাপপঙ্কিল জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে, হিন্দু-সমাজের পক্ষে সেগুলি অনুমোদন বা উপেক্ষা করিবার কোন যুক্তি আছে কি ?

"আপনি কি ইহা মনে করেন না যে সামাজিক অত্যাচারের ফলে যে শক্তি ও সাহস, যে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা প্রাচীন ভারতে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী প্রমুখ নারীগণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, এবং যাহা আজও ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, থিওজফিসমাজভুক্ত বহু নারীকে প্রবুদ্ধ করিতেছে, তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত ভারতের নারী-সমাজে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ? এই শেষোক্ত সমাজগুলি তো অর্থহীন প্রথা, গতানুগতিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং আচারাদির শৃঙ্খলমুক্ত হিন্দুধর্মই বটে।

"জাতীয়দলের সভ্যগণ (আমি কংগ্রেসের কথাই বলিতেছি) কি এই সকল সামাজিক ব্যাধির আশু প্রতিকারের জন্য জ্বলন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবেন না ? এই ব্যাধিগুলিই তো আমাদের জাতীয় দুর্বলতার মূলে নিহিত এবং বর্তমান অবনতির একমাত্র কারণ। অথবা যে দাসত্ব-শৃঙ্খল নারীগণকে

পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে নারী-সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য জনসাধারণকে অন্ততঃ শিক্ষিত করিতে দেশসেবকগণ কি বদ্ধপরিকর হইবেন না? ইহা করিতে পারিলে নারীগণ তাহাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিবে, সাহস এবং বিচার-বিবেকের বিশেষ পরিচয় দিবার সুযোগ পাইবে; সর্বোপরি স্ত্রীরূপে এবং মাতারূপে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ন্তাগণের চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নত করিয়া জাতীয় জীবন গঠনের, পরিচালনের এবং শিক্ষার পবিত্র কর্তব্য প্রকৃষ্টরূপে নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে।

"যদি কংগ্রেসের সভ্যগণ ইহা বিশ্বাস করেন যে স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার এবং যদি তাঁহারা সেই স্বাধীনতা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিয়া অর্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাঁহারা কি সর্বপ্রথমেই তাঁহাদের নারীগণকে কুপ্রথা ও কুলগত কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন না? এই সকল অত্যাচার ও কুসংস্কার তাহাদের সর্বতোমুখী পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং এই সভ্যগণের হাতেই প্রতিকারের উপায় রহিয়াছে।

"আমাদের কবি, সাধু ও সন্ন্যাসিগণ ঐ একই সুরে গাহিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন 'যে জাতি ও যে দেশ নারীকে সম্মান করে না সেই জাতি ও সেই দেশ কখনও বড় হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। তোমাদের জাতি যে এতটা অবনত তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমরা

মহাশক্তির জীবন্ত প্রতীক—নারীগণকে কোন সম্মান প্রদর্শন কর না। যদি দেবমাতৃকার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি স্বরূপ নারীগণকে উন্নত না করিতে পারো তবে ইহা জানিও যে তোমাদের উন্নত হইবার অন্য উপায় নাই।'

"স্বর্গীয় গুণালঙ্কৃত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীও একই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

"কাজেই আমি বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনার ভ্রমণকালে স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত এবং সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য আমাদের পুরুষগণকে প্রবুদ্ধ করুন।"

উক্ত প্রশ্নগুলির প্রত্যুত্তরে এই বলা যায়—

কংগ্রেসসেবিগণ এই দায়িত্বভার তাঁহাদের স্কন্ধে নিবেন এই আশা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ডাক্তার মথুলক্ষ্মীর রহিয়াছে। অনেক কংগ্রেসসেবিগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এই দিকে বহু কাজ করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায়, অনেক গভীর দেশে এই সকল ব্যাধির প্রকৃত মূল নিহিত। কেবল স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থার দোষেই যে এই সকল গলদ দেখা যায়, এমন নহে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলনীতি সবটাই কলুষিত, বিকৃত আদর্শ দ্বারা পরিচালিত। পক্ষান্তরে সামাজিক বিশেষ বিশেষ রীতিনীতির কেবল দোষ প্রদর্শনের দ্বারা

আমাদের সামাজিক ব্যাধির উপশম সম্ভব নয় ; এই ব্যাধির মূলে রহিয়াছে আমাদের মানসিক জড়তা—দোষ ত্রুটি দেখিয়া তাহার প্রতিকারচেষ্টাতে আমরা সর্বদাই বিমুখ থাকি। স্বীকৃত ব্যাধি সংস্কারের প্রয়োজন সত্ত্বেও যে প্রেরণা অচল অবস্থায় থাকে, ইহা তাহাই। এবং সর্বশেষ ভারতের অমিত জনসংখ্যার শতকরা পনের জন, যাহারা শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, তাহাদের সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি খাটে। গ্রামবাসী জনগণের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই এবং বিধবাবিবাহের প্রতিকূলে কোন নিষেধও দেখা যায় না। ইহা সত্য যে তাহাদের অন্যান্য ব্যাধি আছে এবং সেগুলি দ্বারা তাহাদের উন্নতি প্রতিহত হয়।

কিন্তু প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট করিয়া জনসাধারণের উপযোগী আর একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত করা। শিশুগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে নিরক্ষর যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধজনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপ একদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা কোনও মতে চলনসই হইতে পারে না। অধিকন্তু যে শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার স্বাভাবিক সর্বোচ্চস্থান নাই, তাহা সমস্যা সমাধানের সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে না। বর্তমান শিক্ষিত সমাজ যেরূপ অবস্থায় রহিয়াছে, শুধু তাহার সাহায্যেই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। কাজেই ব্যাপকভাবে সংস্কার করিতে হইলে শিক্ষিতসমাজের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার মথুলক্ষ্মীকে

আমি এই বলিতে চাই,—যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিতা মহিলাগণ ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যশিক্ষার শিখরদেশ হইতে ভারতের সমতলভূমিতে নামিয়া আসিতে হইবে। নারীর প্রতি অবহেলা এবং তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য পুরুষগণ নিঃসন্দেহরূপে দোষী এবং তাহাদিগকেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; কিন্তু যে সকল নারী কুসংস্কার বর্জন করিতে পারিয়াছেন এবং এই অন্যায় অবিচার সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই গঠনমূলক শিক্ষাসংস্কার-কার্য করিতে হইবে। নারীগণের মুক্তি, ভারতের শৃঙ্খলমোচন, অস্পৃশ্যতানিবারণ, জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এবং অনুরূপ সমস্যা-সকলের সমাধান করার অর্থই হইতেছে,—শিক্ষিত সমাজের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া পল্লীজীবনের পুনর্গঠন ও সংস্কার-সাধনের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টাপরায়ণ হওয়া।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৫-'২৯]

৩

সমাজে নারীর স্থান

একজন চারুশীলা বন্ধু, যিনি এযাবৎ দাম্পত্যজীবনের প্রলোভন কৃতকার্যতার সহিত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, লিখিতেছেন ঃ—

"গতকল্য মালবারী হলে একটি নারীসম্মিলনের অধিবেশন হয়। সেই সভায় অনেক সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপরাহ্নে আলোচ্য বিষয় ছিল সারদা আইন (Sarda Bill)। আপনি মেয়েদের বিবাহের বয়স আঠারো হইবে এই মত পোষণ করেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি। অপর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবে উত্তরাধিকারের আইন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। এই বিষয়ে 'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা দুটিতে যদি আপনি একটি কড়া প্রবন্ধ লিখিতেন তবে কত উপকার হইত। জন্মগত অধিকার লাভ করিবার জন্য নারীগণকে ভিক্ষা চাহিতে বা বিবাদ করিতে হইবে কেন? মায়ের সন্তান হইয়া পুরুষগণ যখন উচ্চ কণ্ঠে নারীদিগকে "দুর্বলতর জাতি" বলিয়া অভিহিত করেন এবং উদারতার সহিত তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য "দান করিতে" আশ্বাসবাণী প্রচার করেন, তখন সে সব শুনিতে কেমন অদ্ভুত ঠেকে এবং উহা মর্মান্তিক উপহাস বলিয়াও মনে হয়। "দান করা" এই অর্থহীন প্রলাপের তাৎপর্য কি? শুধু পশুবল প্রয়োগ করিয়া বেআইনি-ভাবে বলপূর্বক গৃহীত বিষয় লোককে ফিরাইয়া দিবার উৎসাহের মধ্যে "উদারতা" বা "নারীমর্যাদামূলক পৌরুষ" কোথায়? নারী কোন্

বিষয়ে পুরুষ হইতে হীন ? পিতৃধনে তাহাদের অধিকার পুরুষ হইতে কম হইবে কেন ? ইহা সমান না হওয়ার কারণ কি ? দিন দুই পূর্বে কয়েকজন ব্যক্তির সহিত এই বিষয়ে আমরা খুব উত্তেজনার সহিত আলোচনা করিতেছিলাম। একজন মহিলা বলিলেন, "আমরা আইনের কোন পরিবর্তন চাই না। আমরা বেশ সন্তুষ্ট আছি। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ন্যায়সঙ্গত যে পুত্র বেশী অংশ পাইবে, কারণ তাহার দ্বারা পরিবারের নাম ও অতীতগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে ; পুত্রই পরিবারের মুখ্য অবলম্বন।" আমরা বলিলাম "মেয়ের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ?" একটি সুদর্শন লিকলিকে যুবক তথায় উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও, অপর জন তাহার তত্ত্বাবধান করিবে।" এইখানেই আসল কথা। ঐ "অপর জন",—সর্বদাই ঐ "অপর জন"। এই অপর জন হচ্ছে একটি আগন্তুক উৎপাত স্বরূপ ! অপর জন থাকিবে কেন ? ইহা কেন মানিয়া লওয়া হইবে যে অপর জন থাকিবেই ? তাদের কথার ভাব এই, মেয়ে একবস্তা মালের মতো, যতদিন "এই অপরজন" না আসে ততদিন পিতৃগৃহে তাকে কৃপা করে স্থান দেওয়া হবে, আসিলেই সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাকে অম্লানচিত্তে তার হাতে সমর্পণ করা যাবে। যদি আপনি মেয়ে হইতেন তবে কি আপনি পাগল হইয়া যাইতেন না ?"

—নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারের গুরুত্ব বুঝিবার জন্য স্ত্রী-জন্ম নিয়া আমার পাগল হওয়ার প্রয়োজন দেখি না। অত্যাচারের প্রাগুক্ত তালিকার মধ্যে উত্তরাধিকারের আইনকে আমি সর্বনিম্ন স্থান দিয়া থাকি। উত্তরাধিকার আইন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে বহু পরিমাণে গুরুতর সামাজিক ব্যাধি সার্‌দা বিলের আলোচ্য বিষয়। নারীগণের অধিকারাদি সম্বন্ধে

আমার মনোবৃত্তি অনমনীয়। পুরুষগণ আইনগত যে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে, আমার মতে নারীগণেরও সেই সব অধিকার লাভের যোগ্যতা রহিয়াছে। কন্যা ও পুত্রগণকে আমি সম্পূর্ণ সমান পদবীতে রাখিয়া চলিব। নারীগণ তাহাদের শক্তি যখন উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিবে,—যে পরিমাণে তাহারা শিক্ষালাভ করিবে, সেই পরিমাণে তাহারা নিশ্চয়ই নিজ অধিকার লাভের চেষ্টা করিবে—তখন স্বভাবতঃই তাহারা যে সকল বৈষম্যের দ্বারা নিপীড়িত, সেগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।

কিন্তু আইন সম্বন্ধীয় বৈষম্য দূর করার দ্বারা ব্যাধির সাময়িক উপশম মাত্র হইবে। অনেক লোক যাহা অনুমান করেন না, তাহা হইতেও বহু গভীর দেশে রহিয়াছে এই ব্যাধির মূল; পুরুষপ্রকৃতির ক্ষমতা ও যশোলিপ্সার ভিতর এবং ততোধিক গভীরভাবে রহিয়ছে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক কামজ আকর্ষণের মধ্যে। পুরুষ সর্বদাই ক্ষমতালিপ্সু। সম্পত্তির পূর্ণাধিকার এই ক্ষমতা প্রদান করে। পুরুষ এই ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া মৃত্যুর পরও যশঃ আকাঙ্ক্ষা করে। যদি পরবর্তিগণ সকলেই সমভাগ বিশিষ্ট অংশীদার হয় তবে সম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবেই এবং যদি ক্রমশঃ তাহা ঘটে তবে সেই যশঃ লাভ করা সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরই অধিকাংশ স্থলে সম্পত্তি বর্তিয়া থাকে।

অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই বিবাহ হয়; আইন তাঁহাদের বিরুদ্ধে হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের ক্ষমতা ও বিশেষ বিশেষ স্বাধিকারের অংশীদার। তাঁরা শক্তিমান স্বামীর সহধর্মিণী

বলিয়াও আরও কত কিছুতে বিশেষ গৌরব বোধ করেন ; স্বামীর প্রতিষ্ঠায় নিজেরও আনন্দ তাঁদের মনে বেশ জাগে ;—যদিও স্ত্রীপুরুষের অধিকারের বৈষম্য বিষয়ে মৌখিক আলোচনায় তাঁরা খুব মুখরা হন, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করার সময় তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিতে বিমুখ হইয়া পড়েন। কাজেই যখন আমি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সর্বপ্রকার আইনগত বাধানিষেধ রদ করিবার বিষয় অনুমোদন করি, আমি ভারতের শিক্ষিতা নারীগণকে উহার মূল কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বলি। নারী ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের আবির্ভাবে সমাজ পবিত্রীকৃত হইবে ; পুরুষের উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সঞ্চয়বৃত্তি প্রতিরুদ্ধ হইবে। তাঁহারা জানিয়া রাখুন কোটি কোটি লোকের এমন সম্বল থাকে না, যা তাঁহারা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীকে দিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনিকের পক্ষে একেবারে কোন পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকাই শ্রেয়ঃ। পিতামাতা সকল সন্তানকে সমানভাবে যে প্রকৃত সম্পদ্ দিতে পারেন তাহা হইতেছে তাহাদের চরিত্রগঠনের এবং প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা। পিতামাতাগণ তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের এমনভাবে আত্মনির্ভরশীল করিতে চেষ্টা করিবেন, যেন নিজের পরিশ্রম ও যত্নে তাহারা সদ্‌ভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়। নাবালক সন্তানগণের লালনপালনের ভার তখন স্বাভাবিক নিয়মেই বয়স্ক পরবর্তিগণের উপর পড়িবে। ধনিগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে

পৈত্রিক সম্পত্তির ক্রীতদাসে পরিণত করিবার অযোগ্য বাসনার পরিবর্তে তাহাদিগকে যদি আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য শিক্ষাদানের সাধু সংকল্প গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদের সন্তানগণের বর্তমান অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতা অনেকটা দূরীভূত হইতে পারে। পৈত্রিক সম্পত্তি মৌলিক আত্মপ্রচেষ্টার পরিপন্থী; প্রাপ্ত পিতৃসম্পদ্ অলসতা ও বিলাসিতার আনুষঙ্গিক ভোগলালসা পরিপুষ্ট করে। নবজাগ্রত নারীগণের কর্তব্য হইবে যুগাগত ব্যাধিগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহাদের মূল উৎসাদিত করা।

স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভীপ্সার বশে যে উভয়ের অধিকার-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে সে বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক করে না। নারী তাহার নিজের অজ্ঞাত সূক্ষ্মকৌশলজালে জড়াইয়া নানাভাবে পুরুষকে বশীভূত এবং প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করিয়াছে। সেই ধারায় পুরুষও অনুরূপ অজ্ঞাতসারে নারীকে তাহার উপর আধিপত্য স্থাপনে ব্যর্থ ও বিফল করার প্রয়াসী হইয়াছে। ফলে সৃষ্টি হইয়াছে একটি অচল অবস্থা। এই ভাবে দেখিতে গেলে, ভারতমাতার সুশিক্ষিত কন্যাগণের দ্বারা সমাধানের জন্য এই একটি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহাদের পাশ্চাত্য প্রণালী অনুকরণ করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ উহা সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভারতীয় প্রতিভা এবং ভারতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী প্রণালী অবলম্বন করিবেন। আমাদের কৃষ্টিতে যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া এবং যাহা হেয়

এবং অবনতিজনক তাহা বিনা দ্বিধায় বর্জন করিয়া তাঁহারা আত্মশক্তির বলে সমাজকে সংযত পবিত্র করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহা সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তীগণের কাজ; বিলাসমগ্না, পৌরুষধর্মী এবং তথাকথিত প্রগতিশীল নারীদিগের নহে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১০-'২৯]

৪

স্মৃতিশাস্ত্রে নারী

একজন সংবাদদাতা বেজোয়াদা হইতে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্বরাজ্য' পত্রিকার একখণ্ড আমাকে পাঠাইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর স্থান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ইহাতে আছে। বিনা পরিবর্তনে আমি উহা হইতে নিম্নের অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম :—

"স্ত্রী সর্বদাই পতিকেই ঈশ্বর-জ্ঞানে ভক্তি করিবে, যদিও স্বামী চরিত্রহীন, ইন্দ্রিয়সেবী এবং সদ্গুণরহিত হয়।

(মনু ৫।১৫৪)

"নারীগণ তাহাদের স্বামীর কথানুযায়ী চলিবে। ইহা তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৮)

"স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞ, আচার-নিয়ম বা উপাসনাদি নাই। স্বামীর সেবা করিয়া স্ত্রী স্বর্গে উচ্চস্থান লাভ করে।

(মনু ৫।১৪৫)

"যে স্ত্রী স্বামীর জীবিতকালে উপাসনা করে, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম করে, সে স্বামীর জীবন স্বল্পায়ু করিয়া দেয়। সেই স্ত্রী নরকে যায়। যে স্ত্রী পবিত্র উদক পান করিতে চায়, সে স্বামীর পাদদ্বয় অথবা সর্বাঙ্গ ধৌত করিয়া সেই জল পান করিবে এবং সে পরলোকে সর্বোচ্চস্থান লাভ করিবে। (অত্রি ১৩৬।৩৭)

"স্বামীগৃহ ছাড়া স্ত্রীর উচ্চতর জগৎ নাই। যে স্ত্রী স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে, মৃত্যুর পর সে তাহার নিকট যাইতে পারে না। কাজেই সে কখনও স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিবে না।

(বশিষ্ঠ ২১।১৪২)

"যে স্ত্রী তাহার পিতৃপরিবারের গর্ব করে, এবং স্বামীর আদেশ অমান্য করে, তাহাকে রাজা বিশাল জনতার সম্মুখে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে। (মনু ৮।৩৭১)

"স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর দেওয়া অন্ন কেহ ভোজন করিবে না। এরূপ স্ত্রীকে ইন্দ্রিয়পরায়ণা জানিবে। (অঙ্গিরস ৬৯)

"স্বামী কদাচারী, মদ্যপায়ী অথবা শারীরিক ব্যাধিযুক্ত হইলে যদি স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয় তবে তিন মাসের জন্য তাহার মূল্যবান বস্ত্রাদি ও রত্নালঙ্কার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দূরে রাখিতে হইবে। (মনু ২০।৭৮)"

—ইহা ভাবিতে দুঃখ হয়, যে সকল পুরুষ নারীর স্বাধীনতা নিজের স্বাধীনতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা নারীকে জাতির মাতৃস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধাকর্ষণের অযোগ্য এই

সকল নীতিবাক্য স্মৃতিশাস্ত্রে রহিয়াছে ; ইহা আরো পরিতাপের বিষয়, যে পত্রিকা গোঁড়া হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই সকল বাক্য ধর্মের সমর্থনকল্পে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য স্মৃতিসমূহে অনেক বাক্য আছে, যাহাতে নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সকল শাস্ত্রকার নারীকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠে এই,—সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র লইয়া কি করা যায়, যাহার মধ্যে পরস্পরবিরোধী এবং নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি সমূহ একই স্মৃতিতে বিদ্যমান? আমি বহুবার ইতঃপূর্বে এই পত্রিকার স্তম্ভে বলিয়াছি যে, ধর্মশাস্ত্রের নামে যাহা কিছু ছাপা হয় তাহাই ভগবদ্-বাণী বা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সকলেই বিচার করিতে পারে না কোন্‌টা ভাল এবং অকৃত্রিম, আর কোন্‌টা মন্দ এবং প্রক্ষিপ্ত। কাজেই এইরূপ একটি ক্ষমতাবান সঙ্ঘ থাকা দরকার, যে সঙ্ঘ ধর্মশাস্ত্র নামে নির্বিবাদে যাহা চালাইয়া দেওয়া হয় তাহা সংশোধন করিবে, এবং যে সকল শাস্ত্রবাক্যের কোন নৈতিক মূল্য নাই সেগুলি, অথবা যেগুলি ধর্ম ও নীতির মূলতত্ত্বের বিরোধী, সেগুলি বর্জন করিয়া শাস্ত্রের একটি সংশোধিত সংস্করণ হিন্দু সমাজের অনুসরণের জন্য প্রকাশিত করিবে। সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং যাঁহারা ধর্মাচার্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এই সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তজ্জন্য সমাজ সংস্কারের এই পবিত্র প্রচেষ্টা যেন কোনরূপে

ব্যাহত না হয়। সরল মনে এবং সেবাবুদ্ধির বশে যে কাজ করা যায় তাহা শেষ পর্যন্ত সকলের উপরেই কার্যকর হয়; এবং ইহা ধ্রুবসত্য যে, এইরূপ নিষ্কাম কর্মের সহায়তা যখন একান্ত প্রয়োজন হইবে তখন তাহা আসিয়া পড়িবে।

[হরিজন, ২৮-১১-'৩৬]

৫

নারী ও বর্ণভেদ

জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিতেছেন :—

"বর্ণ সম্বন্ধে সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় আপনার লিখিত প্রবন্ধ হইতে ইহা বোধ হয় যে, আপনার আলোচিত বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় নীতি শুধু পুরুষের উপরই প্রযোজ্য। তাহা হইলে নারীদের সম্বন্ধে কি হইবে? স্ত্রীলোকের বর্ণধর্ম কিরূপে নিরূপিত হইবে? আপনি হয়ত উত্তরে বলিবেন যে, বিবাহের পূর্বে সে তাহার বর্ণধর্ম এবং বিবাহের পর স্বামীর বর্ণধর্ম গ্রহণ করিবে। ইহা কি বুঝিতে হইবে যে, আপনি মনুর বিখ্যাত অভিমত সমর্থন করেন যে স্ত্রীলোকের জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা থাকিতে পারে না,—বিবাহের পূর্বে সে পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিবে, বিবাহের পর স্বামীর অধীনে থাকিবে এবং বিধবা হইলে সে তাহার সন্তানগণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

"ইহা যেরূপই হউক প্রকৃত বিষয় এই যে, বর্তমান যুগ নারী-গণের স্বাধীনতার যুগ এবং তাহারা স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার উপায় অবলম্বনে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় সুনিশ্চিতভাবে

অবতীর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে ইহা প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছে এবং তাহার স্বামী মহাজনী ব্যবসা করিতেছে। এরূপ অবস্থাতে স্ত্রীলোকটি কোন্ বর্ণধর্ম আশ্রয় করিবে? বর্ণাশ্রমের বিধানমতে পুরুষ সাধারণতঃ তাহার পিতার ব্যবসাই অবলম্বন করে এবং কাজেকাজেই সে তাহার পিতামাতার বর্ণধর্মও গ্রহণ করে; স্ত্রীলোক তাহাদের পিতামাতার বর্ণধর্ম গ্রহণ করিবে এবং বিবাহের পরে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত থাকিবে ইহা আশা করা সঙ্গত। তাহাদের সন্তানগণ এই বর্ণগুলির কোনটিতে ভুক্ত হইবে? অথবা আপনি কি সন্তানগণের নিজেদের উপরেই এই প্রশ্ন তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সমাধানের ভার দিবেন? শেষোক্ত অবস্থায় আপনার প্রচারিত বর্ণধর্মে বর্ণাশ্রমের যে বংশানুগত ভিত্তির কথা বলিয়াছেন তাহার কি হইবে?"

—আমার মতে বর্তমান অবস্থায় উত্থাপিত প্রশ্ন অবান্তর। উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে, বর্তমান বর্ণাশ্রমগুলি এলোমেলো হওয়ার দরুন প্রকৃতপক্ষে কোন বর্ণই বিদ্যমান নাই। বর্ণসম্বন্ধীয় মূল নীতিই এখন আর কার্যকর নহে। হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থাকে অরাজকতার অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়; চতুর্বর্ণ আজ নামে মাত্র বর্তমান। আমরা যদি বর্ণের নাম ধরিয়া কথা বলিতে চাই, তবে স্ত্রী পুরুষ সকলেই আজ একই বর্ণভুক্ত। আমরা সকলেই শূদ্র।

আমার কল্পিত পুনরুজ্জীবিত বর্ণধর্মে বিবাহের পূর্বে মেয়ে ঠিক তাহার ভ্রাতার ন্যায় পিতার বর্ণভুক্ত থাকিবে; বিভিন্ন বর্ণের ভিতর পারস্পরিক বিবাহ অনুষ্ঠান চলিবে। কাজেই মেয়ে

তাহার বর্ণ বিবাহের পরও অক্ষুণ্ণই রাখিবে। কিন্তু যদি স্বামী ভিন্নবর্ণভুক্ত হন তবে বিবাহের পর সে পিতামাতার বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই স্বামীর বর্ণ গ্রহণ করিবে। এইরূপ বর্ণ পরিবর্তন দ্বারা কাহারও মানসিক ভাবসম্পদের উপর কোন ইঙ্গিত করা হইতেছে এরূপ বুঝিতে হইবে না; কারণ পুনরুদ্দীপনার যুগে বর্ণ-প্রতিষ্ঠার অর্থ হইবে যে, সামাজিক হিসাবে চারিটি বর্ণ সম্পূর্ণরূপে সমস্থানীয়।

স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক্‌ভাবে কোন কর্মপন্থা সর্বদাই অবলম্বন করিবে, ইহা আমি মনে করি না। সন্তানগণকে লালন পালন করিতে এবং গৃহযাত্রা নির্বাহ করিতেই তাহার সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হইবার কথা। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে পরিবার প্রতিপালন করিবার অতিরিক্ত ভার তাহার উপর পড়া উচিত নয়। পুরুষ পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবে এবং স্ত্রী গৃহকর্ম দেখিবে এবং এইভাবে দুই-জনের জীবনযাত্রা পরস্পরের অনুপূরক ও পরিপোষক হইয়া পারিবারিক কল্যাণ সাধন করিবে।

ইহাতে স্ত্রীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় বা তাহাদের স্বাধীনতা বাহিরের চাপে বিনষ্ট করা হয় ইহা আমি মনে করি না। মনুর উক্তি বলিয়া যাহা কথিত হয় "স্ত্রীলোকের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না," তাহা আমার নিকট বেদবাক্যের মতো অলঙ্ঘনীয় নয়। ইহা এইমাত্র প্রমাণ করে, যে সময়ে এই অনুশাসন প্রবর্তিত হয় তখন সম্ভবতঃ নারীগণকে একপ্রকার অধীন করিয়াই রাখা হইত। আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীকে

"অর্ধাঙ্গিনী" (উত্তম অর্ধেক) এবং "সহধর্মিণী" (সহায়কারিণী) এইরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রীকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করে, তাহাতে স্ত্রীকে কোনরূপ ছোট করিয়া দিবার ভাব প্রকাশ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এমন একটি সময় আসিয়াছিল, যখন নারীকে তাহার অনেক অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং তাহাকে নিম্নতর সামাজিক মর্যাদা ও স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু তখন তাহার বর্ণগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কারণ বর্ণ এই শব্দের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের পৌর অধিকার বা জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বুঝায় না। ইহা শুধু কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্দেশ করে। যদি আমরা নিজে আমাদের কর্তব্য অবহেলা না করি তবে আমাদিগকে তাহা হইতে কেহ বিচ্যুত করিতে পারে না। যে নারী তাঁহার কর্তব্য বিষয়ে সজাগ এবং তাহা সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট, তিনি পরিবারে নিজের উন্নত মর্যাদা অনুভব করেন। সে গৃহের তিনি কর্ত্রী, সেখানে তিনি রাণী, ক্রীতদাসীর ভাব সেখানে জাগিতে পারে না।

অতঃপর ইহা বলা অনাবশ্যক যে, নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি সমাজ যদি তাহা গ্রহণ করে, সন্তানগণের বর্ণ নির্ণয়ে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি হইবে না ; কারণ তখন স্ত্রী ও স্বামীর বর্ণ বিষয়ে বৈষম্য চলিয়া যাইবে।

[হরিজন, ১২-১০-'৩৪]

৬

নারী ও উৎকট সমর-প্রবণতা

অনেক সভায় বিশেষভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে —নারী পুরুষদিগের সমর-প্রবণতার প্রতিকূলে কিভাবে সহায়তা করিতে পারে। ইটালীতে কোন অপ্রকাশ্য সভায় ভারতের নারী হইতে ইটালীয় নারীগণ শিখিতে পারে এমন কিছু তাহাদিগকে বলিবার জন্য গান্ধীজী অনুরুদ্ধ হন।

প্যারী শহরে তিনি বলিয়াছিলেন, "নারীগণ যদি শুধু ভুলিতে পারে যে তাহারা দুর্বল জাতি তবে তাহারা যে যুদ্ধপ্রবণতার বিরুদ্ধে পুরুষ হইতে অনেকগুণ বেশী কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আপনারা নিজেরাই এই প্রশ্নের উত্তর দিন যে, যদি আপনাদের বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিগণের স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মাতাগণ তাঁহাদিগকে কোন প্রকারের যুদ্ধোদ্যমে উৎসাহদান করিতে অস্বীকার করেন তবে তাঁহারা কি করিবেন ?

লুসোঁতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনারা ইউরোপের নারীগণের প্রতি যে বাণীর জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, আমি জানি না আমার সেই বাণী দেওয়ার সাহস আছে কিনা। তাঁহাদের রোষভাজন না হইয়া যদি আমাকে তাহা করিতে হয়, তবে আমি তাঁহাদিগকে যে সকল ভারতের নারী গত বৎসর একযোগে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের নিকট যাইতে বলিব

এবং ইহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি যে, ইউরোপ যদি অহিংসার শিক্ষা গ্রহণ করিতে চায় তবে সেখানকার নারীগণের ভিতর দিয়াই তাহা করিতে হইবে। আমার ধারণা নারী আত্মত্যাগের জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজ নারীগণ বুঝিতে পারিতেছে না এই বিষয়ে পুরুষ হইতে কত প্রভূত পরিমাণ অধিক সুযোগ সুবিধা তাহাদের আছে। টলস্টয়ের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাহারা পুরুষের মোহিনী শক্তির কুহকে পড়িয়া কতরূপে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। অহিংসার শক্তি যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত তবে তাহারা অবলা বলিয়া অভিহিত হইতে স্বীকৃত হইত না।

ইটালীতে কোন নারীমণ্ডলীর সহিত কথোপকথনস্থলে তিনি বলিয়াছিলেন, "অহিংস যুদ্ধের মজা এই যে, ইহাতে নারী পুরুষের সহিত সমভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। হিংস্র যুদ্ধে নারীর এইরূপ সুযোগ-সুবিধা থাকে না ; ভারতের নারীগণ পুরুষ হইতে অধিক কার্যকরভাবে গত অহিংস যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা অতি সহজবোধ্য। অহিংস যুদ্ধে খুব বেশী পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিবার আবশ্যক হয় ; এবং নারী অপেক্ষা অধিক পবিত্র ও উদারভাবে কে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে পারে ? ভারতবর্ষে নারীগণ পর্দা ছিন্ন করিয়া জাতির জন্য কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের সেবা তাঁহাদের নিকট নিজেদের গৃহাশ্রমের কর্তব্যের চেয়ে বেশী কিছু দাবী করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় নিষেধের প্রতিকূলে তাঁহারা লবণ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশী বস্ত্রের

দোকানে এবং মদের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন এবং উভয় ক্ষেত্র হইতে বিক্রেতা ও খরিদ্দারের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হৃদয়ে সাহস এবং করুণা লইয়া গভীর রাত্রে তাঁহারা মদ্যপায়িগণকে তাহাদের আড্ডা পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দলে দলে কারাগারে গিয়াছেন এবং তাঁহাদের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক পুরুষই লাঠির আঘাত পাইয়াছে। যদি পাশ্চাত্য নারীগণ পশুধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চেষ্টা করেন তবে ভারতের নারীর নিকট তাঁহাদের শিখিবার বিষয় কিছুই নাই। তাঁহাদের স্বামিগণকে নরহত্যার উৎসাহে উত্তেজিত করার আনন্দ হইতে এবং তাঁহাদের বীরত্বের জন্য গৌরব অনুভব করার লোভ হইতে তাঁহাদিগকে বিরত হইতে হইবে।

মহাদেব দেশাই

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১-'৩২]

৭

নারীর বিশেষ অধিকার

'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু :—

"মহাশয়, বর্তমান ইউরোপীয় সমস্যার বিষয়ে লিখিত আপনার প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বর্তমানে আপনি ইউরোপের উদ্দেশে কথা বলিবেন ইহা স্বাভাবিক। মানবতা যখন বিনাশের অতি সন্নিকটে তখন আপনি কিরূপে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিবেন ?

"পৃথিবী তাহাতে কর্ণপাত করিবে কিনা ইহাই প্রশ্ন। বিলাত হইতে প্রাপ্ত বন্ধুগণের চিঠিপত্র হইতে বুঝা যায় যে, সেই বিভীষিকাময় সপ্তাহটি ইংলণ্ডবাসিগণ অতিশয় যন্ত্রণায় নিঃসন্দেহ কাটাইয়াছে। আমার নিশ্চিত ধারণা, সেই কথা সমগ্র পৃথিবীর উপরই প্রযোজ্য। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও তাহার দানবিক উদ্ভাবনীশক্তি এবং তৎপ্রসূত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও পাশবিকতার কল্পনাই জনগণকে নিশ্চিতরূপে এরূপ চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে, যাহা তাহারা পূর্বে কখনও ভাবে নাই। জনৈক ইংরেজ বন্ধু লিখিয়াছেন, "যুদ্ধ হইবে না এই সংবাদে যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক হৃদয় হইতে যে কৃতজ্ঞতা ভগবানের চরণে নিবেদিত হইয়াছিল, আমি তাহা আমরণ ভুলিতে পারিব না।" তথাপি লোকে যুদ্ধকে এত ঘৃণা করে কেন ? উহা কি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের আশঙ্কা কিংবা নিকট আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনের অকাল মৃত্যু অথবা নিজের দেশের গৌরব ধূলিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা ? অপর একটি জাতির লাঞ্ছনা, অবমাননা সত্ত্বেও যুদ্ধ এড়ানো হইয়াছে, ইহাতে কি আমরা সুখী ? যদি আমাদিগকে সম্মান বিসর্জন

দিতে হইত তাহা হইলে কি আমাদের মনের ভাব অন্যরূপ হইত? আমরা যুদ্ধকে কি ঘৃণা করি এই জন্য যে বিবাদ মিটাইবার ইহা ভুল পন্থা অথবা এই ঘৃণা কি আমাদের ভয়ের সহিত জড়িত? যদি পৃথিবী হইতে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ লোপ করিতে হয় তবে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতেই হইবে।

"বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাস্তবিকপক্ষে আমরা কি দেখিতে পাই? অস্ত্রসম্ভারের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় প্রতিযোগিতা, লব্ধব্য যাবতীয় যুদ্ধের উপকরণাদি সংগ্রহে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও গভীর সংগঠন, ভাবী যুদ্ধার্থে স্ত্রী, পুরুষ, অর্থ, যুদ্ধ-কৌশল এবং সামরিক প্রতিভার সমাবেশ; উদ্দেশ্য, আবার যদি যুদ্ধ বাধিয়া উঠে! কোথাও স্পষ্টভাবে এই উক্তি কেহ করেই না "যুদ্ধ আর কিছুতেই হইতে দিব না।" এই সব বিষয় দ্বারা ইহা কি মানিয়া লওয়া হইতেছে না যে, আজ যে যুদ্ধ কোন প্রকারে এড়ানো হইল সেই যুদ্ধ ডেমোক্লিসের খড়্গের ন্যায় আমাদের মাথার উপর এখনও ঝুলিয়া রহিয়াছে?

"নারী হইয়া আমি দুঃখের সহিত অনুভব করি যে, নারীজাতি তাহার স্বভাবজাত বুদ্ধি ও প্রেম-ধর্মের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যতটুকু সহায়তা করিতে পারিত, তাহা করে নাই। আমার শুনিতে ও পাঠ করিতে দুঃখ হয় যে, সহকারী নারী-ফৌজ (Women's Auxiliary Corps) গঠিত হইতেছে; গভর্নমেন্টের তরফ হইতে নারীগণকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে এবং নারীগণও স্বেচ্ছায় রণক্ষেত্র এবং সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে। তথাপি যখন যুদ্ধ বাধে নারীগণের হৃদয়ই প্রথমে যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হয়; তাহাদের আত্মা এমন দগ্ধ হইয়া যায়—যাহা রক্ষা করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এই সকল বিষয় বোধের অতীত।

কেন আমরা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যাহা সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর, তাহা নির্বাচন করিয়া লই নাই? বিনা দ্বিধায় কেন আমরা বীভৎস, হৃদয়হীন পশু-শক্তির নিকট নতজানু হইয়াছি? নারীজীবনের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে ইহা অতি শোচনীয় অধ্যায়। আমাদের জীবনের ঠিক আদর্শ আমরা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, নারীগণ যদি অহিংসার শক্তি ও গৌরব একবার প্রাণে প্রাণে অনুভব করিত তবে পৃথিবীর সব দিকে কল্যাণ হইত।

"আপনি আমাদিগকে, অর্থাৎ ভারতীয় নারী-সমাজকে কেন প্রবুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারেন না? আপনার অহিংস-সংগ্রামের কৃপাণরূপে আমাদের উপর আপনার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবেন না কেন? কতবার আমার মনে এই আশা হইয়াছে যে, শুধু এই উদ্দেশ্যে আপনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করুন। আপনি আশ্চর্য সাড়া পাইবেন এই আমার বিশ্বাস, কারণ ভারতীয় নারীর হৃদয় সুস্থ ও সবল, এবং পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আর কোনও নারী-সমাজের পশ্চাতে আমাদের মতো ত্যাগ ও আত্মবলিদানের সুন্দর ইতিহাস নাই। যদি আমাদের দ্বারা কিছু করাইতে চান তবে আমরা খুব সামান্যভাবে হইলেও এই দুঃখময় ও ক্ষুব্ধ পৃথিবীকে শান্তির পথ দেখাইতে সক্ষম হইব। কে বলিতে পারে?"

জনৈকা নারী
২২।১০।৩৮

—দ্বিধাশূন্যভাবে আমি এই পত্র ছাপাইয়া বাহির করিতেছি। নারীচিত্ত অনুপ্রাণিত করিবার বিষয়ে আমার ক্ষমতার উপর লেখিকার বিশ্বাস আমাকে উৎফুল্ল করে বটে; কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমারেখা বুঝিবার পক্ষে আমার দীনতা যথেষ্ট অনুভব করি। আমার মনে হয়, আমার পরিভ্রমণের দিনগুলি ফুরাইয়া

আসিয়াছে। লেখার দ্বারা যতদূর আমার করা সম্ভব অবশ্য আমি তাহা করিতে থাকিব। কিন্তু নীরব আত্মনিবেদনের কার্যকর শক্তির উপর আমার বিশ্বাস বাড়িয়া যাইতেছে। নীরব প্রার্থনা আত্মিক জীবনের একটি সূক্ষ্ম কলা—সম্ভবতঃ সর্বোচ্চ কৌশল, যাহাতে অতি উচ্চস্তরের যত্ন ও অভ্যাস প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি অহিংস-নীতির সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য। সেই নারীহৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে একজন পুরুষের উপর ভার দেওয়া কেন? যদি একজন পুরুষ হিসাবে না করিয়া, জনসাধারণ কর্তৃক আচরণীয় অহিংস-ব্রতের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র হিসাবে কেবল আমাকেই এই আবেদন করা হইয়া থাকে তবে ভারতের নারীগণের নিকট এই নীতি প্রচার করিবার জন্য যাওয়ার কোন প্রেরণা আমার নাই। আমি লেখিকাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, তাঁহার অনুরোধ মতে কাজ করিতে যে বিরত হইতেছি তাহা আমার অন্তরের ইচ্ছার অভাবহেতু নয়। আমার ধারণা এই, যদি কংগ্রেসের সেবকগণ অহিংস-নীতিতে তাহাদের বিশ্বাস অখণ্ড রাখিতে পারে এবং অহিংস কর্মসূচী বিশ্বস্তভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে চালাইয়া যাইতে পারে, তবে নারীগণ আপনাআপনিই সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিত হইয়া পড়িবে। এবং ইহা হইতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে এমন একজনের অভ্যুত্থান হইবে যিনি, আমি যতদূর করিতে পারিব আশা করি, তদপেক্ষা অনেকদূর বেশী অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবেন। কারণ অহিংস-ব্রতে নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে এবং অধিকতর সাহসের অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ অপেক্ষা

অধিকতর শক্তিমতী। আমি বিশ্বাস করি, পুরুষ যেমন পশুশক্তিপ্রণোদিত সাহসে নারী হইতে শ্রেষ্ঠ, নারীও সকল সময়ে আত্মত্যাগের শক্তিতে পুরুষের চেয়ে অধিক বলীয়সী।

বান্নু, ২৫-১০-'৩৮

[হরিজন, ৫-১১-'৩৮]

৮

নারীর কর্মপন্থা

১

সম্প্রতি এব্বটাবাদে নিখিল ভারত নারী সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশে ইহা তাঁহাদের প্রথম প্রয়াস। আমি জানিতে পারিলাম সভ্যগণ অত্যন্ত সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কোনরূপ জাতিবর্ণবৈষম্য বা কোনরূপ ধর্মবিভেদ তথায় ছিল না। মুসলমান, শিখ ও হিন্দু রমণীগণ অবাধে পরস্পরের সহিত মিশিয়াছেন। কার্যকরী সমিতি নিম্নের তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন:—

১। নিখিল ভারত নারী সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সভ্যগণ ইউরোপ এবং সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকায় তাহাদের গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্য লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। যে সকল দেশ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে এবং নাৎসী (Nazi) ও ফ্যাসিস্ট (Fascist) প্রভুত্বের লৌহপদমূলে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের সহিত গভীর

সহানুভূতি তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের সর্বশ্রেণীর লোক অতি সুস্পষ্ট ভাষায় এই প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। পৃথিবীর সকল নারীর নিকট তাঁহারা পুনরায় আবেদন করিতেছেন, তাঁহারা যেন যুদ্ধদ্বারা বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার, অভিযোগাদি দূর করিবার প্রয়াসের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা যেন শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহাদের সমগ্র ক্ষমতা নিয়োজিত করেন।

২। কার্যকরী সমিতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিতেছেন যে, জাতিসমূহের একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘ স্থাপনাদ্বারা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিতভাবে আনিবার জন্য অহিংসাই একমাত্র কার্যকর উপায়। এই আদর্শে পৌঁছানো যে কত কঠিন তাঁহারা উপলব্ধি করেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা ভারতের নারীগণকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে অহিংস-নীতি অবলম্বন করিয়া তাহার বিকাশসাধনে চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানাইতেছেন; কারণ তাঁহারা অনুভব করেন যে, ভারতের নারীগণ তাঁহাদের সর্বজন-বিদিত জন্মজন্মাগত সেবা ও ত্যাগের বলে এই বিষয়ে পৃথিবীর নারীগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন।

৩। সভ্যগণ নিখিল ভারত নারী সঙ্ঘের এই মত পুনরায় সমর্থন করিতেছেন যে, ব্রিটেন যে উদ্দেশ্য লাভের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ সকল জাতির স্বাধীনতালাভ এবং নিখিলবিশ্বে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপন—তাহার প্রাথমিক এবং ন্যায়সঙ্গত কার্য হইবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা।

—এব্বটাবাদে যে সকল ভগিনী মিলিত হইয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে আমার মতই তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে

অভিযান করিবার পথ বিশ্বের নারীগণই প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। ইহা তাঁহাদের জীবনের বিশিষ্ট অধিকার ও অপূর্ব সুযোগ। সেইজন্যই সমিতি অহিংস-নীতিতে তাঁহাদের বিশ্বাস পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি, যে সকল নারী সঙ্ঘের কার্য ও ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁহারা সমিতির এই মতে বিশ্বাসী এবং তাঁহারা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মে ব্রতী হইবেন।

সেবাগ্রাম, ২৭-৭-'৪০

[হরিজন, ৪-৮-'৪০]

নারীর কর্মপন্থা

২

উচ্চশিক্ষিতা কোন ভগিনীর লেখা হইতে কিয়দংশ বাদ দিয়া আমি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অহিংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শের মধ্যে জগতকে আপনি আত্মার গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন। মানবের পাশববৃত্তি কি ভাবে জয় করিতে হয় এই দুইটি শব্দে তাহার সমাধান মিলিবে।

"হস্তশিল্পের আশ্রয়ে শিক্ষাদান" শুধু একটি মহতী কল্পনা নয়, শিক্ষার একমাত্র প্রণালীও—যদি আমাদের সন্তানগণকে আমরা আত্ম-নির্ভরশীল করিতে চাই। আপনিই এই উপায়ের কথা বলিয়াছিলেন ; আপনার পূর্বোক্ত একটি বাক্যদ্বারা সমগ্র ভারতের বিরাট শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা এবং অবস্থানুসারে বিস্তৃত কার্যপ্রণালী স্থির করা যাইতে পারিবে।

"আমরা নারীগণের সমস্যা মীমাংসা করিতে আপনাকে অনুরোধ করি। রাজাজী বলেন, নারীদের সম্বন্ধে কোন সমস্যাই নাই; সম্ভবতঃ রাজনৈতিক হিসাবে নয়। সমস্যা শব্দ যদি ব্যবসা বা জীবিকা-অর্জনের নানা উপায় বিষয়ে প্রযুক্ত হয় তবে বলা যায়, আইন পাশ করিয়া সকল ব্যবসা স্ত্রী-পুরুষের জন্য উন্মুক্ত করা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত যে বিভেদ রহিয়াছে তাহার তো ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

"আমাদের নীচ বৃত্তিগুলি বশে আনিতে হইলে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ ছাড়া অতিরিক্ত কতকগুলি মৌলিক তথ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। যেমন পুরুষের, তেমনি নারীর আত্মাও শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভ করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু পুরুষের পক্ষে তাহার উদ্ধত স্বভাব, লালসা, কষ্ট দিবার স্বভাবজাত পাশবিক বৃত্তি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইতে হইলে যেমন অহিংসা এবং সংযমের প্রয়োজন, তেমনি পুরুষ হইতে বিভিন্ন এবং সাধারণতঃ নারীর স্বভাবজাত বলিয়া কথিত এইরূপ কতিপয় নীচবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নারীকে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিতে পারে এমন কতকগুলি নিয়মের প্রয়োজন। তাহার স্ত্রীসুলভ স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি লক্ষ্য করিয়া এবং স্ত্রীজাতি বলিয়াই তাহাকে যে ভাবে শিক্ষিত করা হয়, এবং সেই হিসাবেই তাহার জন্য যে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়—এই সবগুলিই তাহার যথাযোগ্য বিকাশের প্রতিকূল। তাহার প্রতি কাজেই এই বিষয়গুলি অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি, শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেষ্টনী তাহার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে এবং তজ্জন্য গতানুগতিকভাবে অনেকে বলিবার সুযোগ পায় 'যাহাই বল, সে ত নারী বই কিছু নয়'। এ যেন গলায় 'নারী' নামক একটি চিহ্ন ঝুলাইয়া তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা। আমার ধারণা, আমরা সমস্যার ঠিক সমাধান করিতে পারিলে এবং

আমাদিগকে উন্নীত করিবার ঠিক পন্থা বাহির করিতে পারিলে, সহানুভূতি, কোমলতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ আমাদের আছে সেইগুলি বাধাস্বরূপ না হইয়া সহায়ক হইবে। শিশু ও পুরুষগণের সমস্যা আপনি যেভাবে সমাধান করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে আমাদের আত্মোৎকর্ষের প্রয়াস আমাদের অন্তরাত্মা হইতেই উদ্‌গত হইবে।

"আমি স্বভাব, শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেশের কথা বলিয়াছি। বিষয়টি আরও ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমি একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

"সন্তানগণের মাতারূপে নারী স্বভাবতঃই মৃদুস্বভাব, কোমলহৃদয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ। তাহার অজ্ঞাতসারে এইগুলি তাহাকে বহুল-পরিমাণে অনুপ্রাণিত করে। সেইজন্য কাজের সময় আসিলে নারী অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়। পুরুষের সঙ্গে চলিবার সময় নারী নানাপ্রকার ভুল করিয়া বসে। যেখানে কোমলহৃদয় হওয়া উচিত নয়, সে সেখানে তাহাই হইয়া পড়ে। নারী সহজেই ভাবপ্রবণ, অভিমানিনী এবং সাধারণতঃ ভুলচুক করিয়া থাকে।

"যদিও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রবল ইচ্ছা আমার ছিল এবং এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া পূর্বরাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটাইয়াছিলাম—যখন আমি আপনাকে দর্শন করিতে গেলাম এবং আপনার সমক্ষে যখন আমাকে বসিতে বলা হইল তখন আমি শ্রীদেশাই মহাশয়ের বিশাল পৃষ্ঠদেশের আড়ালে গিয়া বসিলাম। আমি আপনার কথাও শুনিতে পাইলাম না এবং আপনাকে দর্শন করিতেও বাধা নিজেই সৃষ্টি করিলাম। ইহা কিরূপ বোকামি হইল! তদুপরি আমি দেখিলাম যে আমার বলার বিষয় বুঝাইতে পারিলাম না—আমার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। আমার প্রকৃতি ভাবপ্রবণ হওয়ায় উহা সহজেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং এইজন্যই এরূপ

ঘটিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে নিশ্চয়ই এই বিশেষ দোষটা সংশোধিত হইত, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনুরূপ বোকামির জন্য তখন অন্য কোন কাজ করিয়া বসিব।

"নারীগণের কর্তব্য সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা উপসমিতি (National Planning Sub-Committee) কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তর আমার জনৈক বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন তাহা তিনি আমাকে দেখাইয়াছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রশ্নগুলি নম্বর দিয়া সাজানো এবং কতকটা এইরূপ—আপনার গ্রামাঞ্চলে নারীগণ নিজস্বত্বে সম্পত্তি-অর্জন, রক্ষণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ, বিক্রী বা অন্যরূপে হস্তান্তর কতদূর করিতে পারেন? নারীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী যে সকল বিভিন্ন কাজ বা চাকুরীতে ব্রতী হইতে চান, তাহার উপযোগী শিক্ষা এবং অনুশীলনের কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা কি কি সুযোগ-সুবিধা আছে? আমার বন্ধু এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেন নাই কিন্তু লিখিয়াছেন,—পুরাকালে নারীগণ নারী বলিয়াই কোনরূপ শিক্ষালাভ করিতেন না, সত্যের অপলাপ না করিয়া ইহা আমরা বলিতে পারি না এবং 'বৈদিক যুগে বিবাহের পরই পত্নীকে গৃহে সম্মানিত স্থান দেওয়া হইত এবং স্বামীর গৃহে তিনিই সর্বময়ী কর্ত্রী হইতেন' ইত্যাদি এবং তাহার সমর্থনে মনু হইতে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রশ্নাবলী ছিল বর্তমান যুগের প্রথাগুলি সম্বন্ধে; আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরাকালের আচার-নিয়ম সম্বন্ধে লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি অস্ফুটভাবে যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার ধারণা এই ছিল বুঝা যায় যে, একটি রচনা হিসাবে উত্তর দিলেই সুন্দর হইবে এবং উৎসাহের সহিত বলিলেন যে অমুক মহিলার উত্তর তাহার উত্তর অপেক্ষা আরও খারাপ হইয়াছে। আমার ধারণা, উপযুক্ত শিক্ষালাভের অভাবই আমার বন্ধুর এই ভুলের কারণ; তিনি

নারী বলিয়াই তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। একজন কেরানীও জানে যে কাহাকেও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে সে অন্য বিষয়ে রচনা লিখিবে না।

"এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথা বুঝাইবার আরও চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে আমি মনে করি না। সকল শ্রেণীর নারীদের সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা আপনার রহিয়াছে এবং তাহা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন—ঠিক পথে চালিত করিবার মূলনীতি সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা কতদূর।

"আপনি আমাকে হরিজন পত্রিকা পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি অতি আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু এ পর্যন্ত ত আমি অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেখিতে পাই নাই। সূতা কাটা এবং জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়াস এই শিক্ষার কয়েকটি দিক। কিন্তু এইগুলি সমগ্র সমস্যার সমাধান করে না। কারণ আমি এরূপ নারী দেখিয়াছি যাঁহারা সূতা কাটেন এবং জাতীয় মহাসমিতির আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতেও চেষ্টা করেন, অথচ তাঁহারা এমন সব ভুল করিয়া বসেন, যেগুলির কারণ নির্দেশ করিতে গেলে 'তাঁহারা অবলা নারী' এই কথাই বলিতে হয়।

"নারী পুরুষের মত হউক আমি ইহা চাই না। কিন্তু আপনি পুরুষকে যেমন তাহার নীচপ্রকৃতি শোধনের জন্য অহিংসার বাণী শিক্ষা দিয়াছেন, সেরূপ আমাদিগকেও শিক্ষা দিন কি ভাবে আমাদের খামখেয়ালী বৃত্তিগুলি দূর করিতে পারি। কৃপা করিয়া বলিয়া দিন, আমাদের সদ্‌বৃত্তিগুলির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার কিরূপে করিতে পারি এবং কি ভাবে আমাদের অন্তরায়গুলিকে আত্মোৎকর্ষের উপায়ে পরিণত করিতে পারি।

"নারীরূপে জীবনের এই গুরুভার আমি সর্বদা অনুভব করিতেছি।

যখনই কাহাকেও বিদ্রূপের সুরে বলিতে শুনি, 'সে নারী বই ত নয়' তখন আমার অন্তরাত্মা সংকুচিত হইয়া পড়ে—যদি মানবাত্মার তেমন অবস্থা সম্ভব হয়। একজন পুরুষের সহিত আমি এই সব বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার বন্ধুর বাড়ীতে সেই শিশুটিকে দেখিয়াছেন? সে রেলগাড়ী নিয়া খেলা করিতেছিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীখানি একটি থামে গিয়া না ঠেকিয়াছে ততক্ষণ সে আনন্দে চগ্ চগ্ করিতেছিল। থামটি ঘুরিয়া না গিয়া সে নিজের কাঁধের ঠেলায় থামটিকে সরাইবার চেষ্টা করিল এবং তাহার বালসুলভচিত্তে ভাবিল যে সে উহা সরাইতে পারিবে। আপনার কথায় আমাকে তাহার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। আপনি ইহা বুঝিতে এবং তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমার হাসি পায়।"

—ইহা আমার গর্বের বিষয় মনে করিতাম যে, "সত্যাগ্রহ" আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের সমস্যা সমাধানে আমার অবদান সুনির্দিষ্টভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই পত্র-লেখিকার মতে পুরুষগণের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তাহা হইতে পৃথক্ রকম ব্যবস্থা নারীগণের জন্য হওয়া আবশ্যক। যদি তাহাই হয়, তবে আমি মনে করি না যে কোন পুরুষ ইহার উপযুক্ত সমাধান করিতে পারিবে। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হইবে, কারণ প্রকৃতি তাহাকে নারী হইতে পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। চাষের মই-এর নীচে পড়া ব্যাঙ্ই জানে কোথায় উহা তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত নারীর কি কি আবশ্যক তাহা নারীই প্রতিপত্তির সহিত

নির্ণয় করিতে পারিবে। আমার নিজের ধারণা এই—যখন পুরুষ ও নারী মূলতঃ এক, তাহাদের সমস্যাগুলিও মূলতঃ একই হইবে। উভয়ের অন্তরাত্মা একই স্বভাবাপন্ন। উভয়ে একই জীবন যাপন করে, এবং তাহাদের ভাবরাশিও একই প্রকারের। একে অন্যের অনুপূরক। একজন আর একজনের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে না।

কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক যুগযুগান্তর হইতে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে এবং সেইজন্য নারীর মনে সর্বদাই এই সংস্কার দানা বাঁধিয়াছে যে সে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল, ক্ষীণশক্তি। এই স্বার্থপ্রণোদিত শিক্ষা যাহা পুরুষ নারীকে দিয়া আসিয়াছে, নারী তাহার সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া মানিয়া নিয়াছে সে পুরুষ অপেক্ষা সর্বাংশে অপকৃষ্ট। কিন্তু মনীষিগণ পুরুষ এবং নারীর সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়াছেন।

মর্যাদা সমান হইলেও কোন সন্দেহ নাই যে, একস্থানে যাইয়া উভয়ের কর্তব্যের ক্ষেত্র দুই দিকে বিভক্ত হইয়াছে। উভয়ে মূলতঃ এক হইলেও ইহাও অনুরূপ সত্য যে, উভয়ের মধ্যে দেহের গঠনে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। সেই জন্য উভয়ের কর্মক্ষেত্রের পরিসরও বিভিন্ন রকমের। অধিকাংশ নারীদিগকেই মাতৃত্বের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই জন্য তাহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক যাহা পুরুষের না থাকিলেও চলে। পুরুষ কর্মপ্রবণ, নারী সহনশীলা। তিনি গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী। পুরুষ খাদ্যাদি সংগ্রহে উন্মুখ এবং নারী খাদ্যসম্ভার রক্ষা করেন এবং বিতরণ করেন। সেবাপরায়ণা

শব্দে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই। শিশুগণকে লালনপালন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল নারীরই বিশিষ্ট অধিকার ; তাহার যত্ন ব্যতীত জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

নারীকে তাহার গৃহকর্ম হইতে সরাইয়া আনা বা তাহা পরিত্যাগ করিতে তাহাকে প্ররোচিত করা এবং সেই গৃহ রক্ষা করিবার জন্য তাহার কাঁধে বন্দুক তুলিয়া দেওয়া, আমার মতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই মর্যাদাহানিকর। ইহা বর্বরতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিনাশের সূচনা। পুরুষ যে ঘোড়ায় চড়ে, নারী সেই ঘোড়ায় চড়িতে চেষ্টা করিলে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অবনতি সুনিশ্চিত। পুরুষ তাহার সঙ্গিনীকে তাহার বিশিষ্ট কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিলে, বা তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলে, নিজের মাথার উপরেই পাপের বোঝা চাপাইবে। বহিঃশত্রু হইতে নিজের গৃহ রক্ষা করা যেমন বীরত্বের নিদর্শন, সেই গৃহ শৃঙ্খলার সহিত পরিপাটিভাবে রাখাও অনুরূপ সাহসিকতার কাজ।

লক্ষ লক্ষ কৃষককে তাহাদের স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর দেখিতে দেখিতে, এবং ক্ষুদ্র সেবাগ্রামে প্রত্যহ তাহাদিগকে দেখিয়া আমি এই মত পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, কর্মভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক বিভাগ বর্তমান রহিয়াছে। মেয়ে কর্মকার বা সূত্রধর নাই। কিন্তু মাঠে স্ত্রী ও পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে —অবশ্য গুরুতর কাজগুলি পুরুষ করে। নারী গৃহরক্ষা করেন এবং গৃহকর্ম নির্বাহ করেন। মেয়েরা পরিবারের সামান্য আয় বৃদ্ধি করিলেও পুরুষেরাই কিন্তু মূল উপার্জনকারী।

কর্মভূমির বিভাগ স্বীকৃত হওয়ায়, নারী এবং পুরুষের উভয়েরই প্রায় একই রকমের সাধারণ গুণাবলী এবং কৃষ্টির আবশ্যকতা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের বা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে সত্য এবং অহিংসার নীতি গ্রহণ করিবার জন্য তাহার আদর্শ জনসাধারণের সম্মুখে স্থাপন করাই এই বিপুল সমস্যা সমাধানে আমার প্রয়াস। আমি এই আশা যত্নের সহিত পোষণ করিয়াছি যে, এই বিষয়ে নারীই অবিসম্বাদী নেত্রী হইবেন এবং মানব-জাতির ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান এইভাবে লাভ করিয়া নারী তাহার অপকৃষ্টতার ভাব বর্জন করিবেন। যদি সাফল্যের সহিত নারী ইহা করিতে পারেন তবে দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি কার্য যে যৌনস্পৃহা দ্বারা চালিত ও নিয়মিত হয়, এই আধুনিক মতবাদে তিনি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন। আমি হয়ত বিষয়টি এলোমেলোভাবে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার কথার ভাব সুস্পষ্ট। লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহারা যৌনস্পৃহারূপ ভূতগ্রস্ত, ইহা আমি অবগত নহি। এবং কৃষাণেরাও তাহাদের মাঠে একত্রে কাজ করিবার কালে এই ভাব দ্বারা অভিভূত বা পরিচালিত হয় না। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না বা এই আভাসও দেওয়া যাইতেছে না যে, তাহারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে স্বভাবজাত আসঙ্গলিপ্সা নিহিত রহিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত। কিন্তু যাহারা আধুনিক যৌন-সাহিত্যে মশগুল তাহাদের জীবনকে এই বৃত্তি যতটা পরিচালিত করে বলিয়া মনে হয়, কৃষাণদের জীবনকে যে

তাহা ততটা অভিভূত করে না ইহা অতি সুনিশ্চিত। কঠোর বাস্তবজীবনের বিভীষিকাময় সত্যের সম্মুখীন হইলে স্ত্রী কিংবা পুরুষ কাহারও এই সকল বিষয়ে মন দিবার সময় থাকে না।

এই পত্রিকার স্তম্ভে আমি প্রকাশ করিয়াছি যে, নারী অহিংসার অবতার। অহিংসার অর্থ অপরিসীম প্রেম এবং সেই প্রেমের অর্থ কষ্ট সহ্য করিবার অপরিসীম ধৈর্য। মানবজননী নারী ছাড়া আর কে সর্বাপেক্ষা বেশী এই শক্তি দেখাইতে পারেন? নয় মাস শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়া এবং পোষণ করিয়া তিনি ইহা প্রতিপন্ন করেন এবং তজ্জনিত কষ্টের ভিতরও আনন্দ অনুভব করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ের দুঃসহ যন্ত্রণাজনিত কষ্টের অপেক্ষা অধিক কষ্ট আর কি হইতে পারে? কিন্তু সৃজনের আনন্দে তিনি সেই সব ভুলিয়া যান। শিশু উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাউক, এই জন্য কে পুনরায় দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করে? তিনি সেই প্রেম বিশ্বমানবে অর্পণ করুন এবং তিনি যেন ভুলিয়া যান যে তিনি কখনও পুরুষের লালসার বস্তু ছিলেন বা হইতে পারেন; এবং তিনি পুরুষের পার্শ্বে থাকিয়া তাহার মাতারূপে, সৃজনকারিণীরূপে এবং নীরব নেত্রীরূপে নিজ গর্বিত সম্মানের স্থান অধিকার করিতে পারিবেন। শান্তিরূপ অমৃতের জন্য তৃষ্ণার্ত যুদ্ধরত জগতে শান্তিলাভের এই অপূর্ব কৌশল শিখাইবার ভার তাঁহার উপর। তিনি সত্যাগ্রহের নেত্রী হইতে পারেন, কারণ সেখানে পুঁথিগত বিদ্যার দরকার হয় না, কিন্তু কষ্টসহিষ্ণুতা এবং স্থিরবিশ্বাস হইতে যে হৃদয়বল উপজাত হয় তাহারই প্রয়োজন অত্যধিক।

কয়েক বৎসর পূর্বে যখন পুণাতে সাস্থন হাসপাতালে রুগ্নশয্যায় শায়িত ছিলাম তখন আমার সহৃদয়া সেবিকা একটি স্ত্রীলোকের গল্প আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি ক্লোরোফরম লইতে অস্বীকার করেন পাছে গর্ভস্থ শিশুর জীবন সংকটাপন্ন হয়। তাঁহার উপর যন্ত্রণাদায়ক একটি অস্ত্রোপচার করা হয়। শিশুর প্রতি তাঁহার ভালবাসাই তাঁহাকে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা সহ্য করিবার সামর্থ্য দেয়, কারণ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করার জন্য কোন প্রকার কষ্ট বা যন্ত্রণাই তাঁহার পক্ষে অসহনীয় ছিল না। এই শ্রেণীর বীররমণী নারীদের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়; কাজেই তাঁহারা যেন তাঁহাদের নারীত্বকে ঘৃণা না করেন এবং তাঁহারা পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া যেন দুঃখ না করেন। এই বীররমণীর বিষয় ভাবিলে অনেক সময় নারীর প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে আমার ঈর্ষা জন্মে; কিন্তু তিনি নিজের গৌরব ও মর্যাদা যদি একবার উপলব্ধি করিতেন! পুরুষের পক্ষে নারীজন্ম লাভের যতটা কারণ দেখা যায়, নারীর পক্ষেও পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজসেবার যৌক্তিকতা ততটাই রহিয়াছে, কিন্তু এই ইচ্ছা ফলবতী হইবার নয়। আমরা যে যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকি এবং প্রকৃতি আমাদিগকে যে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিধান করিয়াছেন তাহাই যেন সম্পন্ন করিতে পারি।

সেবাগ্রাম, ১২-২-'৪০

[হরিজন, ২৪-২-'৪০]

৯

নারীগণ ও তাঁহাদের কাজ

প্রশ্ন : আপনার মতে "নারীকে তাহার গৃহকর্ম হইতে সরাইয়া আনা বা তাহা পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করা এবং সেই গৃহরক্ষার জন্য তাহার কাঁধে বন্দুক তুলিয়া দেওয়া পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই অপমানজনক। ইহা বর্বরতার দিকে পুনরভিযান এবং বিনাশের সূচনা।" কিন্তু মাঠে এবং কারখানা প্রভৃতিতে যে লক্ষ লক্ষ মেয়ে মজুর রহিয়াছে, তাহাদের বিষয় কি বলিতে চান? তাহারা গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া "উপার্জনকারী" হইতে বাধ্য হইয়াছে। আপনি কি শিল্প-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া পাথরের যুগে ফিরিয়া যাইতে চান? উহাও কি বর্বরতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিনাশের সূত্রপাত হইবে না? যে নূতন সংস্থানে নারীগণের কাজ করিবার পাপ থাকিবে না, আপনার কল্পিত সেই ব্যবস্থা কী?

উত্তর : যদি লক্ষ লক্ষ নারী গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া উপার্জনশীলা হইতে বাধ্য হয়—ইহা গর্হিত বটে, কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে করিবার মতো গর্হিত নয়। শ্রমের মধ্যে মূলতঃ কোন বর্বরতা নাই। যে নারীগণ গৃহকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বেচ্ছায় মাঠে কাজ করে, তাহাদের মধ্যে আমি বর্বরতার কোন লক্ষণ দেখি না। আমার কল্পিত নূতন ব্যবস্থায় পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভের জন্য সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে। নূতন ব্যবস্থায় নারী কতক সময়ের জন্য মজুরী করিবে,

তবে তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইবে গৃহকর্ম দেখাশুনা করা। নূতন যুগে বন্দুক চিরস্থায়িভাবেই থাকিবে, ইহা আমি মনে করি না ; পুরুষের সম্বন্ধেও ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইতে থাকিবে। যতদিন চলে ইহা অপরিত্যাজ্য অমঙ্গল হিসাবেই চলিবে। কিন্তু আমি নারীকে ইচ্ছা করিয়া এই অকল্যাণের স্পর্শে কলুষিত করিতে চাই না।

সেবাগ্রাম, ১২।৩।৪০

[হরিজন, ১৬-৩-'৪০]

১০

সাহিত্যে নারীজীবনের বিকৃত ছবি

গান্ধীজী পরে একটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন ; বিষয় নির্বাচনী কমিটীতে এই বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশের ও সুযোগের অভাবে সে সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন নাই। জ্যোতিঃ-সঙ্ঘ নামীয় নারী আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত মহিলাগণ দ্বারা তাঁহার নিকট লিখিত একখানা চিঠি প্রসঙ্গে তিনি উক্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই চিঠিতে সাহিত্যে নারীর বিকৃত বর্ণনা সম্বন্ধে বর্তমান যুগের মনোবৃত্তির নিন্দা করিয়া তাঁহাদের গৃহীত একটি প্রস্তাবের নকল দেওয়া ছিল। গান্ধীজীর মতে এই অভিযোগ খুব যুক্তিযুক্ত। তিনি বলিয়াছিলেন, "অভিযোগের মূল বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের লেখকগণ নারীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া

থাকেন। যে দুর্বল ভাবপ্রবণতা দ্বারা তোমরা তাঁহাদিগকে চিত্রিত কর এবং সকল শালীনতা বিস্মৃত হইয়া যেভাবে তাঁহাদের রূপ বর্ণনা কর, তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত রুষ্ট এবং ব্যথিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের সকল সৌন্দর্য ও শক্তি কি তাঁহাদের রূপে বা পুরুষের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি তৃপ্ত করিতেই অবসিত হয়? উক্ত পত্রের লেখিকাগণ সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আমাদিগকে চিরকালের জন্য নিরীহ, বিনীত দাসদাসীর করণীয় যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকর্মের জন্যই নির্দিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইবে কেন?" তাঁহাদের স্বামীরাই বা তাঁহাদের একমাত্র দেবতা হইবে কেন? তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যেরূপ তাঁহাদিগকে সেইরূপভাবে চিত্রিত করা হয় না কেন? তাঁহারা বলেন, "আমরা স্বর্গীয় অপ্সরাও নই, খেলার পুতুলও নই, অথবা কামনা-বাসনার স্নায়ুকুণ্ডলীও নই। পুরুষের মতো আমরাও মানুষ এবং আমাদের ভিতরও স্বাধীন হইবার প্রেরণা সমভাবে বিদ্যমান।" তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের মানসিক ভাব খুব ভালভাবেই জানি, এই দাবী আমি করিতে পারি। এমন সময় গিয়াছে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি অসংখ্য নারীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতাম—তাঁহাদের পরিবারের পুরুষগণ সকলেই জেলে গিয়াছিল। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় ষাট জন আমার সঙ্গে থাকিত; আমি ছিলাম সকল বালিকা এবং বয়স্কাগণের ভ্রাতা এবং পিতাস্বরূপ। আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি—আমার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের শক্তি এবং উৎসাহ এরূপ বাড়িতে থাকে যে অবশেষে তাঁহারা নিজেরা দলে দলে কারাগারে গিয়াছিল।

আমাকে বলা হইয়াছে যে, আমাদের সাহিত্যও নারীদিগের অতিরঞ্জিত অপচিত্রে পরিপূর্ণ। আমি বলিতে চাই, নারী-জীবনের উক্ত চিত্র সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। পরীক্ষার জন্য তোমাদের নিকট একটি সামান্য বিষয় উল্লেখ করিব। নারী সম্বন্ধে লিখিবার সময় তোমরা কি ভাবে চিন্তা কর? আমি এই বলিতে চাই যে, কাগজে লেখনী চালাইবার পূর্বে নারীকে তোমার নিজ মাতারূপে চিন্তা করিও এবং আমি দৃঢ়তার সহিত এই কথা তোমাদিগকে বলিতে পারি যে, তৃষিত পৃথিবীকে জলসিক্ত করিতে আকাশ হইতে বর্ষিত সুন্দর বারিধারার ন্যায় তোমাদের লেখনী হইতে শুচি, সংযততম সাহিত্য প্রসূত হইবে। কোন নারীকে তোমার সহধর্মিণীরূপে দেখিবার পূর্বে অপর এক নারী তোমার মাতা ছিলেন ইহা স্মরণ রাখিও।

কোন কোন লেখক তাঁহাদের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করা দূরে থাকুক বরং তাঁহাদের প্রবৃত্তিসমূহের ইন্ধন যোগাইয়া থাকেন এবং ইহা এতদূর গড়ায় যে কৃপার পাত্রী মূর্খ নারীগণ আমাদের উপন্যাসে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সব অপবর্ণনা দেওয়া হয় তাহার সহিত কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া অযথা জীবন ক্ষয় করে। আমি ভাবি, তাঁহাদের দেহ-সৌষ্ঠবের বিস্তৃত বর্ণনা কি সাহিত্যের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ? এই প্রকারের কিছু তোমরা উপনিষৎ, কোরান বা বাইবেলে দেখিতে পাও কি? ইহা সত্ত্বেও তোমরা কি জান যে বাইবেল বাদ দিলে ইংরেজী সাহিত্য একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে? ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হয়—উহার তিন অংশ বাইবেল এবং এক

অংশ শেক্সপীয়র। কোরান বাদ দিলে আরবী ভাষা লোকে ভুলিয়া যাইবে! তুলসীদাসকে বাদ দিয়া হিন্দীভাষার কথা ভাবিতে পার? বর্তমান যুগে নারী সম্বন্ধে সাহিত্যে যাহা দেখিতে পাও ইহাতে সেরূপ কিছু দেখিতে পাও কি?"

মহাদেব দেশাই

[হরিজন, ২১-১১-'৩৬]

১১

সহবাস-সম্মতির বয়স

মিসেস ডোরথী জিনরাজদাস ব্যবস্থাপক সভায় আনীত একটি আইনের খসড়া সম্বন্ধে একখানা পত্র চারিদিকে প্রচার করিয়াছেন। সহবাস-সম্মতির বয়স অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দ বৎসরে উন্নীত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। উক্তরূপে প্রচারিত চিঠির একখানা নকল তিনি আমাকে পাঠাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে 'শিশু রক্ষা আইন' যাহা পেশ হইবে তাহার সমর্থনকল্পে আপনার শক্তি নিয়োজিত করিবার অনুরোধ জানাইয়া এই চিঠি লিখিতেছি। আমার দৃঢ় ধারণা এই, যদি ভারতবর্ষ একটি বড় জাতিতে পরিণত হইতে চায় এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন হইতে চায়, তবে শিশুমাতৃত্বের কলঙ্ক ভারত হইতে দূর করিতেই হইবে।

গতবার যখন এই খসড়া আইন উত্থাপিত হয়, দেশে এবং ব্যবস্থাপক সভাতে ইহা যথেষ্ট সমর্থন লাভ করে এবং আমার ধারণা

যে, যদি জনসাধারণ হইতে তাহাদের মতের অভিব্যক্তি কিয়ৎ-পরিমাণেও আমরা পাই তবে আগামী অধিবেশনে ইহা আইনে পরিণত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, এই খসড়া আইনের সমর্থনকল্পে দেশের সর্বত্রই বহুসংখ্যক সভা হইতেছে, বিশেষতঃ নারীগণের উদ্যোগে—এবং এই বিষয়েও আমি নিশ্চিত যে, অধিকাংশ নারীগণেরই ইচ্ছা যে অল্পবয়স্কা বালিকাদের পক্ষে স্বামীসঙ্গের বয়স অন্ততঃ চতুর্দশ করিতে হইবে।

আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, আপনি যদি এই খসড়া আইনের স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে আপনার মত প্রকাশ করেন এবং সকল পুরুষ ও নারীকে ইহা সমর্থন করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং উহার মূলনীতি অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতে বিশেষভাবে বলেন, তবে যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে।"

—আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই খসড়া আইন সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না, কিন্তু সহবাস-সম্মতির বয়স চৌদ্দ কেন, এমনকি ষোলতে তুলিবার পক্ষে আমি দৃঢ়মত পোষণ করি। যদিও আমি আইনের ধারাগুলি সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারিতেছি না তথাপি তরুণবয়স্কা নিরপরাধ বালিকাগণকে পুরুষের কামনার লোলুপতা হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে যে কোনও আন্দোলন আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিব। আমার বিনীত মত এই যে, চতুর্দশ বৎসর বয়সেও স্বামী-সংসর্গ নিঃসন্দেহরূপে নীতিবিরুদ্ধ এবং মনুষ্যত্ববর্জিত ব্যাপার এবং তথাকথিত বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করিলেই স্ত্রীসঙ্গের অধিকার বৈধ ও আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়। যে প্রচলিত আচার আদৌ নীতিবিরুদ্ধ তাহাকে পবিত্র করিবার জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রীয় বচনের

আশ্রয় নেওয়া যায় না—কারণ সেগুলির প্রামাণ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বহুসংখ্যক শিশুমাতার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং যখন বাল্যবিবাহের বিভীষিকার সহিত বাধ্যতামূলক বাল-বৈধব্য আসিয়া যুক্ত হয়, তখন মানবজীবনের দুঃখান্তক নাটকের যবনিকাপতন হয়। সহবাস-সম্মতির বয়স বাড়াইবার যে কোন যুক্তিযুক্ত আইন নিশ্চয়ই আমার অনুমোদন লাভ করিবে। কিন্তু আমি ইহা জানিয়া অত্যন্ত ব্যথিত যে, বর্তমান আইনও জনমতের সমর্থন না পাওয়াতে ফলপ্রসূ হয় নাই। এই বিষয়ে এবং অন্যান্য দিকেও সংস্কারকের কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। হিন্দু জনসাধারণের উপর কোন মতবাদ প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করিতে হইলে ক্রমিক আন্দোলন সর্বদা চালাইয়া যাইতে হইবে। যাঁহারা ভারতের বালিকাগণকে অকাল-বার্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং দুর্বল ও রুগ্ন শিশুদিগের জন্মদানের দায়িত্ব হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার মহৎ কর্তব্যে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁহাদের সর্বপ্রকার সফলতা কামনা করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-'২৫]

১২

বাল্যবিবাহের অভিশাপ

মিসেস মারগারেট ই. কাজিনস্ মাদ্রাজের একটি সদ্য-সংঘটিত শোকাবহ ঘটনার তথ্য আমাকে পাঠাইয়াছেন ; একটি বাল্যবিবাহ হইতে উহা উদ্ভূত ; বালিকার বয়স ছিল তের এবং স্বামীর ছাব্বিশ। স্বামী-স্ত্রী তের দিনও একত্রে বাস করে নাই, যখন বালিকাটি পুড়িয়া মারা যায়। জুরীগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তথাকথিত স্বামীর অসহনীয় ও অমানুষিক কামনাপূরণের প্রচেষ্টা মেয়েটির আত্মহত্যার কারণ। বালিকার মৃত্যুকালীন উক্তিতে দেখা যায় যে, "স্বামী"ই তাহার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। রিপুর উত্তেজনায় দয়া-মায়া বা বুদ্ধি-বিচারের স্থান নাই। বালিকাটি কিভাবে মরিল, ইহা অবান্তর। অবিসম্বাদিত ঘটনাগুলি এই :—

১। বালিকাটির যখন মাত্র তের বৎসর বয়স তখন তাহার বিবাহ হয় ;

২। তাহার কোন যৌন-স্পৃহা জন্মে নাই ; কারণ সে তাহার স্বামীর কামনাপূরণে বাধা দিয়াছিল ;

৩। ঐ "স্বামী" নিষ্ঠুরভাবে কামনা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিল ;

৪। মেয়েটি আর এখন জীবিত নাই।

কোন পাশবিক প্রথা ধর্মের নামে অনুমোদন করা ধর্ম নহে—ইহা অধর্ম। স্মৃতিসমূহ পরস্পর-বিরোধী মতবাদে

পরিপূর্ণ। ঐ সকল পরস্পর-বিরোধী বিষয় হইতে একমাত্র যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত এই করা যায়—যে সকল শাস্ত্রবাক্য সর্বজনবিদিত এবং সর্বজনসম্মত নৈতিক আচারের বিরোধী—বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত নীতিমূলক উপদেশেরও বিরোধী—সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জন করিতে হইবে। যে লেখনী হইতে মানুষের পশুবৃত্তিকে প্ররোচিত করিবার কবিতা রচিত হইয়াছে, আত্মসংযমের উদ্দীপনাময়ী কবিতারাশি একই সময়ে সেই একই লেখনীপ্রসূত হইতে পারে না। দুষ্কর্মে নিমজ্জিত এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমবিহীন মানুষই বলিতে পারে যে রজস্বলা হওয়ার পূর্বে কোন বালিকাকে পাত্রস্থ না করা পাপ। রজস্বলা হওয়ার পরও কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন বালিকাকে বিবাহ দেওয়া পাপকার্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই সময়ের পূর্বে বিবাহ-বিষয়ে কোন চিন্তাও আসিতে পারে না। বালক যেমন তাহার গোঁফ গজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত হয় না, তদ্রূপ রজস্বলা হওয়া মাত্রই কোন বালিকাও গর্ভধারণ করিতে সক্ষম হয় না।

বাল্যবিবাহপ্রথা নৈতিক এবং শারীরিক ব্যাধি। কারণ ইহা আমাদের নৈতিক চরিত্রের সর্বনাশ সাধন করে এবং শারীরিক অবনতি ঘটায়। এই শ্রেণীর প্রথাসমূহ সমর্থন করিয়া আমরা ভগবানের নিকট হইতে এবং স্বরাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। যে ব্যক্তি বালিকাদের অপ্রাপ্ত বয়সের বিষয় ভাবে না, সে ভগবানের সম্বন্ধেও চিন্তা করে না।

অপরিণতবয়স্ক পুরুষের স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ করিবারও ক্ষমতা থাকে না এবং স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করার শক্তি সে লাভ করে না। স্বরাজের জন্য যুদ্ধ বলিতে শুধু রাজনৈতিক জাগরণ বুঝায় না, বুঝায় সর্বতোমুখী জাগরণ; যথা—সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাবিষয়ক।

সহবাস-সম্মতির বয়স বাড়াইবার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করা হইতেছে। অল্পসংখ্যক লোকের শাস্তিবিধানের জন্য ইহা ভাল হইতে পারে। কিন্তু জনপ্রিয় কোন ব্যাধি দূরীভূত করা আইনের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শিক্ষিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত জনমতই ইহা করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে আমি আইন প্রণয়নের বিরোধী নহি, কিন্তু জনমত গড়িয়া তোলার উপর আমি অধিকতর জোর দিয়া থাকি। যদি বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত বর্তমান থাকিত তবে মাদ্রাজের উক্ত ঘটনা অসম্ভব হইত। যে যুবকের বিষয় আলোচনা হইতেছে সে একজন নিরক্ষর শ্রমজীবী নয়, সে একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত টাইপিস্ট (typist)। যদি তরুণবয়স্কা বালিকাগণের বিবাহ কিংবা সহবাসের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল থাকিত তবে তাহার পক্ষে বালিকাটিকে বিবাহ করা বা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করা অসম্ভব হইত। সাধারণতঃ আঠার বৎসরের ন্যূনবয়স্কা মেয়েদের বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৮-'২৬]

১৩

বাল্যবিবাহ সমর্থনে

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার জনৈক পাঠক লিখিতেছেন :—

"১৯২৬ ইং ২৬শে আগস্টের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহের অভিশাপ' শীর্ষক আপনার লিখিত প্রবন্ধে নিম্নের বাক্যটি পড়িয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি : 'দুষ্কর্মে নিমজ্জিত এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমবিহীন মানুষই বলিতে পারে যে রজস্বলা হওয়ার পূর্বে কোন বালিকাকে পাত্রস্থ না করা পাপ।'

"আমি বুঝিতে পারি না যাঁহাদের মত আপনার মত হইতে ভিন্ন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আপনি উদার ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই কেন? ইহা নিশ্চয়ই কেহ বলিতে পারে যে, হিন্দু আইনপ্রণেতা বাল্যবিবাহ নির্দেশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্যবিবাহ সর্বদাই সমর্থন করেন তাঁহাদিগকে 'পাপে নিমগ্ন' বলা অত্যন্ত অন্যায়, ইহা আমি মনে করি। বিতর্কমূলক ব্যাপারে এই উক্তি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি আমি সর্বপ্রথম এই শুনিলাম। আমি যতদূর জানি, হিন্দু সংস্কারকগণ বা খৃষ্টান পাদ্রীগণও এরূপ কখনও বলেন নাই। মহাত্মা গান্ধীকে সম্পূর্ণতার প্রতিমূর্তি বলিয়াই বিশ্বাস করি—অন্ততঃ বিরুদ্ধবাদিগণ সম্বন্ধে তাঁহার সৌজন্য এবং উদারতা সম্বন্ধে; কাজেই কল্পনা করুন, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধে এইরূপ যুক্তির অবতারণা দেখিয়া আমি কিরূপ মর্মাহত হইয়াছি।

"আপনি দুই একজন হিন্দু আইনপ্রণেতাকে নয়, সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রত্যেককে ঘোর অপবাদ দিয়াছেন। কারণ আমি যতদূর জানি, প্রত্যেক স্মৃতিকার বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহের অনুশাসন

দিয়াছেন। আপনার কথিতমতে বাল্যবিবাহের অনুশাসন-বাক্যগুলি প্রক্ষিপ্ত, ইহা স্বীকার করা অসম্ভব। বাল্যবিবাহ প্রথা কোন প্রদেশে বা সমাজের শ্রেণীবিশেষে নিবদ্ধ নহে, বস্তুতঃ ইহা ভারতবর্ষে সর্বজনীন প্রথা। ইহা রামায়ণের সময় হইতে প্রচলিত অতি প্রাচীন প্রথাও বটে।

"বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেন সর্বদাই জোর দিয়াছেন তাহার কারণসমূহ আমি যাহা মনে করি তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। তাঁহারা ইহাই অত্যন্ত সঙ্গত মনে করিতেন যে, সাধারণ নিয়মই হইবে প্রত্যেক বালিকা একটি পতিলাভ করিবে। ইহা সাধারণতঃ সমাজের মঙ্গলের পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয়, বালিকাদের নিজেদের মানসিক শান্তি এবং সুখের জন্যও তদপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। যদি প্রত্যেক বালিকাকেই পতিলাভ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার পিতামাতাই পতি নির্বাচন করিবেন—মেয়েরা স্বয়ং করিবে না। যদি বালিকাদের উপর পতিনির্বাচনের ভার দেওয়া যায়, তাহার ফল হইবে এই যে, অনেক মেয়ের আদৌ বিবাহ হইবে না; ইহার কারণ এই নয় যে তাহারা বিবাহ পছন্দ করে না; কিন্তু কারণ এই যে, উপযুক্ত পতিনির্বাচন মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। পরন্তু ইহা বিপদসঙ্কুল, কেন না, ইহা যৌনপ্রগল্‌ভতার প্রশ্রয় দিয়া নীতির বন্ধনও শিথিল করিয়া দিতে পারে। যে সকল যুবক সচ্চরিত্র বলিয়া অনুমিত হয় তাহারা সরল বালিকাগণের ধর্মনাশ করিতে পারে। অপর পক্ষে, যদি পিতামাতার উপর নির্বাচনভার থাকে তাহা হইলে অল্প বয়সেই মেয়েদিগকে বিবাহ দিতে হইবে। তাহারা বয়স্কা হইলে প্রেমে পড়িতে পারে এবং পিতামাতার নির্বাচিত বরকে বিবাহ করিতে না চাহিতে পারে। অল্প বয়সে বিবাহিতা হইলে বালিকা পতির সহিত এবং তাহার পরিবারের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়।

এইরূপ বিবাহ অধিকতর স্বাভাবিক এবং দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতা দান করে। বয়স্কা মেয়েদের রুচি ও ভাব এবং অভ্যাসাদি বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং নূতন পরিবারের সঙ্গে নিজেদের মিশাইয়া লইতে অনেক সময় তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়।

"বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে মেয়ের এবং তাহার সন্তানগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। নিম্নলিখিত কারণে এই আপত্তি খুব সঙ্গত মনে হয় না। বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু জাতি পূর্বাপেক্ষা দুর্বল হইতেছে। পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পূর্বে স্ত্রী এবং পুরুষ বর্তমান হইতে সাধারণতঃ অধিক সবল, স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীবী ছিল। কিন্তু বাল্যবিবাহ তখন আরও বেশী প্রচলিত ছিল। অধিক বয়সে বিবাহিতা শিক্ষিতা মেয়েদের স্বাস্থ্য অল্প বয়সে বিবাহিতা অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিতা মেয়েদের স্বাস্থ্য হইতে সাধারণতঃ ভাল নয়। এই সকল ঘটনা হইতে ইহা সম্ভবপর মনে হয় যে, বাল্যবিবাহে শারীরিক অবনতি যতটা হয় বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, ততটা হয় না।

"আপনি ইউরোপীয়, এবং ভারতীয় সমাজ উভয়ই ভালরূপ জানেন। আপনি বলিতে পারিবেন ইউরোপীয় বিবাহিতা নারীগণ হইতে ভারতের বিবাহিতা নারীগণ স্বামীর প্রতি মোটের উপর বেশী অনুরক্ত কি না; গরীবদের মধ্যে ভারতীয় পতিগণ তাহাদের পত্নীগণের প্রতি ইউরোপীয় পতিগণের অপেক্ষা অধিক সদয় ব্যবহার করে কিনা; ইউরোপীয়দের অপেক্ষা ভারতীয়দের মধ্যে অপ্রীতিকর বিবাহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম কিনা; ইউরোপীয় সমাজ হইতে ভারতীয় সমাজে যৌনবিষয়ক নীতিজ্ঞান উন্নততর কিনা। এই সকল বিষয়ে যদি ভারতীয় বিবাহ ইউরোপীয়দের বিবাহ হইতে অধিকতর

সাফল্য লাভ করিয়া থাকে তবে ভারতীয় বিবাহ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যে বাল্যবিবাহ, উহার অপবাদ দেওয়া উচিত নয়।

"আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বালিকাদের বাল্যবিবাহের অনুশাসন দিতে গিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সাধারণতঃ সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর প্রকৃত মঙ্গল চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন। আমি বিশ্বাস করি কন্যার বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিকূল পরিবেশের ভিতরও ইহাই সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছে এবং ধ্বংসের পথে সমাজকে বাধা দিয়া রক্ষা করিয়াছে। আপনি এই সব বিশ্বাস নাও করিতে পারেন। কিন্তু আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আপনি অন্ততঃ আপনার এই মত পরিত্যাগ করিবেন—যে সকল মনীষী হিন্দুশাস্ত্রকার কন্যার বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে সর্বদা বিশেষ জোর দিয়াছেন তাঁহারা আত্মসংযমের ধার ধারিতেন না এবং 'পাপে নিমজ্জিত' ছিলেন?

"আপনার প্রকাশিত মাদ্রাজের ঘটনাটি অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়। জুরীগণ সাব্যস্ত করেন যে বালিকাটি আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু বালিকা বলে, তাহার স্বামী তাহার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই পরস্পর-বিরোধী অবস্থার মধ্যে আপনি যে বিষয়গুলি অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া মনে করেন সেগুলি প্রকৃতই সেইরূপ ইহা ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। তের বৎসরের নিম্নবয়স্কা বিবাহিতা বালিকার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হইবে। ইতঃপূর্বে স্বামীর নিষ্ঠুর প্রস্তাবের জন্য আত্মহত্যার একটি ঘটনাও শুনা যায় নাই। মাদ্রাজের ঘটনায় সম্ভবতঃ কোন বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল এবং বাল্যবিবাহ মৃত্যুর মুখ্য কারণ ছিল না।"

—কবি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন: "যে সকল ঘটনা গোপনে বিবেককে আঘাত করে তাহাদের কঠোরতা প্রশমিত করিবার

জন্য উপযুক্ত দার্শনিক যুক্তি তৈয়ার করিতে অতি অল্প আয়াসের প্রয়োজন হয়।" 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' এই পাঠক এক পা বেশী অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি শুধু উপযুক্ত দার্শনিক যুক্তি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু ঘটনাবলী লক্ষ্য না করিয়া অপ্রমাণিত বিবরণের উপর তাঁহার যুক্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

উদারতার অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি; শুধু এই কারণে যে, আমি শাস্ত্রকারগণকে দোষ দিই নাই, কিন্তু যাঁহারা মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বিবাহ দিতে জেদ করেন, আমি তাঁহাদের প্রতিই পাপাচরণ আরোপ করিতে সাহস করিয়াছি। যখন বিনা কারণে কোন জীবিত ব্যক্তিকে, কল্পিত ব্যক্তিকে নয়, তাহার অসাধু উদ্দেশ্যের জন্য দোষ দেওয়া হয়, কেবল তখনই উদারতার অভাব আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। স্মৃতিসমূহের প্রবর্তকগণ, যাঁহারা আত্মসংযম শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারাই যে ছোট ছোট বালিকাদের বিবাহের অনুশাসন কবিতায় রচনা করিয়াছেন, উক্ত লেখকের ইহা বলিবার কি কোন যুক্তি বা প্রমাণ আছে? ঋষিগণের প্রতি অপবিত্রতা আরোপ করা যায় না এবং মানবদেহের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি-সম্পর্কিত মূলবিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এই দোষও দেওয়া যায় না—এইরূপ অনুমান করা কি অধিকতর উদারতার পরিচায়ক নয়?

কিন্তু যদি বা বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের অনুজ্ঞা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান-

লব্ধ জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে সেই সকল অনুজ্ঞা উপেক্ষা করিতে হইবে। এস্থলে বাল্যবিবাহকে পরিণত বয়সের পূর্বে বিবাহ হইতে পৃথক্ ধরিতে হইবে—পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্বের বিবাহকেই এরূপ বিবাহ বলা যায়। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ সর্বজনীন, এই উক্তির সত্যতা আমি অস্বীকার করি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব যদি আমি দেখিতে পাই যে, শিশুকালেই "লক্ষ লক্ষ বালিকা" বিবাহিতা অর্থাৎ তাহারা পত্নীরূপে জীবন যাপন করে। যদি "লক্ষ লক্ষ বালিকার" বিবাহ, ধরুন, এগার বৎসরেই সহবাস দ্বারা পরিণতি লাভ করিত তবে বহু পূর্বেই হিন্দুগণ জাতি হিসাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

এই সিদ্ধান্তেও আসা যায় না যে, যদি পিতামাতাগণ তাঁহাদের কন্যাদের পতি নির্বাচন করিতে থাকেন তাহা হইলেও বিবাহ এবং তাহার আচার অপরিণত বয়সেই করাইতে হইবে। মেয়েদিগকে তাহাদের পতিনির্বাচন করিতে দিলে নিশ্চয়ই রূপজ কিংবা প্রেমজ বিবাহের প্রগল্‌ভতার প্রশ্রয় পাইবে, এই সিদ্ধান্তও সত্য হইতে পারে না। ইউরোপেও বিবাহের জন্য পরস্পর ভালবাসার অবাধ সুযোগ দেওয়া সর্বত্র প্রচলিত নয় এবং পনর বৎসর বয়সের পর হাজার হাজার হিন্দুমেয়ের বিবাহ হয় এবং সেই সব ক্ষেত্রে তাহাদের পিতা-মাতাই তাহাদের বর নির্বাচিত করেন। মুসলমান পিতা-মাতাগণ তাঁহাদের বয়স্থা কন্যাদের বর অপরিবর্তনীয়রূপে সর্বদাই নির্বাচিত করিয়া থাকেন। বরনির্বাচন মেয়েরা করিবে অথবা

তাহাদের পিতামাতাগণ করিবেন, ইহা একটি পৃথক্ প্রশ্ন এবং তাহা সামাজিক প্রথা দ্বারা নিয়মিত হয়।

লেখক যে উক্তি করিয়াছেন, বয়স্থা পত্নীগণের সন্তানগণ শিশু পত্নীগণের সন্তানগণ অপেক্ষা দুর্বল, তাহার সমর্থনে কোন প্রমাণ দেন নাই। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সমাজ উভয়ের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমি তাহাদের নৈতিক আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে তুলনা করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। তথাপি যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে ইউরোপীয় সমাজের নাতিবন্ধন হিন্দুসমাজের নীতিবন্ধন হইতে নিম্নস্তরের—ইহার স্বাভাবিক অনুমান কি এই হইবে যে, পূর্ণবয়স্কা হওয়ার পর বিবাহই এই অধোগতির কারণ ?

সর্বশেষ মাদ্রাজের ঘটনাটি লেখককে সহায়তা করে না, কিন্তু তিনি যে ভাবে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ইহাই প্রমাণিত হয় —এই সিদ্ধান্ত সত্য ঘটনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া করা হইয়াছে। তিনি যদি প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করেন তবে তিনি দেখিতে পাইবেন প্রমাণিত বিষয় হইতে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মৃত্যুর কারণ কি ছিল না ছিল, তদ্দারা আমার সিদ্ধান্ত কোনরূপ ব্যাহত হয় না। ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, (১) বালিকাটি তরুণবয়স্কা, (২) তাহার কোন যৌনস্পৃহা ছিল না, (৩) "স্বামী" নিষ্ঠুর যৌনসংসর্গের প্রস্তাব করিয়াছিল এবং (৪) সে বাঁচিয়া নাই। যদি মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট মন্দ ; যদি তাহার স্বামী তাহার পাশবিক

লালসা পূরাইতে রাজী না হওয়ার দরুন তাহাকে খুন করিয়া থাকে তবে তাহা ততোধিক মন্দ। বয়স অনুযায়ী বালিকাটি শুধু খেলা ও শিক্ষালাভ করিবার উপযুক্ত ছিল—পত্নীরূপে চলিবার এবং তাহার ক্ষুদ্র কাঁধের উপর গৃহিণীপনার যাবতীয় দায়িত্ব বহন করিবার অথবা জনৈক সর্বেসর্বা প্রভুর যুগ্মকাষ্ঠ স্কন্ধে নিবার যোগ্যতা তাহার ছিল না।

আমার পত্রলেখক সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। জাতি তাঁহার সুশিক্ষিত পুত্রকন্যাগণের নিকট ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ প্রত্যাশা করে এবং তাঁহারা জাতির সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন এবং জাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করিবেন—ইহাও তাঁহাদের নিকট আশা করা যায়। নৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক বহু ব্যভিচার আমাদের মধ্যে বর্তমান। সেইগুলি ধৈর্যের সহিত অনুধাবন করা, তৎসম্বন্ধে যত্নের সহিত গবেষণা করা, সেগুলিকে সতর্কতার সহিত অনুশীলন করা, তৎসম্বন্ধে যথাযথ বিবৃতি দেওয়া এবং অনাবিল চিন্তা ও ধীর পক্ষপাতশূন্য সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। তার পরে প্রয়োজনমত আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত মতও পোষণ করিতে পারি। কিন্তু যদি আমরা সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য শ্রম স্বীকার না করি এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হই—তাহা যতই কষ্টসাধ্য হউক না কেন—আমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই দেশের, আমাদের নিজ নিজ ধর্মের এবং জাতীয় আন্দোলনের অনিষ্ট বই ইষ্ট সাধিত হইবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৯-'২৬]

১৪

বালিকা বধূগণের দুর্গতি

"বাঙ্গালা হইতে একজন হিন্দু মহিলা" লিখিতেছেন ঃ—

"আমাদের হিন্দুসমাজের নিরুপায় বালিকাবধূগণের সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন তজ্জন্য কি ভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দিব জানি না। মাদ্রাজের ঘটনাটিই একমাত্র বিশিষ্ট ঘটনা নহে। এক বৎসর পূর্বে এইরূপ একটি ঘটনা কলিকাতায় ঘটে। বালিকার বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। দুই রাত্রি স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া সে তাহার নিকট কিছুতেই আর যাইতে চায় না। একদিন তাহার মা মেয়েটিকে একটি পান দিবার ছলে এই লোকটির নিকট পাঠায়। সম্ভবতঃ সেই হতভাগ্য মেয়েটি মনে করিয়াছিল যে, তাহার স্বামীর হাতে পান দিয়াই ফিরিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু লোকটি দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে অতি কাতর ঘড়ঘড়ানি আর্তনাদ শুনা যায়। বালিকার মা দৌড়াইয়া ঐ ঘরে যায়। যখন দরজা খোলা হইল তখন দেখা গেল বালিকাটি মরিয়া গিয়াছে— "স্বামী" তাহাকে এমন গুরুতরভাবে মস্তকে আঘাত করিয়াছিল!

"লোকটির আদালতে বিচার হয় এবং তাহার ফাঁসির হুকুম হয়।

"কে জানে আমাদের সমাজে এরূপ কত ঘটনা হয় যাহার কোন সংবাদ কেহ রাখে না। আমি নিজে এরূপ ঘটনা অনেক জানি যেখানে বালিকা বধূ বয়স্কা হওয়ার পূর্বে স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত।

"কিন্তু তাহাদের পক্ষে কথা বলিবে কে? আমাদের মেয়েরা সর্বদাই শান্তভাবে নীরবে তাহাদের দুঃখের ভার বহন করিয়া যায়। তাহাদের

এমন কোন শক্তি আর থাকেই না যদ্দ্বারা কোনপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে। এবং আমাদের পুরুষগণ তাহাদের অপরিসীম ক্ষমতার বলে কেবল তাহাদের নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ই ভাবে এবং নিরুপায় নারীগণের বিষয় একটুকুও ভাবে না।

"আমার পরিচিত একটি ব্রাহ্মণ মহিলার দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর নিকট যাইতে চান না। কাজেই স্বামী আর একটি বয়স্থা মেয়েকে বিবাহ করেন। এই হতভাগ্য মহিলা বর্তমানে তাঁহার পূর্ণযৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছেন।

"একজন মহিলার নিকট শুনিলাম যে, গ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে স্বামীরা প্রায়ই তাহাদের বালিকাবধূগণকে প্রহার করে, কারণ তাহারা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে এবং রাত্রিতে তাহাদিগকে সহজে স্বামীর ঘরে ঢুকাইতে পারা যায় না।

"যেখানে ভুক্তভোগিগণের নিজেদের জন্য কোন কথা বলিবার সুযোগ নাই বা বলিলেও সমাজে নির্যাতিত হইতে হয়, সেখানে অমানবোচিত প্রথা সমর্থন করা অতি সহজ।"

—যে চিত্র এখানে অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা বাস্তব জীবনে সত্য হউক বা অতিরঞ্জিত হউক, ইহার সারকথা নিশ্চয়ই সত্য। ইহা সমর্থন করিবার জন্য আমার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। বেশ পসার আছে এমন একজন ডাক্তারকে আমি জানি ; তিনি বয়স্ক, বিপত্নীক এবং তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইবার উপযুক্ত বয়সের একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা "স্বামী-স্ত্রী" রূপে একত্র বাস করিতে-ছিলেন। অপর একজন ষাট-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ বিপত্নীক শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন, তিনি নয় বৎসর বয়সের একটি

বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। যদিও সকলেই এই কেলেঙ্কারীর কথা জানিত এবং ইহাকে কেলেঙ্কারী বলিয়াই মনে করিত—তিনি সরকার এবং জনসাধারণ কর্তৃক বাহ্যতঃ সম্মানিত হইয়াই ইন্‌স্‌পেক্‌টরের কার্য করিতে থাকেন। আমার স্মৃতি হইতে বন্ধুগণের ভিতরও এরূপ আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর।

উক্ত মহিলা লেখিকা যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোনপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য বাধা দিবার শক্তি ভারতের নারীর ভিতর আর নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইরূপ অবস্থার জন্য পুরুষই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু মেয়েরা কি সর্বদাই পুরুষের উপর দোষ অর্পণ করিয়া নিজেদের বিবেককে বাঁচাইতে পারেন? তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে নারীজাতির প্রতি এবং যে পুরুষ জাতির তাঁহারা মাতৃস্থানীয়া তাঁহাদের প্রতিও কি কর্তব্য নয় যে, তাঁহারা নিজেরা সমাজ সংস্কারের ভার গ্রহণ করিবেন? তাঁহারা যে শিক্ষালাভ করিতেছেন তাহার সার্থকতা কী থাকে, যদি বিবাহের পর তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের খেলার পুতুল হইয়া পড়েন এবং অপ্রাপ্ত বয়সেই ভবিষ্যৎ মানবনামধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকে লালনপালন করিবার কাজে ব্যাপৃত হন? তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করিতে পারেন। ইহাতে সময়ও লাগে না এবং কষ্ট স্বীকারও করিতে হয় না। ইহা তাঁহাদিগকে নির্দোষ আমোদ প্রদান করিবে। কিন্তু সেই সকল সৎসাহসী নারীগণ কোথায় যাঁহারা

বালবধূ ও বালবিধবাগণের ভিতর কাজ করিবেন? প্রাপ্ত-বয়স্কা হওয়ার পূর্বে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকার প্রত্যেক বালিকার রহিয়াছে; যে ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার চূড়ান্ত নির্দেশ তাহাকে দেওয়া হয় সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারও তাহার রহিয়াছে। যতদিন প্রত্যেক বালিকা সেই অধিকার বজায় রাখিয়া চলিবার যথেষ্ট ক্ষমতা নিজের ভিতর অনুভব না করিবে, এবং যতদিন বাল্যবিবাহ অসম্ভব করিয়া তুলিতে না পারা যাইবে, ততদিন নিজেদের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে না এবং পুরুষদিগকেও বিশ্রাম দিবে না—এইরূপ বীরাঙ্গনাগণ কোথায়?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-১০-'২৬]

১৫

বাল্যবিবাহের ভয়াবহ অবস্থা

বাল্যবিবাহপ্রথাবিরোধী সমিতি (Anti-Child Marriage Committee) তৎসম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় এবং তথ্যপূর্ণ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে। মূল দফাগুলি আমি নিম্নে নকল করিয়া দিতেছি :—

"১৯৩১ সনের ভারতবর্ষের আদমসুমারিতে পনর বৎসরের কম বয়সে বিবাহিতা বালিকাগণের নিম্নলিখিত বয়ঃক্রম এবং সংখ্যানুযায়ী বিভাগ দেখা যায় :—

বয়ঃক্রম অনুযায়ী বিভাগ	শতকরা বিবাহিতার সংখ্যা
১ বৎসর বয়সের	·৮
১—২ ” ”	১·২
২—৩ ” ”	২·০
৩—৪ ” ”	৪·২
৪—৫ ” ”	৬·৬
৫—১০ ” ”	১৯·৩
১০—১৫ ” ”	৩৮·১

ইহা হইতে দেখা যায় এক বৎসরের ন্যূনবয়স্কা ১০০টি বালিকার মধ্যে প্রায় গড়ে একটি বালিকা বিবাহিতা এবং এই ভয়াবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি পনর বৎসরের ন্যূন বয়সের সব বিভাগেই দেখা যায়।

"ইহার একটি ফল এই যে, এই দেশে বালবিধবাগণের সংখ্যা এত বেশী যে বিশ্বাস করা যায় না।

বয়ঃক্রম অনুযায়ী বিভাগ	বিধবাগণের সঠিক সংখ্যা
১ বৎসর বয়সের	১৫১৫
১—২ ” ”	১৭৮৫
২—৩ ” ”	৩৪৮৫
৩—৪ ” ”	৯০৭৬
৪—৫ ” ”	১৫০১৯
৫—১০ ” ”	১০৫৪৮২
১০—১৫ ” ”	১৮৫৩৩৯

"ইহা বলা হইয়া থাকে যে, বাল্যবিবাহের কুফল সংখ্যা হিসাবে দেখিতে গেলে সামান্য এবং এই প্রথাও সার্বজনীন নহে; কিন্তু যদিও এই সকল সংখ্যা হইতে প্রকাশিত বালবিধবাগণের সংখ্যা প্রকৃত

অঙ্কের একশত ভাগের এক ভাগ—কোন লোকহিতৈষী সরকার বা জনসাধারণ এই দুর্দশার মূল কারণ নিরাকরণে এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে পারে না। এই বিষয়ে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল শিশুবিধবার অধিকাংশ পুনর্বিবাহ হইতে বঞ্চিত।

"বাল্যবিবাহের আর একটি কুফল সন্তানপ্রসবের সময় অল্পবয়স্কা প্রসূতিগণের মৃত্যুসংখ্যা। ভারতবর্ষের বাৎসরিক গড়পড়তা এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা দুই লক্ষ অর্থাৎ ঘণ্টায় কুড়িটি করিয়া প্রসূতি মারা যায়। আবার তাহাদের অধিকাংশের বয়সই উনিশের নীচে। স্যর্ জন মেগ্‌উ (Sir John Megau)-র মতে 'প্রত্যেক একহাজার বাল-প্রসূতির মধ্যে তাহাদের প্রজননশক্তি বন্ধ হইবার পূর্বে একশত জন সন্তানপ্রসবের সময় মরিবেই।' প্রসবের সময় মৃত্যুর সঠিক অঙ্ক আমাদের নাই। ভারতবর্ষে ইহা হাজারকরা ২৪·৫ ধরা হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা মাত্র ৪·৫।

"সর্বশেষ, বাল্যবিবাহ যে শুধু প্রসূতিরই অনিষ্ট করে তাহা নয়, শিশুর ও সেই সূত্রে জাতিরও তজ্জন্য অমঙ্গল হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যেক একহাজার ভূমিষ্ঠ শিশুর মধ্যে ১৮১টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা গড়পড়তা হিসাব; সেখানে এমন সব জায়গাও আছে যেখানে এই গড় হাজারে ৪০০ পর্যন্ত উঠে। এই বিষয়ে ভারতের বিশেষ অবনতি ইংলণ্ড এবং জাপানের শিশুমৃত্যুর (যথাক্রমে হাজারকরা ৬০ এবং ১২৪ হিসাবে) সহিত তুলনা করিলে সহজেই অনুমিত হয়। এই শোচনীয় অবস্থা বস্তুতঃ ভয়াবহ, যখন আমরা বুঝিতে পারি যে দেশের এই অকল্যাণ নিবারণ করা যায় এবং সামাজিক সুশিক্ষিত বিচারবুদ্ধির অভাবেই অনর্থ অপ্রতিহতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে।

"সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত ব্যাপারে যদি কোন উন্নতি হইয়াও থাকে তাহা অতি মন্থরগতিতে হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলা যায়—১৯২১ সালে এক বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বধূগণের সংখ্যা ছিল ৯০৬৬ এবং ১৯৩১ সালে সংখ্যা ছিল ৪৪০৯২—প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি,—যদিও লোকসংখ্যা মাত্র এক-দশমাংশ বাড়িয়াছিল। আরও দেখা যায়, এক বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবার সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ৭৫৯ এবং ১৯৩১ সালে সেই খাতে সংখ্যা ছিল ১৫১৫। ক্রমিক লোকসংখ্যা গণনার অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে, উন্নতি এত অল্প হইয়াছে যে তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নিরূপণ করিতে হয়। এই সকল কুপ্রথা নিবারণের উপায়াদি যে পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইতে অধিক দ্রুত গতিতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। কাজেই সব চাইতে জরুরী বিষয় হইতেছে জনসাধারণের শিক্ষার কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা; এবং জনসাধারণের এবং গবর্নমেণ্টের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তোলার কর্তব্য অপেক্ষা মহত্তর কিংবা অধিক প্রয়োজনীয় কাজ ভারতবর্ষের নারী-আন্দোলনের থাকিতে পারে না।"

—উপরোক্ত সংখ্যা দেখিয়া লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত করিতে হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা ত এই অমঙ্গল দূরীভূত হইবার নয়। বাল্যবিবাহের কুপ্রথা শহরের ন্যায় গ্রামাঞ্চলেও অন্ততঃ সমপরিমাণে সংক্রামিত; ইহার প্রতিকার সাধন প্রধানতঃ নারীসমাজের কাজ। পুরুষগণকেও নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু মানুষ পশুতে পরিণত হইলে যুক্তির কথা তাহার পক্ষে মানিয়া চলা সম্ভব নয়। মাতৃমণ্ডলীকেই শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে—যেন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাঁহাদের স্বার্থ, বিশেষ অধিকার, তাঁহাদের প্রত্যাখ্যানের ফলাফল সমাজকল্যাণের পক্ষে কতখানি উপযোগী। নারী ব্যতীত নারীসমাজকে এই শিক্ষা কে দিতে

সমর্থ? সেইজন্য আমি এই উপদেশ দিতে সাহসী হইতেছি যে, নিখিল-ভারত নারীসঙ্ঘকে তাহার নিজ নামের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে গ্রামে গিয়া কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। কি কাজ হইতেছে না হইতেছে তাহার সাময়িক বিবরণী বাহির করা উপকারী বটে। কিন্তু সেগুলি শুধু কয়েকজন ইংরাজী-জানা শহরবাসীর হাতে পড়ে। গ্রামের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে মিলামিশাই প্রয়োজন। যদি কখনও এই যোগসূত্র স্থাপিতও হয় তথাপি কাজটি খুব সহজ হইবে না। কিন্তু আশু কোন ফল পাওয়ার আশা না রাখিয়াও একদিন না একদিন সেই দিকে কাজ আরম্ভ করিতেই হইবে। নিখিল-ভারত নারীসমিতি (A.-I. W. C.) কি অখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের (A.-I. V. I. A.) সহিত একযোগে কাজ করিতে পারেন না? যতই কর্মক্ষম হউন না কেন, কোন স্ত্রী বা পুরুষ পল্লীসেবক কেবল সামাজিক সংস্কারের জন্য গ্রামবাসীদিগের নিকট উপস্থিত হইবার আশা করিতে পারেন না। তাঁহাকে পল্লীজীবনের সবগুলি বিভাগের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমি পুনরায় উল্লেখ করিব—পল্লীসেবার অর্থ প্রকৃত শিক্ষা দান; শুধু লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা দেওয়া নয়। মানুষকে যে চিন্তাশীল জীব বলিয়া বলা হয় তাহার উপযুক্ত প্রকৃত জীবন গঠন করিবার আবশ্যকীয় উপাদানসমূহের দিকে পল্লী-বাসিগণের মন উদ্বোধিত করিয়া দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা।

[হরিজন, ১৬-১১-'৩৫]

১৬

যুবকের উভয়-সংকট

একটি পটিদার যুবক লিখিতেছে ঃ—

"আমার পিতামাতা আমাকে এই বৎসরই বিবাহ করাইতে চান এবং এই বিষয়ে তাঁহাদের ইচ্ছা মানিয়া চলিতে জেদ করিতেছেন। আমাদের সমাজে 'সাতা'র সর্ত না মানিয়া কেহ বধূ ঘরে আনিতে পারে না অর্থাৎ নিজের পরিবার হইতে তাহার বদলে একটি বালিকাকে পাত্রীপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে। বাল্যবিবাহই আচরিত প্রথা। আমার জন্যও মাত্র ৯ কিংবা ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকা পাওয়া যায় এবং তাহাও যদি আমরা 'সাতা'র সর্ত মানিয়া লই। আমার পিতা বলেন যদি এই বৎসর আমরা এই সুযোগ হারাই তবে পরে ইহাও সম্ভবপর না হইতে পারে। আমি 'না' বলিলে মা কাঁদিতে থাকেন এবং পরিবারে নানা গোলযোগের সৃষ্টি করেন। আমি ২২ বৎসরের পটিদার যুবক। কোন বিধবার সহিত কিংবা আমাদের জাতির বাহিরে আমার বিবাহের কোন কথা আমার পিতামাতা আমলই দিতে চান না। এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কী?"

—এই পটিদার যুবকের ন্যায় উভয়-সংকটে পড়িয়াছে এমন বহু যুবককে আমি জানি। আমাদের শাস্ত্র বলেন, ষোড়শ বৎসরের এবং তদূর্ধ্ব বয়স্ক পুত্রকে পিতামাতা বন্ধুর ন্যায় দেখিবেন এবং তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া চলিবেন, এবং শিশুর উপর যেমন জোর করা চলে বয়স্ক সন্তানের উপর সেরূপ ব্যবহার

করিবেন না। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ পিতামাতা কেহ কেহ আছেন যাঁহারা বোধ হয় মনে করেন যে, তাঁহাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানগণও তাঁহাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছার অনুযায়ী চলিবে ; বিশেষতঃ বিবাহ এবং অনুরূপ বিষয়াদি সম্বন্ধে। এবং তাঁহাদের এইরূপ ধারণা যে, এই সকল ব্যাপারে সন্তানগণের ব্যক্তিগত কোন মত থাকিতে পারে না। যদি পুত্রসন্তানগণের সম্বন্ধেই পিতামাতার এইরূপ মনোভাব থাকে তবে কন্যাদের অবস্থা বিশেষভাবেই অনুমান করা যায়। আমার মনে হয় এইরূপ সমস্যাপূর্ণ বিষয়সমূহে যুবকযুবতীগণের পিতামাতার রোষের দরুন ভীত না হওয়া শুধু তাহাদের অধিকার নয়, পরন্তু উহা তাহাদের ধর্মানুগত কর্তব্য। আমার অভিজ্ঞতা এই, যখন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বা কন্যা ন্যায়সঙ্গতভাবে ঠিক পথে চলে এবং সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত সেই পথ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, পিতামাতাগণ অতি সামান্য রকমের বাধাবিঘ্নই সৃষ্টি করিতে পারেন। একবার যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের সন্তানগণের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় তখন তাঁহারা তাহাই মানিয়া চলিবেন। পিতামাতার জেদ করার পিছনে শেষ পর্যন্ত এই আশা থাকে যে, ইহাতে সন্তানগণ তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইবে। কিন্তু যখন এই আশা বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন আর জেদ করা অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং ক্রমে তাহা পরিত্যক্ত হয়। কাজেই কথিত যুবকটির প্রতি আমার উপদেশ এই যে, একটি শিশু বালিকাকে বিবাহ করা এবং 'সাতা' নামীয় কুপ্রথা মানিয়া চলা এই উভয় পাপকার্যের সহায়কারী হইতে সে

অস্বীকার করিবে। এই অস্বীকৃতির ফলে যে পরিমাণ পারিবারিক অশান্তির সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে সে দিকে সে দৃক্‌পাত করিবে না। আবশ্যকীয় সীমা উল্লঙ্ঘন না করিয়া নিজ উপজাতির বাহিরে বিবাহ করা অথবা কোন বিধবাকে বিবাহ করা সে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৪-'২৯]

১৭

জনৈক ছাত্রের সমস্যা

একটি ছাত্র লিখিতেছে :—

"প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে অথবা ডিগ্রী পাইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই এরূপ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে দুই-তিনটি সন্তানের পিতা হইলে সে তাহার জীবিকার্জনের জন্য কি করিতে পারে? এইরূপ ব্যক্তিকে যদি ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বেই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হয় তবেই বা সে কি করিবে?"

—আমার মনে হয়, ইহার অতি সহজ উত্তর এই,—যে ছাত্র তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণকে কি ভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে তাহা জানে না, অথবা যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করে, তাহার শিক্ষালাভ নিরর্থক হইয়াছে। কিন্তু তাহার পক্ষে ইহা অতীত ইতিহাস। এই দিশাহারা ছাত্রকে সহায়তামূলক উত্তর দেওয়া আবশ্যক। তাহার কি কি প্রয়োজন তাহা সে বলে নাই। সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে এই বিষয়টি যদি বড়

করিয়া না দেখে এবং সাধারণ শ্রমজীবীর সঙ্গে নিজেকে সমশ্রেণীতে ফেলিতে পারে তাহা হইলে জীবিকা উপার্জন করিতে তাহাকে বেগ পাইতে হয় না। তাহার বুদ্ধিশক্তি তাহার হাত-পাকে সাহায্য করিবে; যে শ্রমজীবী তাহার বুদ্ধিশক্তি বিকশিত করিবার সুযোগ পায় নাই তাহা অপেক্ষা উক্ত যুবক অধিকতর নিপুণভাবে কাজ করিতে সক্ষম হইবে—কারণ তাহার ধীশক্তি শিক্ষার ফলে সুমার্জিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না, যে শ্রমজীবী ইংরেজী শিক্ষা করে নাই সে বুদ্ধিশূন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রমজীবীদের মানসিক শক্তি বিকাশের কোন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এ দেশে নাই; যাহারা স্কুলে পড়াশুনা করে নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও তাহাদের মানসিক বৃত্তি বিকশিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ প্রতিকূল অবস্থা ভারতের বাহিরে কোথাও দেখা যায় না। স্কুলে শিক্ষার ফলে যতটুকু মানসিক শক্তির বিকাশ হয়, তাহা আবার মিথ্যা আত্মসম্ভ্রমের ধারণার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পড়ে। এবং সেইজন্যই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মনে করে যে, টেবিলে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ করিয়াই তাহারা জীবিকা উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিটিকে শ্রমের মর্যাদা বুঝিতে হইবে এবং সেই কর্মক্ষেত্রেই তাহার এবং তাহার পরিবারের ভরণপোষণের উপায় খুঁজিতে হইবে।

তাহার স্ত্রীও নিজ অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া কেন পরিবারের আয় বাড়াইবেন না তাহার কোন কারণ নাই। সেইভাবে সন্তানগণ যদি কোন কাজ করিবার উপযুক্ত হইয়া

থাকে তাহাদিগকেও শ্রমশিল্পাদির কাজে জুড়িয়া দিতে হইবে। শুধু পুঁথি পড়িয়াই বুদ্ধিশক্তি বিকশিত করা যায় এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া এই সত্যে উপনীত হইতে হইবে যে, মানসিক বৃত্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিকশিত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রমশিল্পীদের কাজ শিখিতে হইবে। শিক্ষানবীশকে প্রতি পদে যখন শিক্ষা দেওয়া হয় কি জন্য কি ভাবে হাতের বা একটি যন্ত্রের বিশেষ পরিচালনা করা আবশ্যক, তখনই তাহার মনের প্রকৃত বিকাশ আরম্ভ হয়। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের বেকার সমস্যা অতি সহজেই সমাধান করা যায়, যদি তাহারা নিজদিগকে সাধারণ শ্রমজীবীদের সঙ্গে একই পর্যায়ে রাখে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, জোর করিয়া যে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহাতে বাধা দিবার উপযোগী যথেষ্ট মানসিক বল ছাত্রদিগকে অর্জন করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইবার অর্থাৎ স্বাবলম্বনের কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে এবং সকল প্রকার ন্যায্য উপায়ে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করাইবার প্রয়াসে—বিশেষতঃ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ অনুষ্ঠানে বাধা দিবার কৌশল শিখিতে হইবে।

[হরিজন, ৯-১-'৩৭]

১৮

ছাত্রদের প্রতি

বিগত ৯ই জানুয়ারীর হরিজন পত্রিকায় "জনৈক ছাত্রের সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমি বিনীতভাবে আপনার বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় জানাইতেছি :—

"আমার ধারণা আপনি ছাত্রটির প্রতি সুবিচার করেন নাই। এই সমস্যার কোন মীমাংসা করা যায় না। তাহার প্রশ্নের আপনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা অস্পষ্ট এবং অতি সাধারণ। আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণাসকল পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রদিগকে সাধারণ শ্রমজীবীর পর্যায়ে যাইতে আপনি বলিয়াছেন। এইরূপ ব্যাপক ভাবের কথা কাহাকেও বিশেষ সহায়তা করে না এবং আপনার ন্যায় অতি প্রবীণ ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের উপযুক্ত নয়।

"আরও বিশদভাবে বিষয়টি চিন্তা করুন এবং নিম্নের ঘটনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তব জীবনের উপযোগী, সুনির্দিষ্ট সর্বসমন্বিত সমাধান প্রদান করুন।

"আমি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এম. এ. পড়িতেছি। আমার বয়স ২১। পড়াশুনার দিকে আমার ঝোঁক রহিয়াছে এবং সেদিকে আমার জীবনে যতদূর উন্নতি সম্ভব তাহা লাভ করিতে চাই। আপনার জীবনের আদর্শদ্বারা আমি অনুপ্রাণিত। মাসেকের ভিতরই যখন শেষ এম. এ. পরীক্ষা হইবে তখন আমার শিক্ষাও সমাপ্ত হইবে এবং যাহাকে জীবনে প্রবেশ করা বলে আমার তাহা করিতে হইবে।

"আমার স্ত্রী ছাড়া আমার কনিষ্ঠ চারটি ভাই আছে—তন্মধ্যে একটি বিবাহিত ; তুইটি বোন আছে, তাহারা উভয়েই বার বৎসরের ন্যূনবয়স্কা ; পিতামাতা জীবিত। আমার সকলকেই ভরণপোষণ করিতে হয়। এমন কোন মূলধন নাই, যাহার উপর নির্ভর করিতে পারি। ভূসম্পত্তি অতি সামান্য।

"ভাইবোনদের শিক্ষার জন্য আমি কি করিব ? বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই ভগ্নীদিগকে বিবাহ দিতে হইবে। সর্বোপরি অন্নবস্ত্রের সংস্থান কোথা হইতে হইবে ?

"জীবনযাত্রার তথাকথিত মান আমি পছন্দ করি না। আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের জন্য আমি শুধু চাই জীবনযাপনের মোটামুটি স্বচ্ছন্দ একটি পথ ; এবং তদ্ব্যতীত আপদ-বিপদের জন্য সামান্য সংস্থান। তুই বেলা স্বাস্থ্যের অনুকূল আহার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাধারণ বস্ত্রাদি—এই মোটামুটি আমার বিবেচনার বিষয়।

"অর্থনৈতিক হিসাবে আমি সততার সহিত জীবনযাপন করিতে চাই। আমি টাকা লগ্নী করিয়া বা মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে চাই না। দেশের কাজ করিবার জন্য আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। আপনার উল্লিখিত মন্তব্যে যে সকল সর্ত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে আমি যথাসাধ্য সেগুলি পালন করিতে ইচ্ছুক।

"কিন্তু আমি জানি না কি করিব। কোথায় এবং কি ভাবে আরম্ভ করিব ? আমার শিক্ষা মারাত্মক রকম পুঁথিগত এবং বাস্তবের সহিত সম্বন্ধবর্জিত। কোন কোন সময় সূতা কাটিব মনে করি—ইহাই আপনার প্রিয়, সর্বরোগের মহৌষধি, কিন্তু আমি কি ভাবে সূতা কাটিতে হয় অথবা কাটা সূতা দিয়া কি করিতে হয়, এসব কিছুই জানি না।

"আমি যে অবস্থায় আছি তাহাতে আপনি আমাকে সন্তান

উৎপাদন বন্ধ করিবার উপায়াদি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিবেন কি ? আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি, আমি আত্মসংযম এবং 'ব্রহ্মচর্যে' আস্থাবান। আমার মনে হয় আমাকে ব্রহ্মচারী হইতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক হইবে। পূর্ণ আত্মসংযমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জন্মনিরোধের উপায়াদি অবলম্বন না করিলে আমার সন্তানাদি জন্মিতে পারে এবং তদ্দ্বারা আর্থিক সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইবে। এবং আমি ইহাও ভাবি যে, ঠিক এই সময়ে আমার স্ত্রীর জীবনের স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ ভাবপ্রবণতার অবস্থায় তাহার উপর কঠোর ব্রহ্মচর্যমূলক জীবনযাত্রা চাপাইয়া দেওয়া অসঙ্গত হইবে। পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক জীবনে যৌনস্পৃহার স্থান রহিয়াছে। আমি তাহার বাহিরে নই ; আমার স্ত্রী ত নয়ই ; সে এমন শিক্ষা লাভ করে নাই, যাহা দ্বারা ব্রহ্মচর্য অথবা অতিরিক্ত সহবাসের বিপদ সম্বন্ধে আপনার অনুপম প্রবন্ধসমূহ বুঝিতে সক্ষম হইতে পারে।

"আমি দুঃখিত যে চিঠিখানা একটু বেশী দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলার জন্য আমি সংক্ষেপে বলিতে চাহি নাই। আপনি এই চিঠিখানার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।"

—যদিও এই চিঠিখানা গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে পাওয়া গিয়াছিল, বর্তমান সময়ে মাত্র ইহার বিষয়ে আলোচনা করিতে সক্ষম হইলাম। ইহাতে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় সমস্যা উত্থাপিত করা হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটি হরিজন পত্রিকার দুইটি স্তম্ভ ব্যাপিয়া আলোচনার যোগ্য। কিন্তু আমি সংক্ষেপে উত্তর দিব।

ছাত্রটি যে সকল সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছে, যদিও সেগুলি তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তুলনায় গুরুতর বটে,

তাহা সমস্তই তাহার স্বকৃত। সেগুলির উল্লেখমাত্রেই তাহার নিজ অস্বস্তিকর অবস্থা এবং আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর অবাস্তবতা প্রকাশ পায়। শিক্ষাকে অর্থার্জনের উপায়বিশেষে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ একটি ব্যবসায়ের বস্তুতে পরিণত হয়। আমার মতে শিক্ষার আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। সেই ছাত্রটি যদি নিজকে লক্ষ লক্ষের মধ্যে একজন মনে করে তবে সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার সমবয়স্ক লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী শিক্ষায় উপাধিলাভ করিয়াছে বলিয়া যে যে বিষয়গুলির সমাধান করিতে চায়, তাহারাও তাহা পারিয়া উঠিতেছে না। তাহার উল্লিখিত সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের জন্য সে নিজকে দায়ী করিবে কেন? যদি প্রাপ্তবয়স্কগণ সুস্থ শরীরে থাকিয়া থাকে তবে তাহারা নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করিবে না কেন? একটি কর্মব্যস্ত পুংমক্ষিকার উপর অধিকসংখ্যক স্ত্রীমক্ষিকার নির্ভর করা অবৈধ।

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে তাহাকে অনেকগুলি অধীত বিষয় ভুলিয়া যাইতে হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার ধারণা পরিবর্তিত করিতে হইবে। সে যে ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহার ভগ্নীগণের পক্ষে তাহার পুনরাবৃত্তি করা উচিত হইবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন হস্তশিল্প শিক্ষা করিয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে। যে মুহূর্তে তাহারা এইরূপ করিবে, তখনই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে। এবং তাহারা

যদি মানবসমাজের উপর প্রভুত্ব চালাইবার চেষ্টা না করিয়া নিজদিগকে তাহার সেবক বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদের হৃদয়ের অর্থাৎ আত্মারও উৎকর্ষসাধন হইবে। এবং তাহাদের ভ্রাতার মত তাহারাও সমভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে।

তাহার লিখিত চিঠিতে তাহার ভগ্নীর বিবাহের বিষয় উল্লিখিত আছে। তৎসম্বন্ধেও এখানে আমি আলোচনা করিব। বিবাহ বিলম্বে না হইয়া শীঘ্র হওয়ার অর্থ কি তাহা আমি জানি না। কোন ক্ষেত্রেই বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। এত বৎসর পূর্বে সে বিষয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নাই। জীবনের সমগ্র পরিকল্পনা যদি সে পরিবর্তন করে তাহা হইলে সে তাহার ভগ্নীগণকে নিজ নিজ স্বামী নির্বাচন করিতে দিবে এবং যদি বিবাহকার্যে কোন খরচ করিতেই হয় তবে প্রত্যেকের জন্য পাঁচ টাকার বেশী খরচ কোন অবস্থাতেই করা উচিত নয়। এই রকম বহু বিবাহ-বাসরে আমি উপস্থিত হইয়াছি। বরগণ বা তাহাদের পূজনীয়গণ সকলেই সঙ্গতিসম্পন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কোথায় কি প্রকারে সূতাকাটা সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইবে তাহা ছাত্রটি জানে না এবং তৎসম্বন্ধে আপনাকে নিরুপায় মনে করে। লক্ষ্ণৌ শহরে একটু যত্নের সহিত খোঁজ করিলে সে দেখিতে পাইবে, তাহাকে শিখাইবার মত যথেষ্টসংখ্যক যুবক সেখানে রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সূতাকাটা নিয়া সর্বক্ষণ বিব্রত থাকার কোন প্রয়োজন নাই,—যদিও যে সকল স্ত্রী-পুরুষ গ্রামে বাস

করার সংকল্প করিয়াছে তাহাদের পক্ষে দেখিতে দেখিতে সূতাকাটা একটি পূর্ণ জীবিকার্জনের উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। আমার বিশ্বাস জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি গুছাইয়া নিবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত করিতে আমি এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বলিয়াছি।

এখন সন্তানের জন্মনিরোধ যন্ত্রাদির ব্যবহার বিষয়ে বলিব। এখানেও বিষয়টির দুরূহতা কাল্পনিক। তাহার স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা কম এইরূপ বিবেচনা করিয়া সে ভুল করিয়াছে। যদি তাহার স্ত্রী সাধারণ নারীগণের মত হইয়া থাকেন তবে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি আত্মসংযম অনুশীলনে সহজেই তাহার সহায়কারিণী হইবেন। সে নিজে নিজকে প্রকৃতভাবে বুঝুক এবং নিজকে জিজ্ঞাসা করুক তাহার নিজেরই যথেষ্ট আত্মসংযম আছে কিনা। আমার নিকট যত প্রমাণ আছে তাহা হইতে এই দেখা যায় যে, নারী অপেক্ষা পুরুষেরই আত্মসংযমের ক্ষমতা কম। সংযম অভ্যাস করিতে তাহার নিজ অক্ষমতাকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। একটি বৃহৎ পরিবার ভবিষ্যতে হইবে, সাহসিকতার সহিত এই বিষয়ের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাকে উদ্ভাবিত করিতে হইবে। তাহার জানা উচিত যে, জন্মনিরোধ যন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোকের তুলনায় সম্ভবতঃ অল্প কয়েক সহস্র লোকই তাহা ব্যবহার করে। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের সন্তানগণকে প্রতিপালন করার ব্যাপারে ভীত হয় না—যদিও তাহাদের

সকলের জন্মের আবশ্যকতা ছিল না। আমি এই বলিতে চাই যে, নিজের কৃতকর্মের ফলের সম্মুখীন হইতে সংকোচ বোধ করা কাপুরুষতার লক্ষণ। যাহারা জন্মনিরোধ যন্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহারা কখনও আত্মসংযম শিক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা অভ্যাস করা তাহাদের দরকার হইবে না। জন্মনিরোধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সহবাস দ্বারা সন্তানের জন্ম বারণ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের, সম্ভবতঃ পুরুষেরই বেশী, জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। শয়তানের সহিত যুদ্ধ না করা অমানুষের কাজ। আমার পত্রলেখক আত্মসংযম অভ্যাস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউক এবং তাহাই নিশ্চিতরূপে এবং সাধুভাবে অবাঞ্ছিত সন্তানের আগমন রোধ করিবার একমাত্র উপায়। এই প্রচেষ্টায় শতবার সে অকৃতকার্য হইলেও কিছু আসে যায় না। যুদ্ধেই আনন্দ। ভগবানের কৃপাতেই ফললাভ হয়।

[হরিজন, ১৭-৪-'৩৭]

১৯

জনৈক যুবকের সমস্যা

প্রশ্ন॥ আমি বাইশ বৎসরের যুবক। যদি আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে তবে সেই বিষয়ে আমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সমীচীন কিনা।

উত্তর ॥ শাস্ত্রমতে এবং যুক্তিমতে সন্তানগণ যখন বিচারবুদ্ধির বয়স প্রাপ্ত হয় (শাস্ত্রমতে সেই বয়স ষোল), তখন তাহারা পিতামাতার মিত্রস্বরূপ হয় অর্থাৎ তাহারা পিতামাতার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য থাকে না। তথাপি তাহারা পিতামাতার সহিত আলোচনা করিতে এবং যেখানে সম্ভবপর সেইখানেই তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য। তুমি প্রাপ্তবয়স্ক এবং যদি বিবাহ-প্রস্তাব তোমার মনোমত না হয় অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ থাকে তবে বিবাহের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তুমি বিনীতভাবে অসম্মতি প্রকাশ করিবে।

[হরিজন, ৯-৩-'৪০]

২০

ইহা কি বিবাহ ?

আমার বর্তমান পীড়ার প্রথম দিকে যখন কোন পত্রাদি সম্বন্ধে আমার মনোযোগ দিবার শক্তি ছিল না, তখন একখানা চিঠি পাই ; তাহা হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। যদিও লেখক বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছিলেন, আমি পক্ষগণের নাম উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

"বর্তমান বিবাহের মরসুমে কারওয়ার সদাশিবগড়ে একটি হৃদয়-বিদারক বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাটির বয়স ১২ বৎসর এবং গোয়ার একটি দরিদ্র পরিবারে তাহার জন্ম। বরের বয়স ৬০। তাঁহার প্রথমা পত্নী আট নয়টি সন্তানের মধ্যে দুইটি সন্তান রাখিয়া

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেন। বর একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। গত বৎসর তিনি একটি অল্পবয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার সমাজের আন্দোলনে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই বৎসর কন্যার পিতাকে দুইশত টাকা দিয়া তিনি কৃতকার্য হন। এই ব্যাপারে কি করা যায়?………র মতো ব্যক্তিরা, যাঁহারা স্থানীয় সমাজসংস্কারক, তাঁহারাও এই অমানুষিক ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নাই।"

—যে চিঠি হইতে উপরোক্ত সারাংশ দিলাম তাহাতে লিখিত বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি বলিতে পারিতাম ইহাই একমাত্র অসাধারণ ঘটনা, মনে স্বস্তি বোধ করিতাম। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে এবং তাহার সরাসরি কঠোর প্রতিকার আবশ্যক। নিঃসন্দেহরূপে একটি উপায় হইতেছে—এরূপ প্রত্যেকটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া নারীসমাজের বিরুদ্ধে এরূপ পাপাচরণের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তৎসম্বন্ধে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী জনমত গঠন করা। কিন্তু যেখানে এইরূপ অবৈধ নীতিবিরোধী পরিণয় আসন্ন, সেখানে স্থানীয় আন্দোলনই নিঃসন্দেহরূপে অত্যন্ত কার্যকরী। লেখকের মতে আটটি সন্তানের এই বৃদ্ধ জন্মদাতার প্রথম উদ্যম উপযুক্ত সময়ে আন্দোলনের ফলেই ব্যর্থ হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও সেইরূপ আন্দোলন কেন হয় নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই স্থানীয় বহু লোক জানিতেন যে, এই বৃদ্ধ বিপত্নীকের জন্য অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে সংগ্রহ করিবার

চেষ্টা হইতেছে। আমি আশ্চর্যান্বিত হইতেছি যে তখনই কেন মেয়েটিকে অত্যাচার এবং দুর্দশার জীবন হইতে রক্ষা করিবার আন্দোলন আরম্ভ করা হয় নাই। আমার মতে যদি স্থানীয় জনমত সুগঠিত করা যায় তবে এই বালিকা বধূটিকে সাহায্য করিবার সময় এখনও আছে। লেখকের পত্রে বুঝা যায়, উক্ত বিপত্নীক এক কালে একজন জনহিতৈষী রকমের লোক ছিলেন। তাঁহার কবল হইতে মেয়েটিকে সরাইয়া সেবাসদনে বা এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিবার জন্য কি তাহাকে বুঝান যায় না এবং তার পর মেয়েটি যখন পূর্ণবয়স্কা হইবে তখন তাঁহাকে স্বামীর সঙ্গে থাকিবার বা বিবাহবন্ধন বাতিল করিবার স্বাধীনতা কি দেওয়া যায় না? কিন্তু সমাজের বর্তমান মৃতপ্রায় অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হউক বা নাই হউক, নির্মলচরিত্র যুবকগণ সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত উপায়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য এবং বালবিধবাগণকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কল্যাণসঙ্ঘ কেন গঠিত করিবে না তাহার কোন কারণ নাই। এই দুইটি বিষয় পরস্পরসংশ্লিষ্ট। এই সকল কল্যাণসঙ্ঘকে যথার্থরূপে কার্য করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ স্থানে কাজ করিতে হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা দেখিতে পাইবে যে তাহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়াছে। আমাদের অধিকাংশ শহরের প্রত্যেকটিতেই লোকসংখ্যা অতি অল্প এবং লেখক যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাদের নিজ নিজ শহরে কখন এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ বিষয় ঘটাইবার উদ্যোগ চলিতেছে তাহা

জানা বা বালবিধবাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল কল্যাণসঙ্ঘকে যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ এবং আদর্শ আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাদের পক্ষে বিন্দুমাত্র অসহিষ্ণুতা প্রকাশ বা বলপ্রয়োগ তাহাদের প্রতিকূলে ঘৃণার সৃষ্টি করিবে এবং তাহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিবে তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-'২৭]

২১

দ্বিগুণ পাপ

কিছুকাল পূর্বে আমার লিখিত "ইহা কি বিবাহ?" এই প্রবন্ধ বিষয়ে জনৈক লেখক একটি বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছেন। তাহা আমি নিম্নে সংক্ষেপে দিতেছি। আমার অবগতির জন্য তাঁহার নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু "জনৈক অবিবাহিত" এই গুপ্তনাম তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

"আপনার কাগজে প্রকাশিত 'ইহা কি বিবাহ?' এই প্রবন্ধটি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারওয়ারের গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহা সর্বজনবিদিত। যে সমাজে এই বিবাহ ঘটিয়াছে সেই সমাজের একজন হিসাবে আমি সর্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ সমগ্র ভারতের গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহাদের সুবিবেচনার জন্য নিম্নের কয়েকটি ছত্র উত্থাপিত করিতেছি।

"কোন পুরুষের পক্ষে পাত্রী ক্রয় করা কলঙ্কের বিষয়। কিন্তু আমাদের ভিতর আর একটি দূষণীয় প্রথা আছে; আমাদের মধ্যে পিতা তাঁহার কন্যার জন্য বর ক্রয় করিতে বাধ্য হন এবং বর যে টাকা পায় তাহাকে পণ বলা হয়। কন্যার পিতামাতার আর্থিক অবস্থানুযায়ী পণ ধার্য হয় না, তাহা ভাবী বরের বংশানুক্রমিক আয়ের পরিমাণের অনুযায়ী হয়, অথবা সময় সময় বর যে পরিমাণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি যত বেশী শিক্ষিত হন এবং যিনি যত অধিক উচ্চ শিক্ষাপদবী লাভ করেন বিবাহের বাজারে তাঁহার দাম ততোধিক।

"কয়েক মাস পূর্বে বোম্বাই শহরে সুশিক্ষিত এবং সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত একজন ভদ্রলোকের বিবাহ হয় এবং শুনা যায় প্রায় বিশ হাজার টাকার যৌতুক তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয় যে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সকল অনাচার দূর করিবেন বলিয়া আশা করা যায় তাঁহারাই সেই সকল অনাচার অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছেন।"

—সেই সমাজের অপর একজন ব্যক্তির এ বিষয়ে লিখিত আর একখানা চিঠি আমার নিকট আছে। দেখা যায়—যাহারা পত্নী ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে তাহারা পাত্রী অনুসন্ধান করিবার জন্য গোয়া নগরীতে যায়। কারণ সেখানেই গরীব সারস্বত ব্রাহ্মণগণকে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের কন্যাগণের পিতা বা পিতামহ হইবার উপযুক্ত বয়সের বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট কন্যা বিক্রয় করিয়া ধনবান হইতে তাহারা লজ্জাবোধ করে না। এইভাবে সমাজ দ্বিগুণ পাপাচরণ করিয়া থাকে। শিক্ষিত যুবক সর্বোচ্চ খরিদ্দারের নিকট তাহার হাত বাড়াইয়া রাখে এবং

অভাবগ্রস্ত মাতাপিতা সর্বোচ্চ মূল্য দিতে পারে এরূপ বৃদ্ধতম (সময় সময় শিক্ষিতও) ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাদের অল্পবয়স্কা নাবালিকা কন্যাদিগকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া থাকে। সারস্বত সমাজ ইচ্ছা করিলে এই একমাত্র অজুহাত দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারে যে, অন্যান্য বর্ণও রহিয়াছে যাহারা এই কুপ্রথা হইতে মুক্ত নহে ; এবং তাহার নজীর দেখাইয়া কোন না কোন উপায়ে এই কুপ্রথার সংস্কার পিছাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যদি সারস্বত সমাজ সংস্কার-কার্যে অগ্রণী হয় তবে "তুমিও এই দলে"— এইরূপ নিন্দনীয় ওজরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিবে ; এবং এখন এই কুপ্রথার ব্যাপার বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় সমাজ আপনাকে এই দ্বিগুণ পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-'২৭]

২২

চলতি সামাজিক ক্ষত

শোলাপুর হইতে জনৈক মাহেশ্বরী যুবক বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে অল্পবয়স্কা বালিকাগণের বিবাহপ্রসঙ্গে লিখিতেছে :—

"আমাদের মাহেশ্বরী সমাজে গার্হস্থ্যজীবন বস্তুতঃই দুঃসময়ে পড়িয়াছে। শত শত পঙ্গু বৃদ্ধ লালসা মিটাইবার জন্য অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া প্রতিবৎসর অল্পবয়স্কা বালিকা সংগ্রহ করিয়া

থাকে। তাহার ফলে আমাদের সমাজ দ্রুতগতিতে নৈতিক অবনতি ও দুষ্কর্মের পুঁতিগন্ধময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাল্যবিবাহ এবং বিসদৃশ পরিণয় নিত্যদিনের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে সমাজের গার্হস্থ্যজীবন পাপ এবং নৈতিক অধঃপাতের গহ্বরে পতিত হইতেছে; এবং সেই সমাজে দেশের সম্মানরক্ষার উপযুক্ত লোক জন্মগ্রহণ করিবে ইহা আশা করা দুরাশা মাত্র। সময় থাকিতে কিছু না করিতে পারিলে এই সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

"বাল্যবিবাহ এবং বিসদৃশ পরিণয় বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে প্রায় দশ বার জন যুবক একটি সমিতি গঠন করিয়াছে—তাহাদের উদ্দেশ্য এই অমঙ্গল দূর করিবার জন্য একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করা। আমরা সত্যাগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি; যখনই এইরূপ অবাঞ্ছনীয় বিবাহব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইবে তখনই তাহা করিব এবং আমাদের বিশ্বাস এরূপ করিলে তাহা ফলপ্রসূ হইবে। মাহেশ্বরী সমাজের বিবাহের নানাপ্রকার আনুষঙ্গিক নিয়ম, আচার এবং উৎসবাদি আপনার জানা আছে। এই ব্যাপারে সত্যাগ্রহ করিবার শ্রেষ্ঠ শান্তিপূর্ণ উপায় সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ দিবেন কি?

"আপনার মতে বিবাহের জন্য বর ও কন্যার প্রত্যেকের উপযুক্ত বয়ঃসীমা কি নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়? বয়োধর্মবিরোধী বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য কি কি অবস্থায় সত্যাগ্রহ করা আপনি অনুমোদন করেন?

"মাত্র সেদিন পঞ্চান্ন এবং ষাট বৎসরের দুই জন বৃদ্ধ প্রত্যেকে বারবৎসরবয়স্কা এক একটি মেয়ে বিবাহ করিয়াছে। এই গ্রামেই আরও কয়েকটি এইরূপ বীভৎস বিবাহব্যাপার শীঘ্রই ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যেই এই সকল বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য ছাপানো পুস্তিকা বিতরণ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি।

কিন্তু আমরা মনে করি শুধু ফাঁকা প্রচারকার্যে চলিবে না। কর্মক্ষেত্রে নামিয়া প্রবলভাবে কাজ সরাসরি আরম্ভ করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে আপনার মত অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।"

—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহই প্রকৃত উপায়। কিন্তু কিভাবে তাহা করিতে হইবে, তাহা পৃথক্ প্রশ্ন। আমার প্রবন্ধে আমি একাধিকবার সত্যাগ্রহের সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সত্যাগ্রহ করিবার পূর্বে নিজকে নিয়মানুবর্তী করিতে হইবে, আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইবে এবং নিজকে পবিত্র করিতে হইবে এবং যিনি সত্যাগ্রহ করিবেন তাঁহার সর্ববাদিসম্মত সামাজিক মর্যাদা থাকা চাই। সত্যাগ্রহী অসৎ বিষয় এবং যাহারা অসৎ কার্য করে এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা কখনই ভুলিবেন না। যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদের প্রতি সত্যাগ্রহী কোন বিদ্বেষ বা হিংসা পোষণ করিবেন না। অসৎ ব্যক্তির কৃত কার্য যতই গুরুতর হউক না কেন, সত্যাগ্রহী তাহার প্রতি অকারণে রূঢ় ভাষাও প্রয়োগ করিবেন না। প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর ইহা মূলমন্ত্র হইবে যে, পৃথিবীতে অধঃপতিত এমন কেহ নাই যাহাকে প্রেম দ্বারা সংশোধিত করা যায় না। সত্যাগ্রহীর সর্বদা চেষ্টাই হইবে সৎ দ্বারা অসৎকে, ভালবাসা দ্বারা ক্রোধকে, সত্য দ্বারা অসত্যকে এবং অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করা। পৃথিবী হইতে অমঙ্গল দূর করিবার অন্য কোন পথ নাই। কাজেই যিনি সত্যাগ্রহী হইবার দাবী রাখেন তাঁহাকে সূক্ষ্মভাবে প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা ইহা জানিতে

চেষ্টা করিতে হইবে যে, তিনি নিজেই ক্রোধ, হিংসা বা মনুষ্যসুলভ অন্যান্য দুর্বলতার স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কিনা এবং যে সকল পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই সকল পাপানুষ্ঠানের প্রবণতা হইতে তিনি নিজেও সম্পূর্ণ মুক্ত কিনা। আত্মশুদ্ধি এবং নিজের ভ্রম-প্রমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তে সত্যাগ্রহীর অর্ধেক জয় নিহিত থাকে। সত্যাগ্রহীর এই বিশ্বাস থাকে যে, বক্তৃতা বা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয় তাহা হইতে বহুগুণ স্থায়ী, কার্যকরী ও ব্যাপক ফল সত্য এবং প্রেমের নীরব ও অনাড়ম্বর সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়।

কিন্তু যদিও সত্যাগ্রহ নীরবে ক্রিয়া করে, তথাপি সত্যাগ্রহীর পক্ষে লোকদৃষ্টির সম্মুখে কতকপরিমাণ কাজ করা আবশ্যক। সত্যাগ্রহী যে অমঙ্গল দূর করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সর্বপ্রথম দেশব্যাপী এবং গভীর আন্দোলন দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে তাহাকে জনমত গঠিত করিতে হইবে। যখন কোন সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত যথেষ্টরূপে জাগরিত হয় তখন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও তাহা অভ্যাস করিতে বা স্পষ্টভাবে তাহা সমর্থন করিতে সাহসী হইবে না। জাগ্রত এবং বিচারনিষ্ঠ জনমত সত্যাগ্রহীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। সর্ববাদিসম্মত জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যখন কোন ব্যক্তি কোন সামাজিক ব্যাধিকে সমর্থন করে তখনই তাহাকে সমাজে একঘরে করার স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে এই সামাজিক বর্জন স্থিরীকৃত হয় তাহার

কোন প্রকার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য সত্যাগ্রহীর কখনই থাকিবে না। সামাজিক বর্জনের অর্থ এই যে, দোষী ব্যক্তির সহিত সমাজ সম্পূর্ণরূপে অসহযোগিতা করিবে—এর চাইতে কিছু বেশীও নয়, কমও নয়। ইহার ভাব এই—যে সমাজকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে চায়, সমাজের সেবা পাওয়ার তাহার কোন যোগ্যতা বা অধিকার নাই। কার্যতঃ ইহা করিলেই যথেষ্ট। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহার প্রয়োগ-প্রণালীও পরিবর্তন করা আবশ্যক হইতে পারে।

কিন্তু যে ইন্দ্রিয়সেবী বৃদ্ধ পঙ্গু অবস্থায়ও তাহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দমন করিতে পারে না তাহার সম্বন্ধে কি কর্তব্য? ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অন্ধ, ইহার ভালমন্দ বিচারের শক্তি নাই; যে কোন প্রকারেই হউক এবং যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষই হউক, ইহার চরিতার্থতা চাই-ই। সমাজ এইরূপ ব্যক্তিকে নিয়া কি ভাবে চলিবে? ইহার উত্তর এই যে, এই সকল কামাতুর বৃদ্ধ যাহাতে অসহায়, দুর্গত কন্যা সংগ্রহ করিতে না পারে সেই বিষয়ে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ বৎসরের ন্যূন-বয়স্কা কোন মেয়েকেই বিবাহ না দেওয়া এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ না দেওয়ার প্রথা কঠোরভাবে প্রচলিত করিতে হইবে। স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠে—যদি কোন মেয়েই স্বেচ্ছায় সেই বৃদ্ধকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না হয়, তবে সে কি করিবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর সমাজ দিতে পারে না এবং

ইহার কোন উত্তর দিতেও সমাজ বাধ্য নহে। সমাজের কাজ শুধু অন্ধ লালসার ইন্ধনে পরিণত হইতে পারে এমন উপায়হীন বালিকাগণকে রক্ষা করা। লালসা চরিতার্থ করিবার উপায় উদ্ভাবন করা সমাজের কর্তব্যের ভিতর নয়। কার্যতঃ কিন্তু ইহাই দেখা যাইবে যে, যখন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সর্বত্র পবিত্রতা বিরাজ করে তখন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি-গণের লালসা সেই পরিবেশের প্রভাবে বহুল পরিমাণে শমিত হইয়া পড়িবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৮-'২৯]

২৩

যুবকদের কলঙ্ক

জনৈক সংবাদদাতা আমাকে সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া কিয়দংশ পাঠাইয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, হায়দরাবাদ ও সিন্ধুদেশে বর-পণ শোচনীয়ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে; ইম্পীরিয়্যাল তার বিভাগের একজন ইঞ্জিনিয়র বাগ্‌দানের সময় নগদ পণ বিশ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন; বিবাহের দিনে ও তার পর বিশেষ বিশেষ সময়ে বহু পরিমাণে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও লইয়াছেন। কোন যুবক যখন পণকে বিবাহের সর্ত করে তখন সে তাহার শিক্ষাকে এবং তাহার দেশকে অধঃপাতিত করে এবং স্ত্রীজাতির অবমাননা করে। দেশে অনেক যুব-প্রতিষ্ঠান বর্তমান আছে। আমি ইচ্ছা

করি এই শ্রেণীর সমস্যা লইয়া তাহারা আলোচনা করিবে। অনেক সময় দেখা যায় এই শ্রেণীর সঙ্ঘগুলি সমাজের প্রকৃত সংস্কার করিবার সঙ্ঘ না হইয়া—যাহা তাহাদের হওয়া উচিত—তৎপরিবর্তে পরস্পরের প্রশংসাকারী সঙ্ঘে পরিণত হইয়া পড়ে। এই সকল সঙ্ঘের দ্বারা জনসাধারণের আন্দোলনের সহায়তা সময় সময় হইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের নিকট হইতে দেশের যুবকগণ যে প্রশংসা লাভ করে তাহাই তাহাদের পুরস্কার। এইরূপ কাজ যদি আভ্যন্তরীণ সংস্কার দ্বারা সমর্থিত না হয় তবে উহা যুবকদের ভিতরে অনুচিত আত্মশ্লাঘার ভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নৈতিক অবনতি ঘটাইতে পারে। অপমানজনক পণপ্রথা হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রবল জনমত গঠন করিতে হইবে এবং যে সকল যুবক এইরূপ অসদ্ভাবে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা তাহাদের জীবন কলুষিত করে, তাহাদিগকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া উচিত। কন্যার পিতামাতাও বিলাতী উপাধির মোহে তাঁহাদের চক্ষু ঝলসিত করিতে বিরত হইবেন এবং তাঁহাদের কন্যাদের জন্য সত্যপ্রিয়, সৎসাহসী যুবক সংগ্রহ করিবার জন্য নিজেদের ক্ষুদ্র বংশ ও প্রদেশের গণ্ডী অতিক্রম করিতে দ্বিধা করিবেন না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৬-'২৮]

২৪

বিবাহ ও আত্মবিক্রয়

কয়েকমাস পূর্বে স্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকার স্তম্ভে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী অনেক বর্ণের মধ্যে বিদ্যমান পণপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছিল এবং এই বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যও ছিল। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় আমি এই নিষ্ঠুর প্রথা সম্বন্ধে প্রায়ই লিখিতাম। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা হইতে গৃহীত অংশগুলি আমার তখনকার পীড়াদায়ক স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমার মন্তব্যগুলি "দেতি-লেতি" নামে সিন্ধুদেশে খ্যাত প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল। নিজ কন্যাদিগকে ভাল বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক পিতামাতাগণের নিকট হইতে অনেক শিক্ষিত সিন্ধুদেশবাসী প্রভূতপরিমাণ টাকা আদায় করিয়াছে এরূপ জানা যায়। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সাধারণভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছে। প্রথাটি যে হৃদয়হীনতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যতদূর জানি, এই প্রথা লক্ষ লক্ষ লোককে স্পর্শ করে না। ভারতীয় মানবজাতিরূপ সমুদ্রের বিন্দুকল্প মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ভিতরই এই প্রথা নিবদ্ধ। যখনই আমরা কোন কুপ্রথার সম্বন্ধে বলি তখনই সাধারণতঃ আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই ভাবি। গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও নানা রকম প্রথা বিদ্যমান, তাহাদেরও দুঃখকষ্ট আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এখন পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, যেহেতু পণের কুপ্রথা এই দেশের অপেক্ষাকৃত অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ, সেই জন্য উহাকে উপেক্ষা করা যায়। এই প্রথা ধ্বংস করিতে হইবে। অর্থের জন্য পিতামাতা বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন, এই ভাব লোপ করিতে হইবে। এই প্রথা নিগূঢ়ভাবে জাতি বা বর্ণগত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। যতদিন পাত্র-পাত্রী নির্বাচন কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের কয়েক শত যুবক বা যুবতীর ভিতর নিবদ্ধ থাকিবে ততদিন ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা প্রচলিত থাকিবে। যদি এই কুপ্রথা সমূলে দূরীভূত করিতে হয় তবে মেয়েদিগকে, ছেলেদিগকে এবং তাহাদের পিতামাতা-দিগকে জাতি বা বর্ণের গণ্ডী ছিন্ন করিতে হইবে। বিবাহের বয়স বাড়াইতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে অর্থাৎ যদি উপযুক্ত পাত্রলাভ সম্ভবপর না হয় তবে কন্যাদিগকে আমৃত্যু কুমারী থাকিবার সাহস অর্জন করিতে হইবে। জাতির যুবসম্প্রদায়ের মনোভাব আমূল পরিবর্তন করিতে পারে এইরূপ শিক্ষা এই সকলের জন্য দরকার। দুঃখের বিষয়, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত শিক্ষাপ্রণালীর কোন যোগ নাই এবং জাতির বালকবালিকাগণের অতি নগণ্য অংশ যে শিক্ষা পায় তদ্দ্বারা সমাজের এই অবস্থা প্রায় অবিকৃত থাকিয়া যায়। কাজেই যদিও এই কুপ্রথা প্রশমিত করিবার জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে, ইহা আমার নিকট সুস্পষ্ট যে এই কুপ্রথা এবং উল্লেখযোগ্য এইরূপ আরও বহু কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইলে একমাত্র উপায় দেশের দ্রুতপরিবর্তনশীল

অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অথচ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এত অধিকসংখ্যক যুবকযুবতী এই সুস্পষ্ট সামাজিক অনাচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা প্রদর্শন করে কেন—যদিও বিবাহানুষ্ঠানের ন্যায় ইহার সহিত তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত? বিবাহে যোগ্য হয় নাই এই অপমানে শিক্ষিত মেয়েরা আত্মহত্যা করিতেছে কেন? যে কুপ্রথা সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং যাহা নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা যদি তাহারা তাহাদের অর্জিত শিক্ষা দ্বারা সাহসের সহিত উপেক্ষা করিতে সমর্থ না হয় তবে সেই শিক্ষার মূল্য কি? উত্তর সুস্পষ্ট। মূলতঃ শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর এমন কোন গলদ আছে যাহার জন্য যুবকযুবতীগণ সামাজিক বা অন্যান্য কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শক্তিলাভ করিতে পারে না। সেই শিক্ষাব্যবস্থাই মূল্যবান যাহার প্রভাবে শিক্ষিতের সকল মানসিক সদ্বৃত্তির উন্মেষ হয়, যাহার ফলে সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সমস্যা নিপুণভাবে সমাধান করার শক্তিলাভ করে।

[হরিজন, ২৩-৫-'৩৬]

২৫

পরিহার্য সামাজিক দুর্গতি

একজন লেখকের আর্তিবহুল দীর্ঘ পত্র হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

"আমার বয়স ৬৭ বৎসর। আমি বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক। আজীবন অর্থাৎ ৪৬ বৎসর যাবৎ শিক্ষাবিভাগে আছি। একটি উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী কায়স্থ পরিবারে আমার জন্ম। আমাদের পরিবার এক সময় সমৃদ্ধিশীল ছিল, কিন্তু বর্তমানে নিতান্ত দুঃস্থ। ভগবানের আশীর্বাদে (?) আমার সাতটি কন্যা এবং দুইটি পুত্র ; জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ বৎসর বয়সে তাহার দুঃস্থ এবং নিরাশ্রয় পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত অক্টোবর মাসে মারা যায়। সে ছিল উন্নতিশীল যুবক—আমার জীবনের একমাত্র আশাভরসা। সাত কন্যার মধ্যে পাঁচটির বিবাহ ইতিমধ্যে হইয়াছে। আঠার এবং ষোল বৎসর বয়স্কা ষষ্ঠ ও সপ্তম কন্যা এখনও অনূঢ়া। আমার কনিষ্ঠ পুত্র একাদশ বৎসরের নাবালক। আমার বেতন ষাট টাকা। ইহা দ্বারা দুই দিক্ মেটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সঞ্চয় কিছু তো নাই-ই, বরং দেনা আছে। আমার ষষ্ঠ কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে। অলঙ্কার এবং তিন শত টাকা পণসহ বিবাহের খরচ নয় শত টাকার কমে হইবে না। কানাডার সন্‌লাইফ বীমা কোম্পানীতে আমার দুই হাজার টাকার একটি বীমা আছে। কোম্পানী আমাকে মাত্র চার শত টাকা ধার দিতে রাজি হইয়াছে। আবশ্যকীয় অর্থের ইহা অর্ধেক মাত্র। অপরার্ধের সম্বন্ধে আমি একেবারে নিরুপায়। আপনি কি এই দরিদ্র পিতাকে অপরার্ধ দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন না ?"

—এই শ্রেণীর বহু পত্রের মধ্যে ইহা একটি। সেগুলির অধিকাংশই হিন্দুস্থানীতে লেখা। কিন্তু আমরা জানি যে, ইংরেজী শিক্ষাও কন্যাদের পিতামাতার আর্থিক অবস্থার মান উন্নত করে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে—যেহেতু ইংরেজী শিক্ষিত পিতার ইংরেজী শিক্ষিতা কন্যার উপযুক্ত সম্ভাবিত যুবকের বিবাহপণ বাজারে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে।

এই বাঙ্গালী পিতার অবস্থায় পতিত ব্যক্তিকে আবশ্যকীয় পরিমাণ ঋণ দান অথবা দাতব্য করা তাহাকে সাহায্য করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। পিতাকে যদি বুঝাইতে পারা যায় এবং তাঁহার প্রাণে এরূপ শক্তি সঞ্চয় করা যায় যাহার বলে তাঁহার কন্যার বিবাহ পণ দিয়া ক্রয় করিতে তিনি অস্বীকৃত হইবেন এবং পণ না নিয়া শুধু ভালবাসার জন্য বিবাহ করিবে এরূপ বর নিজে নির্বাচন করিবেন কিংবা কন্যাকে নির্বাচন করিতে অনুমতি দিবেন—তাহাই হইবে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট সাহায্য। ইহা করিতে হইলে নির্বাচনের ক্ষেত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রসারিত করিতে হইবে। বর্ণ ও প্রদেশ এই দুইটি গণ্ডীই অতিক্রম করিতে হইবে। যদি ভারতবর্ষ এক এবং অবিভাজ্য হয় তবে নিশ্চয়ই সেখানে পরস্পরের সহিত খাওয়া বসা করিবে না অথবা বিবাহাদি ক্রিয়া করিবে না—এরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন অস্বাভাবিক বিভাগ থাকিবে না। এই নিষ্ঠুর প্রথার মধ্যে কোন ধর্ম নাই। ইহা বলিলে চলিবে না যে, ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এই বিষয়ে সংস্কারসাধন

সম্ভব নয়। কিংবা সমগ্র সমাজ পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ তৈয়ারী না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করিতে হইবে। নির্ভীক সাহসী ব্যক্তিগণের সহায়তা ব্যতীত নৃশংস অমানুষিক সামাজিক কুপ্রথা বা কদাচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সমাজ-সংস্কার কখনও সম্ভবপর হয় নাই। বিবাহ নিঃসন্দেহরূপে সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মগত একটি অনুষ্ঠান। বিবাহকে পণ্যদ্রব্যের মত একটি ব্যবসায়ের বস্তুরূপে গণ্য করিতে অস্বীকার করিয়া যদি উক্ত শিক্ষক মহাশয় বা তাঁহার কন্যাগণ উহাকে ধর্মানুগ একটি মর্যাদাকর অনুষ্ঠানের মত দেখেন তবে বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে কেন দুঃখভোগ করিতে হইবে? কাজেই লেখককে আমি এই উপদেশ দিব যে, ঋণ করা বা ভিক্ষা করার ভাব সৎসাহসের সহিত পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি নিজ কন্যার সহিত পরামর্শ করিয়া যে কোন বর্ণ বা জাতি বা প্রদেশ হইতে একটি উপযুক্ত বর নির্বাচন করিবার সৎসাহস দেখাইবেন এবং জীবনবীমা হইতে যে চারশত টাকা তিনি ধার করিতে ইচ্ছুক, তাহাও তিনি বাঁচাইতে পারিবেন।

[হরিজন, ২৫-৭-'৩৬]

বালিকাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা

জনৈকা চারুশীলা লেখিকা পত্রে জানাইতেছেন ঃ—

"'পরিহার্য দুর্গতি' শীর্ষক আপনার লিখিত প্রবন্ধ আমার নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পিতামাতা তাঁহাদের মেয়েদের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবেন কেন? এবং তজ্জন্য অশেষ কষ্ট-ভোগই বা করিবেন কেন? যদি তাঁহারা ছেলেদের মত মেয়েদিগকেও এইরূপ শিক্ষিত করেন যে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের শক্তি লাভ করিতে পারে তবে পিতামাতাকে মেয়েদের পাত্র নির্বাচনের জন্য বেশী চিন্তা করিতে হয় না। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যদি মেয়েরা সুচারুভাবে তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ পায় এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া নিজেদের ভরণপোষণে সমর্থ হয় তবে তাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ হইতে কোন অসুবিধা হয় না। কন্যাদের উচ্চ শিক্ষা বলিয়া যাহা বলা হয় আমি তাহাই অনুমোদন করিতেছি এরূপ যেন কেহ না মনে করেন। হাজার হাজার মেয়ের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয় ইহা আমি জানি। আমি কন্যাদের জন্য এইরূপ কার্যকরী জ্ঞানলাভ এবং কোন শিল্প বা ব্যবসামূলক শিক্ষা সমর্থন করি যদ্দ্বারা জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হওয়ার উপযুক্ত আত্মপ্রত্যয় তাহাদের জন্মিবে এবং তাহারা নিজদিগকে ভাবী স্বামিগণের বা পিতামাতার গলগ্রহ বলিয়া মনে করিবে না। বস্তুতঃ এইরূপ কয়েকটি বালিকাকে আমি জানি, যাহারা স্বামী-পরিত্যক্তা হইয়া আজ তাহাদের স্বামীর সঙ্গে সসম্মানে জীবনযাপন করিতেছে; কারণ এই পরিত্যক্ত অবস্থায়

তাহাদের আত্মনির্ভরশীল এবং সাধারণ শিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার এই অনুরোধ যে, বিবাহযোগ্যা মেয়েদের পিতামাতার অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিবার সময় সমস্যার এই দিক্‌টাতে আপনি জোর দিবেন।"

—আমার পত্রলেখিকা যে মনোভাবসকল ব্যক্ত করিয়াছেন আমি সর্বান্তঃকরণে তাহা অনুমোদন করি। আমাকে এইরূপ একজন পিতার বিষয় নিয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল যিনি নিজে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যাও নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পাত্রনির্বাচন নিবদ্ধ রাখিয়া নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন—তাঁহার কন্যা অনুপযুক্ত বলিয়া এরূপ ঘটে নাই। বালিকাটির "সুশিক্ষা"ই এই ক্ষেত্রে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল। যদি বালিকাটি নিরক্ষর হইত সে যে-কোন যুবকের সহিত নিজেকে মানাইয়া নিতে পারিত। কিন্তু সুশিক্ষিতা হওয়াতে স্বভাবতঃই সে তদ্রূপ "শিক্ষিত" স্বামী লাভ করিতে চাহিবে। বালিকাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য কন্যাপক্ষ হইতে পণ আদায় করিবার নীচ প্রবৃত্তি যে দ্বিধাশূন্যভাবে অযোগ্যতা বলিয়া গণ্য হয় না, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক মূল্য দেওয়া হয়। ইহা নানা প্রকারের পাপ প্রচ্ছন্ন রাখে। যে সকল সমাজের শিক্ষিত যুবকগণ মেয়েদের বিবাহ-প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য পণ আদায় করিয়া থাকে তাহারা "সুশিক্ষা" অর্থে যাহা বুঝে তাহার পরিবর্তে মনুষ্যত্বোচিত সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়াই "সুশিক্ষা"। এই অধিকতর সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিলে বরনির্বাচনের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িবে

এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রনির্বাচনের দুঃসাধ্যতা সম্পূর্ণ বিদূরিত না হইলেও, অনেকটা কমিয়া যাইবে। কাজেই আমার চারুশীলা লেখিকার প্রস্তাবের প্রতি পিতামাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং তাহা অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত অনিষ্টকারী জাতিবর্ণগত বেড়াগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আবশ্যকতার উপর জোর দিতেছি। সেগুলি ভাঙ্গিতে পারিলে নির্বাচনের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইবে এবং এই ভাবে পণ আদায়ের প্রবণতা অনেকটা প্রশমিত হইবে।

[হরিজন, ৫-৯-'৩৬]

বিবাহে ব্যয়সংকোচ

জনৈক সংবাদদাতা করাচীতে সম্পন্ন একটি বিবাহের বিবরণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। বিবাহের সময় কন্যার বয়স ছিল ষোল; তাহার পিতা, শেঠ লালচাঁদ, ধনী ব্যক্তি এবং তিনি বিবাহের ব্যয় সর্বনিম্ন অঙ্কে সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং বিবাহ-অনুষ্ঠান ধর্মানুগতরূপে ও মর্যাদার সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, ইহা বলা হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, সমগ্র বিবাহব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগে নাই, যদিও সাধারণতঃ এইরূপ ব্যাপারে বহুদিনব্যাপী অনাবশ্যক ব্যয় হইয়া থাকে। বিবাহকার্য একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ দ্বারা করানো

হইয়াছিল ; বর ও কন্যাকে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইয়াছিল তিনি তাহার অর্থ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। আমি শেঠ লালচাঁদ এবং তাঁহার পত্নীকে অভিনন্দন জানাইতেছি, কারণ শেঠজীর সহধর্মিণী তাঁহার পতিকে এই বহুকালাগত সংস্কারকার্যে সক্রিয়ভাবে সাহচর্য করিয়াছেন এবং আমি আশা করি, এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য বহুসংখ্যক ধনী ব্যক্তি অনুসরণ করিবেন। যাঁহারা খাদি ভালবাসেন তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, শেঠ লালচাঁদ এবং তাঁহার পত্নী খাদিতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান এবং বর ও কন্যা উভয়েই খাদি পরিহিত ছিল এবং তাহারা নিজেরাও খাদিতে স্থিরবিশ্বাসী এবং সর্বদা খাদি পরিধান করে। আগ্রাতে ছাত্রদের সভাতে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম এই বিবাহব্যাপার আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। একজন বন্ধু আমাকে যে সকল সংবাদ দিয়াছিলেন, উক্ত ছাত্রগণ সেইগুলি সমর্থন করিয়াছিল। সেগুলি এই—যুক্তপ্রদেশের যুবকগণ যাহারা কলেজে কিংবা স্কুলে পড়ে তাহারা নিজেরাই অল্পবয়সে বিবাহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব এবং তাহারা আশা করে যে, তাহাদের পিতামাতাগণ মূল্যবান উপহারাদির জন্য প্রভূতপরিমাণ ব্যয় করিবেন এবং ভোজ-আমোদ-প্রমোদের জন্য সমপরিমাণ কিংবা সময় সময় ততোধিক ব্যয় করিবেন। আমার সংবাদদাতা আমাকে বলেন যে, খুব উচ্চশিক্ষিত পিতামাতাগণও অর্থের গর্ব হইতে মুক্ত নহেন এবং ব্যয় সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত ধনী ব্যবসায়িগণকে তাঁহারা পরাস্ত করিয়া থাকেন! এই শ্রেণীর সকলের পক্ষেই শেঠ লালচাঁদের সেদিনের দৃষ্টান্ত এবং শেঠ

যমুনালাল বাজাজের অপেক্ষাকৃত পুরাতন দৃষ্টান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করার বিষয়ে প্রেরণা যোগাইবে। পিতামাতাগণের অপেক্ষা যুবকগণেরই ইহা বেশী কর্তব্য যে, তাহারা অপ্রাপ্তবয়সে, বিশেষতঃ পাঠ্যাবস্থায়, বিবাহ করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হইবে ; এবং যে ভাবেই হউক, সর্বপ্রকার ব্যয় বন্ধ করিবে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াটুকু সম্পন্ন করিতে দশ টাকার অতিরিক্ত খরচ আবশ্যক হইবে না এবং শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়টুকু ছাড়া আর কিছুই বিবাহব্যাপারের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে না। এই গণজাগরণের যুগে—যখন ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ, এই সকল প্রভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে—ইহা ধনী ব্যক্তিগণেরই কর্তব্য যে, তাঁহারা তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদে ও বিলাসিতায় আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া গরীব লোকদিগকে সন্তোষের সহিত জীবনযাপনের পথে চালিত করিবেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকটি মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজের নেতৃবর্গ যাহা অনুষ্ঠান করেন অন্যেরা তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে।* এই বাক্যের সত্যতা আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা দৈনিক প্রমাণিত হইতেছে এবং সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ইহা বিবাহ-ব্যাপারে ও মৃত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রমাণিত হইতেছে। সহস্র সহস্র গরীব লোক এই উপলক্ষ্যে জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিতেছে এবং

---

* যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥
—গীতা ৩।২১

মারাত্মক উচ্চহারের সুদে ঋণভারে জড়িত হইতেছে। জাতীয় সম্পদের এই অপচয় অতি সহজেই বন্ধ করা যায়, যদি দেশের শিক্ষিত যুবকগণ, বিশেষতঃ ধনী পিতামাতার সন্তানগণ, তাহাদের জন্য ব্যয়িত অর্থের সর্বপ্রকার অপচয় নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৯-'২৯]

২৭

ছাত্রদের লজ্জার কথা

প্রায় দুই মাস যাবৎ পাঞ্জাবের একটি কলেজের ছাত্রীর একখানা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী লিপি আমার দপ্তরে পড়িয়া আছে। বালিকাটির চিঠির উত্তর এড়াইবার একটা ওজুহাত মাত্র দেওয়া হইয়াছে যে সময়ের অভাব। কোনও উপায়ে আমি কর্তব্য এড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কারণ উত্তর কি দিতে হইবে জানিতাম। ইতোমধ্যে বিশেষ অভিজ্ঞা একটি ভগিনীর নিকট হইতে আমি আর একখানা চিঠি পাইয়াছি এবং আমার মনে হইল যে কলেজের মেয়েটির বিপন্ন অবস্থা নির্মম সত্য; এই বিষয়ের আলোচনা করা কর্তব্য, ইহা আর ফেলিয়া রাখা যায় না। তাহার চিঠিখানা বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে লেখা। ঐ চিঠিতে তাহার গভীর দুঃখের একটি সম্পূর্ণ চিত্র রহিয়াছে এবং আমি তাহার উত্তর যথাসাধ্যরূপে দিতে চেষ্টা করিব। চিঠির একাংশের তর্জমা নিম্নে দিতেছি :—

"এমন সময় আসে, যখন বালিকাগণকে এবং বয়স্কা নারীগণকে

তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও একাকী বাহির হইতে হয় ;—তা একই শহরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে হউক, অথবা এক শহর হইতে অন্য শহরেই হউক। এবং এইরূপে তাহাদিগকে একক দেখিতে পাইলে অসৎ প্রকৃতির লোকেরা তাহাদিগকে জ্বালাতন করে। তাহারা নিকট দিয়া পথে চলিয়া যাইতে যাইতে অসঙ্গত, এমনকি অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার করে। এবং যদি ভয়ের দরুণ বাধা না পায় তবে আরও অভদ্র ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আমার জানিতে ইচ্ছা করে—এই সকল ঘটনার সময় অহিংসনীতি কতদূর কি করিতে পারে। যদি বালিকার কিংবা মহিলার যথেষ্ট সাহস থাকে তবে সে তাহার যাহা সম্বল থাকে তাহা ব্যবহার করিতে পারে এবং দুষ্টদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে। অন্ততঃ তাহারা একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া চতুর্দিকের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং ফলে দুষ্ট লোকগুলি চাবুকের মার খাইতে পারে। কিন্তু আমি জানি যে, এই প্রকার ব্যবহারের ফলে বরাবরের জন্য রোগ শোধরাইবে না ; যন্ত্রণার বিষয়টি শুধু স্থগিত হইয়া থাকিবে। যে সকল লোক অসদ্‌ব্যবহার করে যদি তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় তবে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তাহারা যুক্তি শুনিবে এবং সহৃদয় ও নম্র ব্যবহারের মর্যাদা রক্ষা করিবে। কিন্তু যে লোক পুরুষ-সঙ্গীবিহীন বালিকা কিংবা মহিলাকে দেখিয়া সাইকেলে নিকট দিয়া যাইবার সময় অসভ্য ভাষা ব্যবহার করে, তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা ? তাহার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করিবার কোন সুযোগ হইবে না। তাহার সহিত পুনরায় দেখা হইবারও সম্ভাবনা নাই এবং তাহাকে হয়ত চিনিতেও পারা যাইবে না। কারণ তাহার ঠিকানা জানা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে নিরুপায় বালিকা বা মহিলা কি করিবে ? দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি আপনার নিকট আমার গত রাত্রির (২৬শে অক্টোবর) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছি। সন্ধ্যা প্রায় ৭-৩০ ঘটিকার

সময় আমি আমার জনৈকা বালিকা সঙ্গিনীসহ অত্যন্ত জরুরী কাজে যাইতেছিলাম। সেই সময় কোন পুরুষ সঙ্গী পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং যে জরুরী কাজে যাইতেছিলাম তাহাও দেরীতে করিবার উপায় ছিল না। পথে একটি শিখ যুবক তাহার সাইকেলে যাইতেছিল এবং কি যেন ক্রমাগত বলিতেছিল। যখন এতটা নিকটে আসিল যে আমরা শুনিতে পাই তখন বুঝিলাম আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সে তাহা বলিতেছিল। আমরা অপমানিত ও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। রাস্তায় কোন লোকজন ছিল না। আমরা কয়েক পা যাইতে না যাইতেই যুবকটি ফিরিয়া আসিল। আমরা তাহাকে তখনই চিনিতে পারিলাম, যদিও সে যথেষ্ট দূরে ছিল সেই সময়। সে গাড়ীর চাকা ঘুরাইয়া আমাদের দিকে আসিল এবং ভগবানই জানেন সে নামিতে চাহিয়াছিল কিনা কিংবা শুধু আমাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। আমাদের মনে হইল, আমরা বিপন্ন। আমাদের শারীরিক সামর্থ্যে আমাদের আস্থা ছিল না। আমি নিজে সাধারণ বালিকাদের চাইতে দুর্বল। আমার হাতে একখানা বড় বই ছিল। হঠাৎ আমার হৃদয়ে সাহস আসিল। আমি ভারী বইখানা সাইকেল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিলাম এবং চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'তোমার খামখেয়ালী পুনরায় দেখাইতে সাহস পাইতেছ?' সে কষ্টের সহিত তাহার মানদণ্ড বজায় রাখিয়া সাইকেল জোরে চালাইয়া আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিল। দেখা যাইতেছে—যদি আমি বইখানা তাহার সাইকেল লক্ষ্য করিয়া না ছুঁড়িতাম তবে আমাদের যাত্রার শেষ পর্যন্ত সে আমাদিগকে অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া উত্যক্ত করিত। ইহা হয়ত একটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনা, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি আপনি একবার লাহোরে আসিয়া আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীনা বালিকাগণের দুঃখকষ্টের বিষয় শ্রবণ

করুন। আপনি নিশ্চয়ই ইহার উপযুক্ত প্রতিকার আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

"প্রথমতঃ বলুন, উল্লিখিত অবস্থাতে বালিকাগণ অহিংসনীতি অবলম্বন করিয়া কিরূপে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারে?

"দ্বিতীয়তঃ, মেয়েদিগকে অপমানিত করার ঘৃণিত অভ্যাস হইতে যুবকগণকে মুক্ত করার উপায় কি?

"আশা করি আপনি ইহা বলিবেন না যে, ভবিষ্যতে শিশুকাল হইতে নারীগণের প্রতি নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত নূতন বংশধারা সৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে এবং আমরা সহ্য করিয়াই যাইতে থাকিব। সরকার পক্ষও এই সামাজিক ব্যাধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে অনিচ্ছুক কিংবা অপারগ। বড় বড় নেতাগণের ত এই সকল সমস্যা আলোচনা করিবার সময় নাই। কেহ কেহ যখন শুনেন যে কোন বালিকা সাহসিকতা দেখাইয়া অভদ্র যুবককে বেশ শিক্ষা দিয়াছে তখন বলেন, 'বেশ করিয়াছে। এইভাবেই বালিকাদিগকে আচরণ করিতে হইবে।' কোন কোন সময় কোন নেতাকে ছাত্রদের এইরূপ অসদাচরণের বিরুদ্ধে জোরের সহিত বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। কিন্তু কেহই এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য নিজকে সর্বসময়ের জন্য নিয়োজিত করেন না। আপনি শুনিয়া দুঃখিত ও আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, দেওয়ালী এবং অন্যান্য পর্বদিনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া নারীদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় যেন তাহারা আলোকসজ্জা পর্যন্ত দেখিতে ঘরের বাহির না হয়। পৃথিবীর এই অংশে আমরা কিরূপ সংকটের মধ্যে অবস্থান করিতেছি এই একটি ঘটনাই তাহা আপনাকে জানাইয়া দিবে। এই সকল সতর্কবাণী যে কাগজে আদৌ বাহির করা হয় তাহা হইতে ইহাই

প্রমাণ হয় যে, এই সকলের লেখক বা পাঠকগণের লজ্জার কোন জ্ঞান নাই।"

—অপর একটি পাঞ্জাবী বালিকাকে আমি এই চিঠিখানা পড়িতে দেই। সেও তাহার কলেজে পড়ার সময়ের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই বিবরণ সমর্থন করে এবং আমাকে বলে যে, আমার পত্রলেখিকা যাহা বর্ণনা করিয়াছে তাহাই অধিকাংশ বালিকাদের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা।

অপর চিঠিতে একজন অভিজ্ঞা মহিলা লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার বালিকা বন্ধুদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। সিনেমা বা চলচ্চিত্রগৃহে বালিকাদের পিছনে সারি সারি উপবিষ্ট বালকগণ দ্বারা তাহারা উপদ্রুত হয়; তাহারা এমন সব ভাষা ব্যবহার করে যাহাকে আমি অশ্লীল ছাড়া কিছু বলিতে পারি না। এমনকি, তাহারা যে সব বাস্তব রসিকতা করিয়া নানা অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে আমার পত্রলেখিকা সেইগুলির বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু তাহার পুনরুল্লেখ আমি এখানে কিছুতেই করিব না।

যদি উপস্থিত শারীরিক আপদ হইতে মুক্তিই বিষয় হয় তবে যে মেয়েটি নিজেকে দুর্বল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে সে যে প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়াছিল অর্থাৎ সাইকেল-চালকের প্রতি তাহার পুস্তক নিক্ষেপ, তাহা নিঃসন্দেহরূপে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ প্রতিকার যুগযুগান্ত হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এবং এই পত্রিকার স্তম্ভে আমি বলিয়াছি যে, যখন কোন ব্যক্তি হিংসার আশ্রয় নিতে চায় শারীরিক দুর্বলতা সেই হিংসাবৃত্তি কার্যকরীরূপে ব্যবহারের পক্ষে বাধা

জন্মায় না ; এমনকি, প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও না। এবং আমরা অবগত আছি যে, বর্তমান যুগে শারীরিক শক্তি প্রয়োগের এত সব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে একটি ক্ষুদ্র বালিকাও উপযুক্ত বুদ্ধি থাকিলে প্রবল প্রতিপক্ষের মৃত্যু ও বিনাশ ঘটাইতে পারে। আমার পত্রলেখিকা যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছে সেইরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার রীতি বর্তমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। যদিও সে সেই সময়ে তাহার হাতের পুস্তকখানিকে আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপে কার্যকরীরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি তাহার এই জ্ঞান যথেষ্ট আছে যে ইহা এই ক্রমবর্ধনশীল উক্ত কদভ্যাসের কোন প্রতিকার নয়। রূঢ় এবং অশিষ্ট মন্তব্যাদির বেলায় কোন মানসিক চঞ্চলতা উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা উপেক্ষা করাও চলে না। এরূপ সব ঘটনা কাগজে ছাপাইয়া দিতে হইবে। যেখানে অপরাধীকে বাহির করা যায়, তাহাদের নাম প্রচারিত করিতে হইবে। এই কুঅভ্যাসের বিষয় প্রকাশিত করিতে কোন প্রকার মিথ্যা লজ্জার স্থান থাকিবে না। বাহিরের দুর্ব্যবহারের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদর্শন করিবার পক্ষে জনমতের ন্যায় শক্তিশালী আর কিছু নাই। লেখিকা বলিয়াছে, এই সকল বিষয়ে জনসাধারণের যথেষ্ট উদাসীনতা রহিয়াছে ; ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কেবল জনসাধারণেরই দোষ নহে। অশিষ্ট ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্মুখে আসিবেই। যেমন চুরির বিষয়ে তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিলে এবং তার পর অনুসন্ধান করিতে না থাকিলে তৎসম্বন্ধে কিছু করা যায় না,

সেইরূপ যদি অশিষ্ট ব্যবহারের ঘটনাগুলি চাপিয়া যাওয়া যায় তবে সেইগুলি সম্বন্ধে কোন প্রতিকার করা অসম্ভব। অপরাধ এবং পাপ সাধারণতঃ গোপনে অন্ধকারে বিচরণ করে এবং আলোকপাত হওয়া মাত্র তাহারা অদৃশ্য হয়।

কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, বর্তমান যুগের প্রগতিশীলা বালিকা জুলিয়েটের মত অর্ধ-ডজন রোমিওর সঙ্গে প্রণয়ের খেলা খেলিতে ভালবাসে। আমার পত্রলেখিকা কিন্তু সেই শ্রেণীর প্রতীক নয় বলিয়া মনে হয়। আধুনিকা বা প্রগতিশীলা বালিকা নিজেকে বায়ু, জল ও উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পোশাক পরিধান করে না, তাহা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই করিয়া থাকে। নিজকে রঙে রঞ্জিত করিয়া অসাধারণ রূপ দেখাইয়া সে প্রকৃতির উপরও উৎকর্ষসাধনে চেষ্টিত থাকে। অহিংসনীতি এই শ্রেণীর বালিকাদের জন্য নয়। আমি এই পত্রিকার স্তম্ভে অনেকবার মন্তব্য করিয়াছি যে, আমাদের ভিতরে অহিংসনীতির মূলপ্রেরণা জাগাইয়া তোলা ও তাহা বর্ধিত করা কতগুলি সুনির্দিষ্ট সংযমের অধীন। এই প্রচেষ্টা বিশেষ কষ্টসাধ্য। চিন্তাধারা এবং জীবনযাত্রায় অহিংসনীতি আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। যদি আমার পত্রলেখিকা এবং তাহার সঙ্গে সমভাবাপন্না মেয়েরা নির্দিষ্ট উপায়ে তাহাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন করিতে পারে তবে তাহারা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, যে সকল যুবক আদৌ তাহাদের সংস্পর্শে আসে তাহারা তাহাদিগকে সম্মান করিতে এবং তাহাদের সহিত যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে। যদি দৈবাৎ তাহারা দেখিতে পায়

(ইহা সম্ভবপর বটে) যে, তাহাদের সতীত্ব পর্যন্ত নষ্ট হইবার উপক্রম তখন মানুষের পশুপ্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করিবার উপযুক্ত সাহস তাহাদের অর্জন করিতে হইবে। ইহা আমাকে বলা হইয়াছে যে, বালিকার মুখ বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা এরূপভাবে তাহাকে বাঁধা হইয়াছে যে সে কোন শারীরিক চেষ্টা করিতেও অসমর্থ, সে ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা আমি যতটা সহজ মনে করি ততটা সহজ নয়। আমার ধারণা এই, যে বালিকার বাধা দিবার ইচ্ছাশক্তি আছে তাহাকে অক্ষম করিবার জন্য যতপ্রকার বন্ধন ব্যবহার করা হইয়াছে সেইগুলি সে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাহাকে মৃত্যুবরণ করিবার শক্তি যোগাইবে।

কিন্তু এইরূপ বীরত্ব শুধু তাহাদের পক্ষেই সম্ভব যাহারা তজ্জন্য নিজদিগকে শিক্ষিত করিয়াছে। যাহাদের অহিংসনীতিতে জ্বলন্ত বিশ্বাস নাই তাহাদিগকে আত্মরক্ষার সাধারণ উপায় শিক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাই তাহাদিগকে শ্রদ্ধাহীন যুবকগণের অশ্লীল আচরণ হইতে রক্ষা করিবে।

কিন্তু বড় প্রশ্ন এই—যুবকগণ এরূপভাবে সাধারণ সদাচার-বিহীন কেন হইবে যে সুশীলা মেয়েরা সর্বদা তাহাদের উপদ্রবের ভয়ে ভীত থাকিবে? যদি ইহা আবিষ্কার হয় যে, যুবকদের অধিকাংশই স্ত্রীলোকের প্রতি সদাচার ও শ্রদ্ধার সর্বপ্রকার জ্ঞান হারাইয়াছে তবে আমি দুঃখিত হইব। কিন্তু তাহারা যুবকশ্রেণী হিসাবে সতর্কতার সহিত নিজেদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিবে আশা করা যায় এবং তাহাদের সহযোগীদের মধ্যে যে

কোন অসঙ্গত আচরণ দেখিতে পাইবে সেইগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে। তাহারা প্রত্যেক রমণীর মান সম্ভ্রম তাহাদের নিজ নিজ ভগিনী এবং মাতাগণের মান সম্ভ্রমের ন্যায় আচরণীয় বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা করিবে। যদি তাহারা সদাচরণ না শিখে তবে তাহারা যত শিক্ষাই পাইয়া থাকুক তাহা ব্যর্থ হইবে।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে নির্দিষ্ট বিষয় সকলের জন্য ছাত্রদিগকে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া যেমন অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের কর্তব্য, সেইরূপ তাঁহাদের ছাত্রগণ যাহাতে সর্বদা ভদ্র এবং সদাচারপরায়ণ হইতে পারে তৎপ্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা কি কর্তব্য নয়?

সেবাগ্রাম, ২৮-১২-'৩৮

[হরিজন, ৩১-১২-'৩৮]

২৮

আধুনিকা নারী

নাম ও ঠিকানাযুক্ত এগারটি বালিকার একখানা চিঠি আমি পাইয়াছি। অর্থের ব্যত্যয় না করিয়া চিঠিখানা আরও পাঠযোগ্য করিবার মত পরিবর্তন করিয়া নিম্নে দিতেছি:—

"৩১শে ডিসেম্বরের হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছাত্রীর চিঠির উপর 'ছাত্রদের কলঙ্ক' শীর্ষক মন্তব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার উপযোগী। ইহাতে মনে হয় যে আধুনিকা বালিকা আপনাকে

এতটা ক্ষুব্ধ করিয়াছে যে শেষ পর্যন্ত আপনি তাহার মধ্যে অর্ধ ডজন রোমিওর সহিত জুলিয়েটের খেলা খেলিবার যোগ্যতা দেখিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। এই মন্তব্য দ্বারা সমগ্র নারীজাতি সম্বন্ধে আপনার যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নারীসমাজকে অনুপ্রাণিত করে না।

"বর্তমান যুগে যখন নারী পুরুষের সাহায্যার্থ এবং তাহার সহিত সমান অংশে জীবনভার বহন করিবার জন্য গৃহকোণ হইতে বাহিরে আসিতেছে, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক যে পুরুষের নিকট দুর্ব্যবহার পাইলেও নারীকেই দোষ দেওয়া হয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন ঘটনা ঘটে যেখানে দোষ উভয় পক্ষে সমভাবে বিদ্যমান। অল্পসংখ্যক বালিকা থাকিতে পারে যাহারা অর্ধ ডজন রোমিওর সহিত জুলিয়েটের খেলা খেলে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে ধরিয়া লইতে হইবে যে, জুলিয়েটের খোঁজে অর্ধ ডজন রোমিও রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না এবং বলা উচিতও নয় যে, আধুনিকা বালিকাগণ সকলেই জুলিয়েট অথবা আধুনিক যুবকগণ সকলেই রোমিও। আপনি নিজে বহু সংখ্যক আধুনিকা বালিকার সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, ত্যাগ ও নারীসুলভ অন্যান্য নিখুঁত গুণাবলী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

"আপনার পত্রলেখিকা যে সকল অসদাচরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ইহা করা বালিকাদের কর্তব্য নয়। মিথ্যা লজ্জাসম্ভ্রমের ভাব হইতে ততটা না হইলেও, ইহার নিষ্ফলতাই তাহার কারণ।

"কিন্তু জগৎপূজ্য একজনের নিকট হইতে এইরূপ বর্ণনা সেই বহুকালের পুরাতন এবং অসঙ্গত উক্তিকেই যেন আবার সমর্থন করে—'নারী নরকের দ্বার।'

"পূর্বোক্ত মন্তব্য হইতে আপনি এই সিদ্ধান্ত করিবেন না যে, আধুনিকা মেয়েরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে না। প্রত্যেক যুবক আপনাকে যতদূর শ্রদ্ধাভক্তি করে, মেয়েরাও ততটা করে। তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারে না যে, তাহাদিগকে ঘৃণা করা হইবে বা তাহাদিগকে কৃপার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। তাহারা তাহাদের চালচলন সংশোধন করিতে প্রস্তুত—যদি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের দোষত্রুটি থাকে। তাহাদের প্রতি দোষারোপ করার পূর্বে তাহাদের কোন দোষ থাকিলে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে তাহারা 'আহা, ইহারা দুর্বল নারীজাতি'— এইরূপ অজুহাতের আশ্রয় নিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায় না; আবার নিজ ইচ্ছানুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে বিচার করার ভার বিচারকের উপর দিয়া তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতেও চাহে না। সত্যের সম্মুখীন হইতেই হইবে; আধুনিকা বালিকা বা আপনি যাহাকে 'জুলিয়েট' বলিয়াছেন, সত্যের সম্মুখীন হইতে তাহার যথেষ্ট সাহস আছে।"

—আমার পত্রলেখিকাগণ বোধ হয় জানেন না যে, চল্লিশ বৎসরেও পূর্বে, যখন সম্ভবতঃ তাহাদের কাহারও জন্ম হয় নাই, আমি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতের নারীদের সেবাকার্যে ব্রতী হই। নারীজাতির অসম্মানজনক কিছু লিখিতে আমি নিজেকে অক্ষম বলিয়াই মনে করি। আমি নারীজাতিকে এতদূর শ্রদ্ধা করি যে, আমার পক্ষে তাহাদের সম্বন্ধে মন্দ কিছু চিন্তা করাও সম্ভবপর নয়। ইংরেজীতে যে বলা হয়, নারী মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশ, বাস্তবিক নারী তা-ই। আমার প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রসমাজের কলঙ্ক প্রকাশ করিয়া দেওয়া—মেয়েদের

দুর্বলতা প্রচার করা লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু রোগের নিদান নির্ণয় করিতে গিয়া যে যে কারণে রোগের সৃষ্টি হয়, সেই সব বিষয়ই আমি উল্লেখ করিতে বাধ্য, নতুবা আমি উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিব না।

"আধুনিকা বালিকা" শব্দগুলির একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেইজন্য আমার অভিমত মাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেছে এইরূপ সকল বালিকাই প্রগতিশীলা নহে। আমি অনেককে জানি, যাহারা "প্রগতিশীলা মেয়ে"দের হাবভাব দ্বারা সংক্রামিত নয়। কিন্তু কতিপয় বালিকা আছে যাহারা প্রগতিশীলা হইয়া পড়িয়াছে। আমার মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বালিকা ছাত্রীদিগকে প্রগতিশীলা মেয়েদের অনুকরণ না করিতে সাবধান করিয়া দেওয়া এবং যে সমস্যা অত্যন্ত ভীতি-জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে আরও জটিল করিতে না দেওয়া। কারণ আমি যখন উল্লিখিত পত্র পাই, তখন একটি অন্ধ্রদেশীয়া মেয়ের নিকট হইতেও একখানা পত্র পাই। তাহাতে অন্ধ্রদেশীয় ছাত্রগণের আচরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা লাহোরের মেয়েটির বর্ণনা হইতেও নিকৃষ্ট। অন্ধ্রের এই কন্যা আমাকে বলিতেছে যে, তাহার বালিকা বন্ধু-গণের সাদাসিদা পোশাক তাহাদিগকে কোনরূপে রক্ষা করিতে পারে না। বালকদের বর্বরোচিত আচরণ তাহারা যে বিদ্যালয়ে পড়ে সেই বিদ্যালয়ের কলঙ্কস্বরূপ; কিন্তু বালিকাদের সেই

সকল বিষয় প্রকাশ করিবার সাহস নাই। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমি এই অভিযোগের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

আমি এই এগারটি বালিকাকে ছাত্রদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি। যাহারা নিজেদের সাহায্য করে ভগবান তাহাদেরই সহায় হন। পুরুষের গুণ্ডামি হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবার কৌশল তাহাদিগকে অবশ্য শিখিতে হইবে।

বার্দোলী, ৩০-১-'২৯

[হরিজন, ৪-২-'৩৯]

২৯

নৈতিক উভয়সংকট

জনৈক বন্ধু লিখিতেছেন :—

"প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে কোন সামাজিক দুর্ঘটনায় এই শহর আলোড়িত হইয়াছিল। একজন বৈশ্য ভদ্রলোকের একটি ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যা ছিল। মেয়েটির একুশবৎসরবয়স্ক এক মাতুল সেই শহরেই কলেজে পড়িত। দুইজনই গোপন প্রেমে পড়ে। বালিকাটির গর্ভসঞ্চার হয়। অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে প্রণয়িযুগল বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করে। বালিকাটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায় কিন্তু বালকটি দুই দিন পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বাদানুবাদের ঝড় উঠে এবং সকলের মুখেই এই কথা বলাবলি হওয়ায় অবস্থা এতটা গড়ায় যে, বালিকাটির

শোকাতুর পিতামাতার পক্ষে সেই শহরে বাস করাই কঠিন হইয়া পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থামিয়া যায়। কিন্তু লোকের মনে ঘটনাটির স্মৃতি এখনও বর্তমান রহিয়াছে এবং যখনই এই রকমের কোন কথাবার্তা উঠে তখনই প্রায় এই ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়। যখন ঝড় অত্যন্ত প্রবল এবং হতভাগ্য মৃত প্রণয়িযুগলের সম্বন্ধে সহৃদয়তাপূর্ণ একটি কথাও কেহ বলে নাই, তখন আমার মত ব্যক্ত করিয়া সকলকে বিস্মিত ও ব্যথিত করি—যে, উপরোক্ত অবস্থাধীনে এই অল্পবয়স্ক প্রণয়িযুগলকে তাঁহাদের নিজ মতানুযায়ী চলিতে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার অরণ্যে রোদনই হইল। এ বিষয়ে আপনার মত কি ?"

—আমি ইচ্ছা করিয়াই লেখকের অনুরোধে তাঁহার নাম ও বাসস্থান গোপন করিয়াছি ; কারণ একটি পুরাতন তর্ক জাগাইয়া তুলিয়া পুরাতন ক্ষতগুলি আবার খুলিয়া দেখাইতে তিনি ইচ্ছা করেন না। তাহা সত্ত্বেও আমি মনে করি এই গুরুতর বিষয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, কোন বিশেষ সমাজে যে সকল বিবাহ নিষিদ্ধ সেগুলিকে প্রথমেই একেবারে চালু করা চলে না, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাতেই তাহা করা যায় না। পক্ষান্তরে, যে সকল যুবক-যুবতী এই প্রকারের বিবাহ করিতে চায় তাহাদের উপর প্রতিকূল ইচ্ছা চালাইবার অথবা জোর করিয়া তাহাদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা খর্ব করিবার কোন অধিকার সমাজের কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আত্মীয়স্বজনেরও নাই। লেখকের উল্লিখিত ঘটনায় উভয়পক্ষই সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তবয়স্ক ছিল। তাহারা নিজেদের বিষয় নিজেরা বিবেচনা করিতে সক্ষম ছিল।

তাহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহা হইতে তাহাদিগকে বিরত করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। খুব বেশী কিছু করিতে চাহিলে সমাজ এরূপ বিবাহ স্বীকার না করিতে পারিত কিন্তু তাহাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইল—ইহা সামাজিক অত্যাচারের চরম বলিতে হইবে।

বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ সার্বজনীন নহে এবং সেগুলি অনেক পরিমাণে সামাজিক প্রথার উপর নির্ভর করে; প্রথাও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানারকম, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় না যে, যুবক-যুবতীগণ সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রথা ও বিধিনিষেধসকল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলিবে। এরূপ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে জনমত তাহাদের অনুকূলে গঠন করিতে হইবে। তাহা না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ধীরভাবে তাহাদের সময়ের অপেক্ষা করিবে। আর যদি তাহারা তাহা না করিতে পারে তবে স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে সমাজে একঘরে হইয়া থাকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

পক্ষান্তরে, যাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথানিয়মাদি উপেক্ষা করে বা ভঙ্গ করে তাহাদের প্রতি হৃদয়হীন এবং বিমাতার ন্যায় মনোভাব পোষণ না করাও সমাজের পক্ষে অনুরূপ কর্তব্য। লেখকের কথিত ঘটনার যে বিবরণ আমাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এই যুবক-যুবতীকে আত্মহত্যার পথে চালাইবার অপরাধ নিশ্চয়ই সমাজের স্কন্ধে সম্পূর্ণ পড়িবে।

[হরিজন, ১৯-৫-'৩৭]

৩০

বিবাহের আদর্শ

জনৈক বন্ধু লিখিতেছেন ঃ—

"হরিজন সেবকের বর্তমান সংখ্যায় 'নৈতিক উভয়সংকট' নামীয় আপনার প্রবন্ধে আপনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 'সামাজিক প্রথা হইতেই বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন ক্ষেত্রেই সেগুলি কোন মূল নৈতিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা দেখা যায় না।' আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, সুপ্রজনন সম্বন্ধীয় বিষয়ের বিবেচনা হইতে সম্ভবতঃ এই সকল বিধিনিষেধ প্রবর্তিত করা হইয়াছে। প্রজননবিজ্ঞানের এই একটি সর্বজনবিদিত নিয়ম যে, অসবর্ণ প্রাণীদের সংযোগে উৎপন্ন সন্তানসন্ততি স্বগোত্রে বিবাহজাত সন্তানাদি হইতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের দিক্ দিয়া যোগ্যতর। হিন্দুশাস্ত্রে সেইজন্যই সগোত্র এবং সপিণ্ডগণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যদি স্বীকার করিয়া লই যে চিরপরিবর্তনশীল ও প্রতিমুহূর্তে বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক প্রথাই এই সকল বিধিনিষেধের একমাত্র কারণ তাহা হইলে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রী অথবা এমনকি ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়ার কোন প্রবল কারণ পাওয়া যায় না। আপনার কথামতে যদি সন্তানোৎ-পাদনই বিবাহের একমাত্র সঙ্গত উদ্দেশ্য হয়, তবে স্বামীস্ত্রী নির্বাচন ব্যাপারটি কেবল প্রজননার্থে মিলনের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত কম জরুরী বলিয়া অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়গুলি কি উপেক্ষা করিতে হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে তাহাদের কোন্‌টি বড়, কোনটি ছোট বিবেচিত হইবে? আমি নিম্নলিখিতরূপে এই ক্রম উল্লেখ

করিব :—(১) পরস্পরের আকর্ষণ বা ভালবাসা, (২) প্রজনন সম্বন্ধীয় যোগ্যতা, (৩) সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির অনুমোদন এবং সম্মতি এবং দম্পতীপক্ষ যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত সেই সমাজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি, (৪) আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই বিষয়ে আপনার মত কি ?

"হিন্দুশাস্ত্রসমূহে সন্তান-উৎপাদনকেই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবাহের সময় বয়োবৃদ্ধগণের ভাবী গৃহকর্ত্রীকে 'তোমার আটটি সন্তান হউক' এই বলিয়া যে আশীর্বাদ করা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা এই বিষয় প্রমাণ করে। বিবাহের পর সহবাস যে শুধু সন্তান-উৎপাদনের জন্য এবং কখনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয় আপনার এই যুক্তি এতদ্দ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু তাহা হইলে আপনি কি আশা করিতে পারেন যে, পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, একটি মাত্র সন্তান লাভ করিয়াই দম্পতী পরিতৃপ্ত হইবে ? বংশরক্ষা করার ইচ্ছা আপনি যথার্থই স্বীকার করিয়াছেন ; তাহা ছাড়াও আমাদের মধ্যে একটি দৃঢ় ধারণা বর্তমান আছে যে, একমাত্র পুত্রসন্তান দ্বারাই বংশরক্ষা হয়। এবং সেইজন্যই পুত্রের জন্ম হইতে কন্যার জন্ম কম আনন্দদায়ক। পুত্রসন্তানলাভের জন্য ব্যাপক বাসনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনি কি শুধু একটি পুত্রসন্তান লাভ করিবার আদর্শ এরূপভাবে পরিবর্তিত করা সঙ্গত মনে করেন না যে, পুত্রসন্তান লাভ না করা পর্যন্ত কন্যাসন্তানও কয়েকটি জন্মগ্রহণ করিতে পারে ?

"আমি আপনার সহিত এই বিষয়ে একমত—যে ব্যক্তি শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য সহবাস করে তাহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আপনার মতের সহিত আমারও এই মত—যে দম্পতী বিবাহের পূর্বে এবং পরে পবিত্রতা এবং আত্মসংযমের নীতি পালন করিয়াছে তাহারা একবার সহবাস করিলেই গর্ভসঞ্চার হইবে।

আপনার প্রথম তর্কের সমর্থনে আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বামিত্র ও অরুন্ধতীর প্রসিদ্ধ গল্প রহিয়াছে; অরুন্ধতী ছিলেন বশিষ্ঠের পত্নী এবং তাঁহার শতপুত্র হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সাধ্বী ব্রহ্মচারিণী বলিয়া সংবর্ধনা করিয়াছিলেন; তাঁহার আদেশ পঞ্চভূতও পালন করিতে বাধ্য ছিল, কারণ স্বামীর সহিত তাঁহার যৌনসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে মাতৃত্বের কর্ত্তব্যজ্ঞানলাভ ও সেই কর্ত্তব্যপালনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, এমনকি হিন্দুশাস্ত্রগুলিও একটিমাত্র সন্তানলাভের আপনার কথিত আদর্শ সমর্থন করিবে না—সে পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক। সেইজন্য আমার মনে হয় যে, বিবাহিত জীবনের আপনার আদর্শ যদি এরূপভাবে আরও প্রসারিত করেন যে একটি পুত্রসন্তান লাভ না হওয়া পর্যন্ত কতিপয় কন্যাসন্তানও সম্ভবতঃ লাভ করা যাইতে পারে, তবে ইহা বহু দম্পতীকে অনেকটা প্রসন্ন করিবে। অন্যথা আমার আশঙ্কা হয় যে, অনেকেই একেবারে বিবাহ না করার চাইতে প্রথম সন্তান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ ত্যাগ করা অধিকতর কঠিন মনে করিবে, কারণ সেই সন্তান পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, তার পর সারাজীবন তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে যৌনসম্পর্ক হইতে বিরত থাকিতে হইবে। স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমস্পৃহা মানবের আদিম বৃত্তি—ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। আত্মসংযম একটি অর্জিত ভাব, ইহা যত্নপূর্বক অভ্যাস করিতে হয়। ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রমোন্নতিই মানবের পূর্ণ বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম; আত্মসংযম তাহা লাভ করার একটি সোপানবিশেষ। এইজন্যই আত্মসংযমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। যে ব্যক্তি যৌনসম্বন্ধ শুধু সন্তান উৎপাদনের উপায়—এই আদর্শ নিয়া জীবন যাপন করে তাহাকে আমি সম্মান করি। ইহাও আমার মত যে, অন্য যে কোন অবস্থায় সহবাস শুধু ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিমাত্র। কিন্তু ইহাকে আমি ঘোর পাপের

কার্য বলিয়া নিন্দা করিতে প্রস্তুত নই, কিংবা যে দম্পতী স্বভাবের তাড়না সহ্য করিতে পারে না তাহাদিগকে অধঃপতিত জীব বলিয়া সহজলভ্য করুণা অথবা ভ্রূকুটিপূর্ণ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত নই।"

—বিবাহ-বিষয়ে নানাবিধ বিধিনিষেধের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি কি তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু ইহা আমার নিকট সুস্পষ্ট বোধ হয়, যে সামাজিক প্রথা বা নিয়ম সদ্‌গুণ ও আত্মসংযম লাভে সহায়তা করে তাহাকে নৈতিক ব্যবস্থার পবিত্র মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। যদি ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ যৌনসম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ হইয়া থাকে, তবে সেগুলি সমভাবে খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি ভ্রাতাভগ্নীস্থানীয়দের বিবাহ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কাজেই কোন বিশেষ সমাজে যদি এই সকল বিধিনিষেধ বর্তমান থাকে তবে সেইগুলি সর্বদাই মানিয়া চলার অভ্যাস করা নিরাপদ হইবে। আমার পত্রলেখক আদর্শ বিবাহের যে সকল সর্তাদি উল্লেখ করিয়াছেন মোটামুটি আমি সেগুলি গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু তাহাদের গুরুত্বের ক্রম আমি পরিবর্তন করিতে চাই এবং "ভালবাসা"কে তালিকার সর্বনিম্ন স্থান দিতে চাই। ইহাকে প্রথম স্থান দিলে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া যাইতে পারে এবং কমবেশী ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। কাজেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে বিবাহ-নির্বাচন ব্যাপারে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত। তারপর আসিবে সেবা এবং তৃতীয় স্থানে আসিবে পারিবারিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ এবং সমাজের শ্রেণীগত স্বার্থ; এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ

বা ভালবাসা চতুর্থ এবং সর্বশেষ স্থান অধিকার করিবে। ইহার অর্থ এই—যেখানে অপর চারটি বিষয় পূর্ণ হইতেছে না সেখানে শুধু "ভালবাসা"ই বিবাহের যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যেখানে ভালবাসা নাই অথচ অন্য সবগুলি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইতেছে সেখানেও সমভাবে বিবাহ বর্জন করিতে হইবে। যৌনসম্পর্কীয় যোগ্যতার সর্তটি আমি কাটিয়া দিব, কারণ সন্তান উৎপাদনই যখন বিবাহের মূল উদ্দেশ্য, যৌনসম্পর্কীয় যোগ্যতাকে শুধু একটি "সর্ত" বলিয়া গণ্য করা চলে না— ইহা না থাকিলে বিবাহ হইতেই পারে না (*sine qua non*)।

হিন্দুশাস্ত্রে নিশ্চয়ই পুত্রসন্তানের দিকে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়ের প্রবর্তন হইয়াছিল সেই সময় যখন বাহুবলে যুদ্ধ করা প্রচলিত ছিল এবং জীবনসংগ্রামে কৃতকার্যতা লাভের জন্য উপযুক্তসংখ্যক লোকজনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক ছিল। সেইজন্য তখন কোন ব্যক্তির পুত্রসংখ্যার দ্বারাই তাহার জীবনীশক্তি ও দৈহিক সামর্থ্যের পরিচয় বিবেচিত হইত এবং বহুসংখ্যক সন্তান উৎপাদনে সহায়তার জন্য এমনকি বহুবিবাহপ্রথাও প্রচলিত হয় এবং তাহা সমাজে সংবর্ধিত হয়। কিন্তু যদি বিবাহকে ধর্মমূলক পবিত্র ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা যায় তবে একটিমাত্র সন্তান উৎপাদনের স্থানই ইহাতে আছে এবং সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে প্রথম সন্তানকে "ধর্মজ" এবং পরবর্তী সকল সন্তানকে "কামজ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন প্রভেদ করি না।

এইরূপ ভেদজ্ঞান আমার মতে অন্যায় এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পুত্রই জন্মগ্রহণ করুক বা কন্যাই জন্মগ্রহণ করুক, উভয়েই সমভাবে আদরণীয়।

বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের গল্প অতি সুন্দররূপে দৃষ্টান্তদ্বারা এই নীতি প্রমাণিত করিতেছে যে, কেবল সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যৌনক্রিয়া সম্পাদিত হইলে ব্রহ্মচর্যের সর্বোচ্চ আদর্শের সহিত তাহার অসামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু সেই গল্পের সবটাই অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য যৌনক্রিয়া পশুত্বেই ফিরিয়া যাওয়া; এবং সেইজন্য মানুষ উহার উর্ধ্বে উঠিতে চেষ্টা করিবে। স্বামী স্ত্রী যদি তাহা করিতে অক্ষম হয়, উহাকে পাপ বা লোকনিন্দার বিষয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের রসনার পরিতৃপ্তির জন্য আহার করিয়া থাকে; সেইরূপ লক্ষ লক্ষ স্বামী স্ত্রীও তাহাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্যই যৌনক্রিয়ায় আসক্ত হয় এবং হয়ত সেইরূপ করিতে থাকিবেও; এবং তজ্জন্য প্রকৃতি স্বভাবগত নিয়মভঙ্গের জন্য অশেষ অমঙ্গল ও ব্যাধির আকারে যে সকল দুর্নিবার শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে তাহারা তাহাই ভোগ করে। যাহারা আধ্যাত্মিক বা উচ্চস্তরের জীবন লাভ করিতে অভিলাষী তাহাদের জন্যই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অথবা বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্যের আদর্শ; আত্মসংযম ব্যতীত এরূপ আধ্যাত্মিক জীবন কিছুতেই লাভ করা যায় না।

[হরিজন, ৫-৬-'৩৭]

৩১

বিবাহিত জীবনের সূচনায়

[গান্ধী সেবা সঙ্ঘ একটি নৈতিক সমিতি—ইহা জনসাধারণের সেবাব্রতী সভ্যগণ দ্বারা গঠিত ; তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবকেই প্রাধান্য দিয়া কর্মসমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হন এবং তাঁহাদের আলোচনা সর্বদাই আত্মপরীক্ষামূলক। এই সঙ্ঘের সহায়তায় গান্ধীজী তাঁহার দৌহিত্রী এবং আমার ভগ্নীর বিবাহ এবং আমার ভ্রাতা ও পুত্রের উপনয়ন কার্য সম্পন্ন করিতে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল। এই বিবাহ ও উপনয়ন অনুষ্ঠান যে কেবল আনন্দোৎসব নয়, উহা যে মানবজীবনে পবিত্র আত্মনিবেদনের ব্যাপার, এই প্রতীতির গভীরতা তরুণ বালকবালিকাদের মনে তাহাদের নবজীবনের উন্মেষকালে মুদ্রিত করিয়া দিতে এর চাইতে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা কিছুই হইতে পারিত না। সর্বপ্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর ও আমোদপ্রমোদ বর্জন করা হইয়াছিল ; আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই ; এই বিশ্বাস নিয়া সকলেই আসিয়াছিল যে, আত্মীয়স্বজনের আশীর্বাদ ত তাহারা সর্বদাই পাইবে ; এবং চিন্তাশীল, স্বার্থত্যাগী, জনসেবারত একদল ব্যক্তির আশীর্বাদ তাহা হইতে তাহাদের বেশী আদরণীয় হইবে। বেলগাঁওর রামভট্টজী শাস্ত্রী এবং ওয়াইস্থিত বিখ্যাত প্রজ্ঞা-পাঠশালার লক্ষ্মণযোশী শাস্ত্রী এই দুইজন উক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন

করেন; তাঁহারা কোন পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা না করিয়াই কাজ করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানসমূহের প্রত্যেক অংশের অর্থবোধ তাঁহাদের ছিল এবং শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রাঞ্জল হিন্দীতে তরজমা করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদের উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ যাহাতে বুঝিতে পারে সেই বিষয়ে জোর দেন।

গান্ধীজী তাঁহার অভ্যস্ত নিয়মের বিরুদ্ধে শ্রোতাগণের সমক্ষে বিবাহিত দম্পতীকে কোন উপদেশ না দিয়া নিভৃতে তাঁহার বক্তব্য বলেন। কিন্তু সেগুলি সকল বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং এখানে আমি আমার সাধ্যমত তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি—মহাদেব মশাই।]

"তোমরা ইহা জানিও যে, ক্রিয়াকলাপ আমাদের অন্তরে কর্তব্যজ্ঞান যতটুকু উদ্বুদ্ধ করে ততটুকু ব্যতীত আমি এই সকলে বিশ্বাস করি না। যখন হইতে নিজে নিজে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছি তখন হইতেই আমার মানসিক চিন্তার ধারা এইরূপ। তোমরা যে সকল মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছ এবং যে সংকল্প করিয়াছ তাহা সবই সংস্কৃত ভাষায়। কিন্তু সেগুলি তোমাদের জন্য তরজমা করা হইয়াছে। মূল সংস্কৃত বলা হইয়াছে এই জন্য যে, আমি জানি সংস্কৃত শব্দগুলির এমন একটি শক্তি আছে যাহার কার্যকরী প্রভাবের অধীনে আসিতে সকলেই ভালবাসিবে।

"বিবাহক্রিয়ার সময় স্বামী একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে স্ত্রী সৎ এবং স্বাস্থ্যবান পুত্রের জননী হইবে। এই ইচ্ছাতে

আমি আশ্চর্যান্বিত হই নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে, সন্তান উৎপাদন করিতেই হইবে, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, যদি সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন বোধ হয় তবে সম্পূর্ণ ধর্মমূলক পদ্ধতিতে সম্পাদিত বিবাহ অত্যাবশ্যক। যে সন্তান কামনা করে না তাহার বিবাহ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ বিবাহই নয়। ইহা ব্যভিচারের নামান্তর। কাজেই আজিকার বিবাহ-ব্যাপারের অর্থ এই যে, যখন উভয়েই সন্তান উৎপাদনের স্পষ্ট ইচ্ছা উপলব্ধি করে কেবলমাত্র তখনই সহবাস শাস্ত্রানুমোদিত। এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ধারণাটিই পবিত্রতামূলক। কাজেই প্রার্থনাসহকারে সহবাসক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহার পূর্বে যৌনসম্বন্ধীয় উত্তেজনা ও আনন্দ উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ যে মেলামেশা করা হয়, তাহার প্রয়োজন হয় না। যদি একাধিক সন্তান কামনা না করা হয় তবে এইরূপ সহবাস সারাজীবনে মাত্র একবার হইতে পারে। যাহারা নৈতিক দিক হইতে কিংবা শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক হইতে সুস্থ নয় তাহাদের সহবাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং যদি তাহারা তাহা করে তবে তাহা ব্যভিচার মাত্র। যদি তোমরা এই শিক্ষা পূর্বে পাইয়া থাক যে বিবাহ পাশবিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য তবে সেই শিক্ষা তোমাদিগকে ভুলিতেই হইবে। ইহা কুসংস্কার মাত্র। সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ড পবিত্র অগ্নির সম্মুখে সম্পন্ন হয়। সেই অগ্নি তোমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা ভস্মীভূত করুক।

"বর্তমান সময়ে বহুপ্রচলিত আর একটি কুসংস্কার হইতে

তোমাদিগকে মুক্ত হইতে বলিব। ইহা বলা হইয়া থাকে যে, সংযম এবং বীর্যক্ষয় নিবারণ অবৈধ এবং যৌনক্ষুধার অবাধ পরিতৃপ্তি এবং অবাধ ভালবাসাই মানবের অত্যন্ত স্বাভাবিক বৃত্তি। এর চাইতে সর্বনাশকর কুসংস্কার আর নাই। তুমি আদর্শে পৌঁছাইতে অসমর্থ হইতে পার, ইন্দ্রিয়দমনে তোমার শক্তি কম থাকিতে পারে—কিন্তু সেইজন্য আদর্শ খর্ব করিও না। যখনই তোমাদের দুর্বলতা আসিবে, আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তাহা স্মরণ করিও। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের স্মৃতি তোমাদের জীবনীশক্তিকে সংহত এবং সংযত করিতে পারিবে। বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্যই সংযম এবং সংযম-যোগাগ্নিতে যৌনপ্রবৃত্তির আহুতি। যদি বিবাহের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে বিবাহ পবিত্র আত্মোৎসর্গ বলিয়া গণ্য হইবে না—তাহা হইবে সন্তান-উৎপত্তি ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্য বিবাহ।

"তোমরা বন্ধুভাবে এবং সমান মর্যাদায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছ। যদি পতিকে বল 'স্বামী' তবে স্ত্রী হইবেন 'স্বামিনী'—একে অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবে, একে অন্যের আশ্রয় হইবে; জীবনের কাজকর্ম ও কর্তব্য সম্পাদনে একে অন্যের সহিত সহযোগিতা করিবে। বালকদিগকে আমি এই বলিব যে, যদি তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর বিকশিত হইয়া থাকে এবং তোমাদের ভাবরাশি অধিকতর পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে তবে বালিকাদিগকে সেই সকল ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষক এবং পরিচালক হও; তাহাদিগকে

সাহায্য কর, তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দাও, কিন্তু কখনও তাহাদিগকে বাধা দিও না কিংবা ভুল পথ দেখাইও না। চিন্তা, বাক্য এবং কার্য তোমাদের ভিতর সম্পূর্ণ সমন্বিত হউক ; একে অন্যের নিকট হইতে কিছুই গোপন করিও না ; তোমরা আত্মায় আত্মায় এক হও।

"মিথ্যাচার পরিত্যাগ করিবে, যাহা তোমাদের পক্ষে করা অসম্ভব তাহা করিবার বৃথা চেষ্টায় নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিও না। সংযম কখনও স্বাস্থ্য নষ্ট করে না। বাহিরের বলপ্রয়োগে, বৃত্তিনিরোধে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়—সংযমে নয়। যে প্রকৃতপক্ষে আত্মসংযম শিক্ষা করিয়াছে তাহার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং মনের শান্তিও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আত্মসংযমের প্রথম ধাপই ভাবের সংযম। তোমার শক্তির সীমা আগে বুঝিতে চেষ্টা কর এবং যতটুকু পার ততটুকু কর। আমি তোমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিলাম—ইহাই প্রকৃত দৃষ্টি-ভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা কর। যদি অকৃতকার্য হও তবে দুঃখ বা লজ্জার কোন কারণ নাই। আমি শুধু তোমাদিগকে বুঝাইয়াছি—বিবাহ একটি আত্মোৎসর্গের ব্যাপার, নবজীবনলাভের সোপান ; পবিত্র উপনয়ন-সংস্কারও তেমনি একটি আত্মত্যাগ ও নবজীবনলাভের জন্য অনুষ্ঠান। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে তোমরা ভীত হইও না বা দুর্বলতা বোধ করিও না। সর্বদাই চিন্তা, বাক্য ও কার্যের সম্পূর্ণ সমন্বয় লাভ করিবার জন্য উন্মুখ থাকো। সর্বদাই তোমাদের ভাবগুলি পবিত্র করিতে চেষ্টা করিবে এবং দেখিবে সবই

কল্যাণের দিকে যাইবে। ভাব হইতে অধিক শক্তিশালী কিছুই নাই। কাজ বাক্যের অনুসরণ করে এবং বাক্য ভাবের অনুগামী হয়। এই জগৎ একটি বিরাট ভাবনার পরিণতি এবং যেখানে ভাব পবিত্র এবং মহৎ, ফলও সর্বদাই মহৎ এবং পবিত্র হইবেই। আমি ইচ্ছা করি, তোমরা একটি উচ্চ আদর্শের বর্মে আবৃত হইয়া এখান হইতে যাও এবং আমি তোমাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, কোন প্রলোভনই তোমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, কোনরূপ অপবিত্রতাও তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

"যে সকল বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেগুলি মনে রাখিও। দেখিতে সামান্য 'মধুপর্ক' ক্রিয়াটির বিষয়ই ধর। সমগ্র বিশ্ব 'মধুময়'—সুস্বাদু অমৃত বা মধুতে পরিপূর্ণ—যদি শুধু জগতের অন্যান্য জীব তাহাদের ভোগাংশ গ্রহণ করিবার পর তোমরা প্রসাদরূপে ইহা আস্বাদ করিতে চাও। ইহার অর্থ ত্যাগের সাহায্যে ভোগ।"

একটি কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি সন্তান প্রজননের ইচ্ছা না থাকে তবে কি বিবাহ হইবেই না?"

"নিশ্চয়ই না। আমি ভাবরাজ্যের (Platonic) বিবাহে বিশ্বাস করি না। অতি অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই ইহা জানা গিয়াছে যে, পুরুষ নারীকে আদৌ কোনরূপ শারীরিক সাহচর্যের জন্য বিবাহ না করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সেই সকল দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। আমি পবিত্র বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা

সমস্তই তোমরা পড়িবে। মহাভারতে যাহা পড়িয়াছি তাহা দিন দিন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহাতে লিখিত আছে, ব্যাসদেব 'নিয়োগ' ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, বরং তিনি ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার আকৃতি ছিল ভয়ঙ্কর ; তিনি প্রেমের কোন ভঙ্গী প্রদর্শন করেন নাই কিন্তু সহবাস ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে তিনি ঘৃতদ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়াছিলেন। কামের বশীভূত হইয়া তিনি এই কাজ করেন নাই, প্রজননের জন্যই করিয়াছিলেন। সন্তান কামনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছা একবার পূর্ণ হইলেই আর সহবাস হইবে না।

"মনু প্রথম সন্তানকে 'ধর্মজ' বলিয়াছেন—অর্থাৎ কর্তব্য-জ্ঞান হইতে জাত এবং তৎপরবর্তী সন্তানগণকে 'কামজ' বলিয়াছেন—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে জাত। এক কথায় সংক্ষেপে ইহাই যৌনসম্বন্ধীয় বিধি ব্যক্ত করিতেছে। ভগবান কি তাঁহার বিধানের অতিরিক্ত অন্য কিছু? ভগবানকে মানিয়া চলার অর্থ তাঁহার বিধান ও নিয়ম অনুষ্ঠান করা। স্মরণ রাখিও, তোমাদিগকে তিন বার উচ্চারণ করিতে হইয়াছে, 'আমি কোন-প্রকারেই বিধি লঙ্ঘন করিব না।' বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিতে প্রস্তুত এরূপ মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যদি আমরা পাই তবে আমরা বলবান এবং প্রকৃত স্ত্রী পুরুষের দ্বারা গঠিত একটি জাতিই পাইব।

"ইহা স্মরণ রাখিও যে, আমার স্ত্রী 'বা'র প্রতি ইন্দ্রিয়

পরিতৃপ্তির দিক হইতে দৃষ্টি থামাইবার পর আমি প্রকৃতপক্ষে আমার বিবাহিত জীবন উপভোগ করিতে আরম্ভ করি। আমি পূর্ণযৌবনে এবং স্বাস্থ্যের পূর্ণাবস্থায় ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি ; সাধারণতঃ বিবাহিত জীবন বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা উপভোগ করিবার পক্ষে আমার বয়স তখন উপযুক্ত ছিল। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আমি দেখিতে পাইলাম যে, কোন পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই আমার জন্ম হইয়াছে—আমাদের সকলের জন্মই তদ্রূপ। যখন আমার বিবাহ হয় তখন আমার এই জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু যখন আমার জ্ঞানের উন্মেষ হইল তখন অনুভব করিলাম, যে কাজের জন্য আমি জন্মলাভ করিয়াছি বিবাহ সেই কাজের সহায়তা করিতেছে কিনা ইহা অবশ্যই আমাকে দেখিতে হইবে। সেই সময়েই প্রকৃত ধর্ম কি তাহা আমি বুঝিতে পারি। এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পরই আমাদের জীবনে প্রকৃত সুখ আসিয়াছিল। 'বা' যদিও দেখিতে কৃশ, তাঁহার শরীরের বাঁধ চমৎকার এবং তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করেন। যদি তিনি আমার কামনার সামগ্রীই থাকিয়া যাইতেন তবে তিনি কখনই এরূপ করিতে পারিতেন না।

"অবশেষে, বিলম্বে হইলেও আমি সচেতন হইয়াছিলাম ; এই অর্থে আমি কয়েক বৎসর মাত্র প্রকৃত বিবাহিত জীবন যাপন করিতে পারিয়াছি। উপযুক্ত সময়ে সচেতন হইবার সৌভাগ্য তোমাদের হইয়াছে। আমার বিবাহের সময় ঘটনাবলী যতদূর সম্ভব প্রতিকূল ছিল। তোমাদের পক্ষে সেগুলি যতদূর সম্ভব অনুকূল। তথাপি আমার একটি জিনিস ছিল এবং

তাহাই আমাকে চালাইয়া নিয়াছে। ইহা সত্যের বর্মাচ্ছাদন। উহাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে এবং বাঁচাইয়াছে। আমার জীবনের মূল ভিত্তিই সত্য। সত্য হইতে ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা পরে উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই তোমরা যাহা কর, নিজেরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, জগৎকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের মনের ভাব কখনও গোপন করিও না। যদি সেগুলি প্রকাশ করা লজ্জাজনক মনে হয়, তবে সেগুলি চিন্তা করা আরো লজ্জাজনক।"

[হরিজন, ১৪-৪-'৪৬]

৩২

পতি ও পত্নী

প্রশ্ন॥ স্বামী বন্ধুস্থানীয়ই হউন বা প্রেমের প্রতিমূর্তিই হউন, হিন্দুধর্মমতে স্বামীর প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ এবং তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিলয় স্ত্রীজাতির সর্বোচ্চ আদর্শ। পত্নীর জীবনযাপনের প্রকৃত নীতি যদি এই হয় তবে স্বামীর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন কিনা ?

উত্তর॥ আমার আদর্শ পত্নী—সীতা, এবং আদর্শ পতি—রাম ; কিন্তু সীতা রামের ক্রীতদাসী ছিলেন না। অথবা একে অন্যের ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী ছিলেন। রাম সর্বদাই সীতার

সব বিষয় মনোযোগ দিয়া বিবেচনা করিতেন। প্রকৃত ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে উক্ত প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আজকালকার হিন্দুপরিবার একটি অদ্ভুত সমস্যাবিশেষে পরিণত হইয়াছে। যখন বিবাহ হয় তখন স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। লোকাচারের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ধর্মের অনুশাসন এবং বিবাহিত ব্যক্তিগণের শান্ত জীবনপ্রবাহ বিপুল হিন্দুপরিবারের শান্তি রক্ষা করিতেছে। কিন্তু স্বামী কিংবা স্ত্রী যখনই কোন সাধারণ মত হইতে ভিন্ন মতাবলী পোষণ করেন তখনই বিরোধের আশঙ্কা হয়। স্বামীর বেলায় তাঁহার বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। তিনি মনে করেন তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর ইচ্ছা ও অভিমত কি তাহা আলোচনা করিতে তিনি বাধ্য নহেন। পত্নীকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির সামিল মনে করেন এবং নিরুপায় পত্নীও স্বামীর দাবী আছে এই বিশ্বাস করিয়া নিজেকে চাপিয়া যান। আমার মনে হয়, ইহার একটা সমাধান আছে। মীরাবাঈ সেই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন পত্নী নিজে জানেন যে তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই ঠিক, এবং যখন কোন মহত্তর উদ্দেশ্যে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেন, তখন তাঁহার নিজ মতানুযায়ী চলিবার এবং বিনয় ও সাহসের সহিত তাঁহার নিজ কার্যের পরিণামের সম্মুখীন হইবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে।

প্রশ্ন॥ ধরুন, স্বামী যদি মাংসাশী হন এবং স্ত্রী মাংসভোজন অনিষ্টকর মনে করেন, স্ত্রী কি তাঁহার মানসিক বৃত্তি অনুযায়ী চলিতে পারেন? তিনি কি সর্বপ্রকার অনুনয় বিনয়ে স্বামীকে

মাংসভোজন বা অনুরূপ কার্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টাও করিতে পারেন না? অথবা তিনি কি স্বামীর জন্য মাংস রন্ধন করিতে বাধ্য, অথবা ততোধিক মন্দ বিষয়—স্বামী যদি তাঁহাকে মাংস খাওয়াইতে চান তবে কি তিনি তাহা খাইতে বাধ্য? যদি বলেন স্ত্রী তাঁহার নিজপথে চলিতে পারেন, তবে যেখানে একজন বাধ্য করিতে চায় এবং অপরজন তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে উদ্যত হয়, সেখানে যুক্তপরিবারের কাজকর্ম কি করিয়া চলিতে পারে?

উত্তর॥ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্নের কতকটা জবাব দেওয়া হইয়াছে। স্বামীর দুষ্কৃতের সহযোগী হইতে স্ত্রী বাধ্য নন। এবং যখন তিনি মনে করেন যে কোন বিষয় মন্দ, তখন ভাল কাজটি করিবার সাহস তাঁহার থাকা চাই। যদি এমন হয় যে পূর্বে স্বামী স্ত্রী উভয়েই মাংসাশী ছিলেন তবে তিনি পরিবারের লোকদের জন্য মাংস রন্ধন করিতে বাধ্য। কারণ আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রীর কর্তব্য গৃহকর্ম সুচারুভাবে পরিচালনা করা—রন্ধনও তাঁহার অন্যতম কাজ; আর স্বামীর কর্তব্য পরিবারের জন্য উপার্জন করা। পক্ষান্তরে, যদি কোন নিরামিষভোজী পরিবারে স্বামী মাংসাশী হন এবং স্ত্রীকে মাংস রন্ধন করিতে বাধ্য করিতে চান, স্ত্রী তাঁহার সদ্‌বিবেচনার বিরুদ্ধজনক কিছুই রন্ধন করিতে বাধ্য নহেন। পারিবারিক শান্তি সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। কিন্তু ইহাই কেবল মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমার মতে বিবাহিত অবস্থা অন্য যে কোন অবস্থার ন্যায় নিয়মানুবর্তিতার অবস্থা। কর্তব্যের

সমষ্টি নিয়াই মানবজীবন; উহা আবার শিক্ষার ক্ষেত্র। এই জীবনে এবং তৎপরেও পরস্পরের মঙ্গলবিধান করাই বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য। মানবজাতির সেবাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। যখন একজন সঙ্গী নিয়মের শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে তখন বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার অপরের উপর বর্তিয়া থাকে। নৈতিক বন্ধনই ছিন্ন হয়—শারীরিক বন্ধন নয়। ইহাতে দাম্পত্যবন্ধনের ছেদ বুঝায় না। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই স্বামী কিংবা স্ত্রী পৃথক্ হইয়া পড়েন। হিন্দূধর্ম প্রত্যেককে প্রত্যেকের সম্পূর্ণরূপে সমান বলিয়া গণ্য করেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে অন্যরূপ প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোন সময় হইতে তাহা কেহ জানে না। সেইরূপ অন্যান্য বহু মন্দ বিষয়ও হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আমি ইহা জানি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, তিনি স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন, নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য তিনি যাহা করা ভাল মনে করেন তাহা করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এই আত্মোপলব্ধির জন্যই স্ত্রী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১০-'২৬]

৩৩

হিন্দু পরিবারের স্ত্রী

জনৈক ভ্রাতা তাঁহার বিবাহিতা ভগ্নীর দুর্দশা বর্ণনা করিয়া যে দীর্ঘ পত্র দিয়াছেন নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল—

"কিছুকাল পূর্বে এক ব্যক্তির সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ হয় : স্বামীর চরিত্র আমাদের নিকট হইতে গোপন করা হইয়াছিল। এখন প্রকাশ পাইয়াছে যে, লোকটি লম্পট এবং অতিমাত্র ব্যভিচার এবং লাম্পট্যও তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। আমার দুর্ভাগ্যশীলা ভগ্নী বিবাহের অল্প পরেই দেখিতে পাইল যে তাহার 'প্রভু' দিন দিন ক্রমশঃ গভীরভাবে অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। সে বাদানুবাদ করিল। লোকটি তাহা সহ্য করিতে পারিল না এবং 'তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য' তাহার সম্মুখেই তাহার লাম্পট্যের প্রশ্রয় দিতে লাগিল। সে তাহাকে চাবুকও মারিত, দাঁড় করাইয়া রাখিত এবং অনাহারেও রাখিত, ইত্যাদি। তাহার লাম্পট্য দেখিবার জন্য তাহাকে একটি থামে বাঁধিয়া রাখিত। আমার ভগ্নীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার বিলাপে আমরাও নিজেদের নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত বোধ করিতেছি। আমরা নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছি। আমাদিগকে এবং তাহাকে কি করিতে উপদেশ দেন? হিন্দুধর্মের অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়ের মধ্যে ইহা একটি যে, নারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহার বিশেষ কোন স্বত্ব বা স্বাধিকার নাই। যদি কোন পুরুষ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হইতে চায় তবে উপায়হীনা নারীর প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না। পুরুষ যার তার সঙ্গে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং তাহার বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র আঙ্গুলও কেহ উঠাইতে পারে না। কিন্তু নারীর বিবাহ হওয়ামাত্র তাহাকে

কেবল 'প্রভুর' কৃপার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এইরূপ হাজার হাজার নারী ক্রন্দন করিতেছে এবং যাতনায় আর্তনাদ করিতেছে। যতদিন হিন্দুধর্ম হইতে এই সকল অত্যাচার এবং তদনুরূপ ব্যভিচার-গুলি দূরীভূত না হইবে ততদিন সমাজের কোন উন্নতির আশা আছে কি?"

—লেখক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার ভগ্নীর দুর্দশার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাঁহার নিজের বর্ণনা তাহা হইতে অধিক মর্মস্পর্শী। লেখক আমাকে তাঁহার নাম ও ঠিকানা পূর্ণভাবেই দিয়াছেন। একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত হইতে তিনি হিন্দুধর্মের যে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন তাহা আহত মনস্তাপপ্রসূত বলিয়া যদিও ক্ষমার যোগ্য, উৎকট ভাবপ্রবণ সাধারণ সিদ্ধান্তের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। কারণ লক্ষ লক্ষ হিন্দু স্ত্রী নিরাবিল শান্তিতে বাস করেন, এবং তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের উপর যে প্রভুত্ব করেন তাহা যে কোন নারীর পক্ষে স্পৃহণীয়। ভালবাসা হইতে এই ক্ষমতার উদ্ভব হয়। লেখক নির্মম অত্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হিন্দুধর্মের মন্দ বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত নহে; পরন্তু তাহা সকল দেশে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের ভিতর মানবপ্রকৃতির যে কুৎসিত চিত্র, তাহাই প্রকটিত করিয়াছে। উক্ত ঘটনা তাহারই একটি উদাহরণ। নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অসমর্থ বা সময় সময় তাহা করিতেও অনিচ্ছুক, নমনীয়স্বভাবা স্ত্রীর পক্ষে পশুপ্রকৃতির স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ-সুবিধা কোন সুফল প্রদান করে নাই।

কাজেই সংস্কারের অনুকূলে এবং সংস্কারকদের পক্ষে উৎকট ভাবপ্রবণতা এবং অত্যুক্তি পরিহার করা কর্তব্য।

তথাপি এই প্রবন্ধে যে ঘটনাটির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে তাহা হিন্দুসমাজে মোটেই অসাধারণ ঘটনা নহে। হিন্দুদের কৃষ্টি স্ত্রীকে স্বামীর অত্যধিক অধীন করিয়া ভ্রম করিয়াছে এবং স্ত্রীকে স্বামীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ করিতে বিশেষ জোর দিয়াছে। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, স্বামী সময় সময় এত অধিক ক্ষমতা জোর করিয়া প্রয়োগ করেন এবং প্রভুত্ব খাটান যে তিনি পশুর শ্রেণীতে গিয়া পড়েন। এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার আইন দ্বারা হয় না। কিন্তু কুমারীদিগের শিক্ষার কথা না ধরিয়া, বিবাহিতা নারীদের প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা এবং স্বামিগণের অমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের দ্বারা ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। যে ঘটনার আলোচনা এখানে হইতেছে তাহার প্রতিকার অতিমাত্রায় সরল। ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নিজদিগকে অসহায় মনে না করিয়া এবং দুঃখপ্রপীড়িতা মেয়েটির সহিত ক্রন্দন না করিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দিবেন যেন সে বিশ্বাস করিতে পারে যে পাপমগ্ন স্বামীকে তুষ্ট করা বা তাহার সাহচর্য কামনা করা তাহার কর্তব্যমধ্যে নয়। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাহার প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয় না। কাজেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন না করিয়াও সে স্বামীর গৃহ হইতে দূরে বাস করিতে পারে এবং মনে করিতে পারে যেন আদৌ তাহার বিবাহ হয় নাই। অবশ্য যদিও হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে

বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর নয়, আইনের দিক হইতে তাহার সম্মুখে দুইটি উপায় উন্মুক্ত আছে—তাহার স্বামীকে সাধারণ মারামারির জন্য শাস্তি দেওয়ান এবং তাহাকে খোরপোষের জন্য বাধ্য করা। অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা যায় যে, সর্বক্ষেত্রে না হইলেও অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীর প্রতিকার দ্বারা ফল ভাল না হইয়া আরও মন্দ হয় এবং তদ্দ্বারা কোন সাধ্বী স্ত্রীর মনে শান্তি আসিতে পারে না এবং স্বামীকে সংশোধন করার প্রশ্ন আরও জটিল, এমনকি, অসম্ভব হইয়া পড়ে ; অথচ এই সংশোধনের কাজই সমাজের, বিশেষতঃ প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকতর ভাবে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বর্তমান ক্ষেত্রে বালিকার পিতামাতা তাহাকে ভরণপোষণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভবপর নয়, এইরূপ নির্যাতিতা রমণীগণকে আশ্রয় দিবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাকে সেখানে পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু তাহা হইলেও একটি প্রশ্নের উত্তর বাকী থাকে ; —যে সকল তরুণী এইভাবে অনাদৃত হইয়া স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করে অথবা প্রকৃতপক্ষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয় এবং যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ দ্বারাও প্রতিকার সম্ভবপর নয়, তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা মিটাইবার প্রশ্ন। কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা প্রকৃতপক্ষে গুরুতর অভিযোগ নয়, কারণ যে সমাজে লোকাচারমূলে যুগযুগান্তর হইতে বিবাহবিচ্ছেদ অপ্রচলিত, সেখানে যে নারীর বিবাহ দুঃখময় হইয়া উঠে সে পুনরায় বিবাহ করিতেই ইচ্ছা করে না। যখন কোন সামাজিক পরিবেশে

জনমত এইরূপ বিশেষ প্রতিকার আবশ্যক মনে করে তখন আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে এইরূপ প্রতিকার অনুমোদিত হইবে। আমি লেখকের চিঠি যতদূর বুঝিয়াছি, উক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার আসঙ্গলিপ্সা মিটাইতে পারে না এই অভিযোগ নাই। স্বামীর অতি কদর্য এবং উদ্ধত অসচ্চরিত্রতা সম্বন্ধেই অভিযোগ। ইহার জন্য পূর্বেই বলিয়াছি যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনেই প্রতিকার নিহিত। আমাদের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের ন্যায় এই অসহায় ভাব কাল্পনিক। অসম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত দুঃখ দূর করিতে হইলে একটু নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, একটু নূতন রকমের চিন্তাধারা যথেষ্ট। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে এইরূপ ক্ষেত্রে অত্যাচারের বেষ্টনী হইতে নির্যাতিতাকে সরাইয়া নেওয়ার পরোক্ষ প্রভাবে সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। তাহাকে জনসাধারণের সেবার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করিবার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা দিতে পারিলে স্বামীর শয্যালাভরূপ সংশয়াত্মক সুখের পরিবর্তে বহুগুণ অধিক সৌভাগ্য তাহার দুঃখের ক্ষতিপূরণ করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১০-'২৯]

৩৪

তরুণ-তরুণীর দুর্গতি

একটি যুবক লিখিতেছে—

"আমার বয়স পনর। আমার স্ত্রীর বয়স সতর। আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমি সর্বদাই এই বিসদৃশ সম্বন্ধের বিরোধী ছিলাম;

কিন্তু আমার পিতা এবং খুড়া আমার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া রুষ্ট হইলেন এবং আমাকে ভর্ৎসনা ও নানা গালিগালাজ করিলেন এবং বালিকার পিতা শুধু ধনী সন্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইবার লোভে পড়িয়া তাঁহার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিলেন, যদিও আমি ছিলাম অপরিণতবয়স্ক এবং কন্যা হইতে বয়সে ছোট। ইহা কিরূপ বোকামির কাজ! আমার পিতা এই অসমঞ্জস বিবাহ আমাকে জোর করিয়া না করাইয়া এবং আমাকে এরূপ একটি সঙ্কটে না ফেলিয়া কি আমাকে আমার নিজের মতানুযায়ী চলিতে দিতে পারিতেন না? আমি যদি সেই সময় বিষয়টির সব দিক্ বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হইতাম না। কিন্তু সেই অধ্যায় ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাকে আপনি কি করিতে উপদেশ দেন?"

—লেখক তাহার পুরা নাম ও ঠিকানা আমাকে দিয়াছে কিন্তু পাছে উত্তর তাহার নিকট পৌঁছিতে না দেওয়া হয় এই ভয়ে 'নবজীবন' পত্রিকার যোগে যেন আমি উত্তর দেই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থা শোচনীয়। এই যুবকের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, যদি তাহার সাহস থাকে তবে এই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত। কারণ তাহাদের বিবাহ-কালে "সপ্তপদী" অনুষ্ঠানের সময় তাহাদিগকে যে সকল প্রতিজ্ঞা করান হইয়াছিল এই যুবক বা এই বালিকার তৎসম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। বিবাহের পর তাহারা কখনও একত্রে বাস করে নাই। কাজেই এই যুবকের পক্ষে অত্যন্ত সাহসের সহিত চলিতে হইবে এবং তথাকথিত বিবাহ প্রত্যাখ্যান করিবার পরিণামস্বরূপ তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনারও সম্মুখীন হইতে হইবে।

এবং যদি আমার এই মত তাহাদের নিজ নিজ পিতামাতার কানে পৌঁছায় তবে তাঁহাদিগকে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ করিব যেন তাঁহারা তাঁহাদের নির্দোষ সন্তানগণের প্রতি দয়াপরবশ হন এবং জোর করিয়া তাহাদের উপর একটি নির্মম ভয়াবহ ভার চাপাইয়া না দেন। পনের বৎসরের একটি বালক কিশোর মাত্র। সে হয় বিদ্যালয়ে গিয়া পড়াশুনা করিবে, নয় কারখানায় কাজ শিখিবে ; কিন্তু গৃহস্থের কর্তব্যসমূহ তাহার উপর চাপান চলে না। আমি আশা করি এই দম্পতীর পিতামাতা তাঁহাদের কর্তব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইবেন। যদি তাঁহারা সেরূপ না হন, তাহা হইলে বিনম্রভাবে তাহাদের অভিভাবকগণের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করা এবং যুক্তি ও বিবেকের আলোতে চলা এই বালক এবং এই বালিকার সুস্পষ্ট কর্তব্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১-'২৯]

৩৫

পারিবারিক গোলমাল

১

প্রশ্ন ॥ আমি তেইশ বৎসরের যুবক। গত দুই বৎসর যাবৎ আমি বিশুদ্ধ খদ্দর ব্যবহার করিতেছি। গত ২৮ দিন যাবৎ আমার অবসর সময়ে আমি নিয়মিতরূপে সূতা কাটিতেছি। কিন্তু আমার স্ত্রী খদ্দর পরিধান করিতে চায় না। সে বলে খদ্দর অত্যন্ত মোটা। আমি কি তাহাকে খদ্দর পরিতে বাধ্য করিব ?

আমি ইহাও বলিতে পারি যে আমাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ; কোন মতে মিলে না।

উত্তর॥ ভারতের লোকের ইহাই সাধারণ নিয়তি। আমি অনেকবার বলিয়াছি যে স্বামী অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার স্ত্রীর শিক্ষকরূপে কাজ করিবে এবং তাহার কোন অসম্পূর্ণতা থাকিলে সহ্য করিয়া যাইবে। তোমার পক্ষে এই অসামঞ্জস্য সহিয়া যাইতে হইবে এবং ভালবাসা দ্বারা তাহাকে জয় করিতে হইবে—জোর করিয়া কখনই নয়। ইহা হইতে বুঝিবে যে তোমার স্ত্রীকে খদ্দর পরিধান করিতে তুমি বাধ্য করিতে পার না। কিন্তু তুমি তোমার ভালবাসা এবং দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিবে যেন তোমার স্ত্রী তদ্দৃষ্টে ঠিক পথে চলিতে পারে। মনে রাখিও, তুমিও যেমন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি নও, তোমার স্ত্রীও তোমার সম্পত্তি নয়। সে তোমার শ্রেষ্ঠ অর্ধাঙ্গিনী এবং তাহার সহিত সেইরূপ আচরণ করিবে। এইভাবে পরীক্ষা করিয়া চলিলে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না।

২

প্রশ্ন॥ আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী ভালমানুষ। আমাদের সন্তান-সন্ততি আছে। এযাবৎ আমরা শান্তিতে বাস করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, তিনি এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে গুরুমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবন এখন আমার নিকট অজ্ঞাত।

ইহা আমাদের ভিতর উদাসীনতার সৃষ্টি করিয়াছে। আমি কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। তুলসীদাসের বর্ণিত রাম আমার আদর্শ পুরুষ। রাম যাহা করিয়াছিলেন আমি তাহা করিব? না, আমার স্ত্রীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিব?

উত্তর॥ তুলসীদাস আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমরা বিচার না করিয়া যেন মহাত্মাদের অনুসরণ না করি। মহাপুরুষগণ যাহা নিঃশঙ্কচিত্তে করিতে পারেন আমরা তাহা পারি না। সীতার জন্য রামের ভালবাসার কথা ভাব। তুলসীদাস আমাদিগকে বলেন যে, স্বর্ণমৃগের আগমনের পূর্বেই রামের আদেশে প্রকৃত সীতা মেঘের ভিতর লুকায়িত হন এবং শুধু ছায়াটি থাকিয়া যায়। এই ঘটনা এমনকি, লক্ষ্মণের নিকটও গূঢ়ভাবে গোপন ছিল। কবি আমাদিগকে আরো বলিয়াছেন যে, রামের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা দেবগণের উপযুক্ত। এই ছায়া সীতার সহিত রাম স্বর্ণমৃগের ঐ স্থানে আগমনের পর হইতে বাস করিতেন। এই অবস্থাতেও সীতা রামের কৃত একটি কার্যের জন্যও রুষ্ট হন নাই। তোমার ক্ষেত্রেও যেমন এই সকল উপাদানের অভাব বিদ্যমান, পার্থিব যে কোন বিষয়ে এই সকল উপাদানের অভাব লক্ষিত হইবে। কাজেই তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, স্ত্রীর এই বিষয় তুমি সহ্য করিয়া যাও এবং যে পর্যন্ত তাঁহার আচরণের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগের কোন কারণ উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত তাঁহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিও না। যদি তুমি কাহাকেও গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই

গুহ্য বিষয় তোমার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ না করিতে এবং উহা প্রকাশ না করাতে যদি তিনি রাগ করিতেন তবে তুমি তাহা পছন্দ করিতে না—ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারি। আমি স্বীকার করি স্বামী স্ত্রীর ভিতর কোন বিষয়ই গোপন থাকা উচিত নয়। বিবাহবন্ধন বিষয়ে আমার ধারণা খুব উচ্চ। আমার ধারণা স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। তাহারা দুই হইয়াও এক অথবা একের ভিতরে দুই। কিন্তু এই সকল বিষয় ধরাবাঁধা নিয়মে পরিচালিত করা যায় না। কাজেই সব দিক বিবেচনা করিয়া এবং যেহেতু তুমি উদারচেতা স্বামী, তোমার স্ত্রী তাঁহার গুহ্য বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার মর্যাদা রক্ষা করিতে তোমার কোন অসুবিধা হইবার কারণ নাই।

[হরিজন, ৯-৩-'৪০]

৩

প্রশ্ন ॥ আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকল রকমে ও উপায়ে অস্পৃশ্যতা বর্জন করেন নাই তিনি সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে পারেন না। মনে করুন, কোন কংগ্রেসকর্মীর স্ত্রী তাঁহার মত অনুমোদন করেন না এবং তাঁহার বাড়ীতে হরিজনদিগকে আনিতে দেন না—তখন তিনি কি করিবেন? তাঁহার নিজমতে স্ত্রীকে জোর করিয়া আনিবেন অথবা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন অথবা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিত্যাগ করিবেন?

উত্তর ॥ তোমার স্ত্রীকে বাধ্য করিয়া মতে আনার বিষয় ইহা নয়। তুমি তাঁহাকে তাঁহার মতানুযায়ী চলিতে দাও এবং তুমি তোমার পথে চলিতে থাক। এর অর্থ এই হইবে যে, তিনি পৃথক্ রান্নাঘর পাইবেন এবং যদি তিনি ইচ্ছা করেন একটি পৃথক্ ঘরও পাইতে পারেন। কাজেই আন্দোলন পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

[হরিজন, ১৩-৪-'৪০]

৩৬

অদ্ভুত প্রকৃতির পিতা

একটি যুবক আমাকে একটি চিঠি দিয়াছে, তাহার সারাংশ মাত্র এখানে দেওয়া গেল—

"আমি বিবাহিত। আমি বিদেশে গিয়াছিলাম। আমার একটি বন্ধু ছিল। সে আমার ও আমার পিতামাতার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসভাজন ছিল। আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার স্ত্রীকে ভুলাইয়া নেয় এবং তৎকর্তৃক তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। আমার পিতা জোর করিয়া বলিতেছেন যে মেয়েটির গর্ভপাত করাইতে হইবে ; অন্যথায়, তিনি বলেন, তাঁহার পরিবার নিন্দনীয় হইবে। আমার মনে হয় সেরূপ করা অন্যায় হইবে। উপায়হীন স্ত্রীলোকটি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক এই ক্ষেত্রে আমার কি করা কর্তব্য বলিয়া দিবেন ?"

—অত্যন্ত দ্বিধার সহিত আমি এই পত্র প্রকাশিত করিলাম ;

যেহেতু প্রত্যেকেই জানে যে সমাজে এইরূপ ঘটনাসকল মোটেই বিরল নহে। সেইজন্য এই প্রশ্নের প্রকাশ্য সংযত আলোচনা আমার নিকট অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না।

দিবালোকের ন্যায় ইহা আমার নিকট স্পষ্ট যে গর্ভপাত করা অপরাধ। এই নিরুপায় স্ত্রীলোকটির ন্যায় অসংখ্য পতি অনুরূপ অপরাধে অপরাধী, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। সমাজ যে শুধু তাহাদিগকে ক্ষমা করে তাহা নয়, তাহাদিগকে নিন্দা পর্যন্তও করে না। আরো লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রীলোক তাহাদিগের পাপ গোপন করিতে পারে না, কিন্তু পূরুষ কৃতকার্যতার সহিত তাহার পাপ গোপন করিতে পারে।

আলোচিতা স্ত্রীলোকটি কৃপার পাত্রী। স্বামীর কর্তব্য হইবে সাধ্যমত স্নেহ ও কোমলতা দ্বারা এই শিশুটিকে লালন-পালন করা এবং তাহার পিতার উপদেশ মানিয়া চলিতে অস্বীকার করা। তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সে বাস করিতে থাকিবে কিনা ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। ঘটনাবলী দ্বারা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। সেক্ষেত্রে তাহার ভরণপোষণ যোগাইতে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে এবং পবিত্র জীবন-যাপনে সহায়তা করিতে সে বাধ্য হইবে। তাহার অনুতাপ আন্তরিক এবং প্রকৃত হইলে স্বামীর পক্ষে তাহা স্বীকার করিয়া নিতে আমি কিছুই অন্যায় দেখি না। এমনকি, আমি ইহার উপর আরো একটি অবস্থা কল্পনা করিতে পারি, যখন স্বামীর পক্ষে বিপথগামিনী পত্নীকে পুনরায় গ্রহণ করা তাহার পবিত্র

কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইবে, যদি স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজকে পাপমুক্ত রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১-'২৯]

৩৭

ঘৃণিত এবং অসঙ্গত বৈষম্য

জনৈক লেখক লিখিতেছেন—

"বর্তমান কচ্ছ দেশে আমাদের মধ্যে অন্য বিষয়ে সম্ভ্রান্ত কতিপয় ভদ্রলোক আছেন যাঁহারা সৎ, দানশীল, উদারচেতা এবং অত্যন্ত ধর্ম-ভাবাপন্ন। কিন্তু শুধু পুত্রসন্তান লাভের জন্য তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ করিতে কোন দ্বিধাবোধ নাই। হিন্দুদের মধ্যে কন্যার জন্ম হইলে তজ্জন্য খেদ করার যে অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে তাহা আপনি অনুমোদন করেন কিনা তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতে আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি। গোঁড়াদের সঙ্গে আপনিও কি এই মত পোষণ করেন যে পুত্র না হইলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না?

"এক ব্যক্তি তাঁহার দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার তিনটি পত্নী। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্রসন্তান নাই। বর্তমানে তিনি চতুর্থ বার বিবাহ করিয়াছেন। কয়েকমাস পূর্বে তিনি একটি যজ্ঞ করিয়াছেন এবং তখন প্রতিদিন পাঁচশত ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে। এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।"

—দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুসমাজে পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা

প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্তমানে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের যুগ। এই সময়ে স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারে এই অন্যায় বৈষম্য যুগোপযোগী নহে। পুত্র জন্মিলে আহ্লাদ এবং কন্যা জন্মিলে খেদ করার কোন কারণ আমি দেখি না। উভয়েই ভগবানের দান। তাহাদের বাঁচিবার সমান অধিকার রহিয়াছে এবং পৃথিবীকে চালু রাখিতে হইলে উভয়েরই সমানভাবে প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ পুরাতন এবং সমাজে গভীরভাবে অন্তর্নিবিষ্ট প্রথার মূলোচ্ছেদও সহজে করা যায় না। সামাজিক বিষয়ে জনগণের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিয়া এবং নারীগণের প্রকৃত পদবী ও মর্যাদা যথাযথরূপে স্বীকার করিয়াই এইগুলিকে দূর করা সম্ভব। বর্তকান কালে পুত্রসন্তান না হইলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই সমানভাবে স্বামীর পুনরায় বিবাহে রাজী হইতে দেখা যায়। আমার লেখকের স্থানীয় সমাজ-সংস্কারকগণকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হইবে এবং এই সকল দুর্দশাপূর্ণ ঘটনাতে তাঁহাদের রুষ্ট কিংবা ভগ্নহৃদয় হইলে চলিবে না। যে বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে চান তাহার সত্যতা এবং যৌক্তিকতায় বিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং তাঁহারা এই আশায় কাজ করিয়া যাইতে থাকিবেন যে, সমাজ একদিন না একদিন পুত্র ও কন্যা সন্তানগণের ভিতর অর্থহীন ও অন্যায় প্রভেদমূলক বিভাগের কুফল উপলব্ধি করিতে পারিবে।

[হরিজন, ১৮-৫-'৩৮]

৩৮

বর্বরতার শেষ চিহ্ন

বেদনাবহুল অভিজ্ঞতা হইতে আমরা প্রতিদিন ভারতবর্ষে যাহা ঘটিতেছে তাহা জানি; দেখা যায়, এরূপ বহু স্বামী আছেন যাঁহারা তাঁহাদের পত্নীগণকে তাঁহাদের গৃহপালিত পশু বা গৃহসজ্জার সম্পত্তিরূপে গণ্য করেন এবং সেইজন্য মনে করেন যে তাঁহাদের গরুভেড়ার ন্যায় তাঁহাদের পত্নীগণকেও মারপিট করিবার অধিকার তাঁহাদের রহিয়াছে। কিন্তু এই পাশবিক অভ্যাসও যে আদালতের বিচারে সমর্থিত হইতে পারে তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; কিন্তু আমার একটি বন্ধু একটি সংবাদপত্রের কিয়দংশ কাটিয়া আমার হাতে দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে, মাত্বরার জনৈক দায়রা জজ এইরূপ বিচার করিয়াছেন যে স্ত্রীকে মারপিট করিবার আইনগত অধিকার স্বামীর আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, একজন ইংরেজ বিচারক ফৌজদারী মোকদ্দমার তালিকাদৃষ্টে মাত্বরার দায়রা জজের এই অদ্ভুত রায় ধরিয়া ফেলেন এবং কারণ দর্শাইবার জন্য স্বামীর উপর নোটিশ জারী করেন। যথাসময়ে মামলাটি হাইকোর্টের বিচারপতি পাণ্ডুরাং রাও এবং কে. এস. মেনন এই ত্বইজনের সম্মুখে শুনানী হয়। তাঁহাদের রায় নিম্নে উদ্ধৃত করিতে আমার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই—

"দায়রার জজ আসামীকে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য প্রথম দফা অভিযোগ হইতে খালাস দিয়াছিলেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই

খালাসের হুকুমের বিরুদ্ধে কোন আপীল করেন নাই। এই দফার অভিযোগের সম্বন্ধে একমাত্র আলোচনার বিষয় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য যে, দায়রার জজ একাধিক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন যে ঔদ্ধত্য বা বেয়াদবীর জন্য স্ত্রীকে মারিবার অধিকার স্বামীর আছে,— তাঁহার এই মতের উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। স্ত্রীকে মারিবার অধিকার স্বামীর আছে এই অভিমতের দ্বারা দায়রার জজ এতটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে চার্জসীটে স্ত্রীকে মারিবার অভিযোগ ভুক্ত করাতে তিনি পুলিশের সমালোচনাও করিয়াছেন, এমনকি, দায়রার বিচারের জন্য প্রেরিত অভিযোগের মধ্যে ইহা দফাভুক্ত করার জন্য সাব-ম্যাজিস্ট্রেটেরও সমালোচনা করিয়াছেন।

"ইহা বলিলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইবে যে, যদিও ব্যক্তিগত হিসাবে দায়রার জজের এ বিষয়ে তাঁহার নিজমত পোষণ করিবার অধিকার থাকিতে পারে, তথাপি বিচারাসনে বসিয়া এইভাবে আইন জাহির করিবার তাঁহার পক্ষে কোন যুক্তি নাই যে, ঔদ্ধত্য বা বেয়াদবীর জন্য স্ত্রীকে প্রহার করিয়া শাস্তি দিবার অধিকার স্বামীর আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে এরূপ কোন অধিকারের কথা স্বীকৃত হয় নাই। এবং 'সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বিষয়ক' অধ্যায়েও 'স্ত্রীকে প্রহার করা'র অধিকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

"এই আদালত (হাইকোর্ট) যদি দায়রার জজের এই বিচারকে ভ্রমাত্মক এবং ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা না করেন তবে বিচারাসন হইতে তাঁহার এই প্রকার সিদ্ধান্তের যে কী ভীষণ ফল হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এইজন্যই আমরা কোন ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ না রাখিয়া পরিষ্কারভাবে ইহা বলা আবশ্যক বোধ করিয়াছি যে, এই বিষয়ে দায়রার জজ স্বামিগণের অধিকার সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন তাহার কোন

ভিত্তি নাই এবং ভবিষ্যতে যেন কেহ স্ত্রীকে প্রহার করিবার অজুহাত বা যৌক্তিকতার জন্য উহার উপর নির্ভর না করে।"

লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, শিক্ষিত স্বামীরাও স্ত্রীদিগকে অস্থাবর সম্পত্তিমধ্যে গণ্য করিবার এবং যখন খুশী তাহাদিগকে প্রহার করিবার অধিকার তাহাদের আছে এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত নন। আমরা আশা করি যে, এই রায় তাহাদিগকে দেখাইয়া দিবে যে স্ত্রীদের প্রতি এরূপ ব্যবহার বর্বরতার চিহ্নাবশেষ।

[হরিজন, ৩-১০-'৩৬]

৩৯

নারী ও অলঙ্কার

[সিংহলের মহিলাদের একটি ক্ষুদ্র সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

যখন মহেন্দ্র সিংহলে আসিয়াছিলেন, মাতৃভূমির ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। দেশের সন্তানগণের ঐহিক বা আধ্যাত্মিক সম্পদের কোন অভাব ছিল না ; তোমরা সেই গৌরব অনুভব করিয়াছিলে। আজ মাতৃভূমির সন্তানগণ অনাহারক্লিষ্ট এবং তাহাদের জন্যই ভিক্ষাপাত্র নিয়া আমি আসিয়াছি। যদি তাহাদের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার না করিয়া তজ্জন্য নিজেদের গৌরবান্বিত অনুভব কর তাহা হইলে আমাকে শুধু অর্থপ্রদান করিলে চলিবে না— তোমাদের মূল্যবান অলঙ্কারাদিও আমাকে দিতে হইবে। অন্যত্র বহু স্থানের ভগ্নীরা তাহা দিয়াছে। যখনই ভগ্নীদিগকে সর্বাঙ্গে

অলঙ্কারভূষিতা দেখি, আমার ক্ষুধার্ত চক্ষু সেই সকল অলঙ্কারের উপর নিপতিত হয়। অলঙ্কার যাচ্ঞা করার একটি গূঢ় উদ্দেশ্যও আছে—অলঙ্কার ও হীরাজহরতের জন্য মহিলাগণের দুষ্পূরণীয় আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করা। অন্যান্য ভগ্নীদের সঙ্গে আমি যেরূপ নিঃসঙ্কোচে কথা বলি সেইভাবে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—পুরুষের চাইতে নারীকে বেশী সাজসজ্জা করিতে হয় কেন? মহিলাবন্ধুগণ আমাকে বলেন যে, পুরুষের মনস্তুষ্টির জন্য নারী উহা করে। যদি তাই হয়, আমি তোমাদিগকে এই বলিতে চাই, বাহিরের পৃথিবীর কাজে নিজেদের কর্তব্য যদি করিতে চাও তবে পুরুষের মনস্তুষ্টির জন্য সাজসজ্জা করিতে তোমরা অস্বীকার করিবে। আমি যদি নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম তবে পুরুষের ক্রীড়নক হইবার জন্যই নারার জন্ম, পুরুষের এই মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতাম। নারীর অন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য আমি মনে মনে নারীই হইয়া পড়িয়াছি। আমার স্ত্রীর প্রতি পূর্বে যেরূপ ব্যবহার করিতাম তাহার পরিবর্তন সুস্থির না করা পর্যন্ত আমি তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে পারি নাই; এইরূপে তাঁহার স্বামী হিসাবে আমার তথাকথিত অধিকার হইতে নিজকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার নিজের অধিকার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। তাঁহাকে তোমরা আজ আমার মতই সাদাসিদা দেখিতেছ। তাঁহার গলায় কোন কণ্ঠহারও নাই, পরিধানে সূক্ষ্ম বস্ত্রাদিও নাই। তোমরাও এইরূপ হও ইহাই আমার ইচ্ছা। নিজেদের খামখেয়াল ও কল্পনার বশীভূত হইও

না এবং পুরুষের দাসী হইতেও অস্বীকার কর। নিজেরা সাজসজ্জা হইতে বিরত থাক, সুগন্ধ দ্রব্য এবং সুবাসিত জল ব্যবহার পরিত্যাগ কর। যদি প্রকৃত সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতে চাও, তাহা তোমাদের হৃদয় হইতেই আসিবে; তখন শুধু পুরুষকে নয়, মানবজাতিকে তোমরা মুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ইহা তোমাদের জন্মগত অধিকার। নারী হইতেই পুরুষের জন্ম; সে তাহারই রক্ত, মাংস, অস্থি। তোমরা তোমাদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হও এবং পুনরায় জগতে তোমাদের বাণী প্রচার কর।

চা-বাগান এবং অন্যান্য কৃষিক্ষেত্রে তোমাদের ভগ্নীদের কি শোচনীয় দুরবস্থা, তাহার কথা কি তোমরা জান? নিজ ভগ্নীর মত তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার কর, তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিশ, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমাদের যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান আছে তদ্দ্বারা তাহাদের সেবা কর, তোমাদের অর্জিত গুণরাশি তাহাদের কল্যাণে নিয়োজিত কর। সেবাতে তোমাদের আত্মমর্যাদা রূপগ্রহণ করুক। তার চেয়ে নিকটেও কি সেবার সুযোগ নাই? সমাজের ভীতিস্বরূপ কত সব মদ্যপায়ী এবং বদমায়েস রহিয়াছে! মুক্তিফৌজের মেয়েদের মত নির্ভীকচিত্তে তাহাদের ভিতর গিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা কর। মুক্তিফৌজের মেয়েরা চোর, জুয়ারী এবং মদ্যপায়ীদের আস্তানায় হানা দিয়া তাহাদের পায়ে পড়ে, কাঁধে হাত দেয় এবং এইরূপে তাহাদিগকে সংশোধন করে। এইরূপ সেবা তোমাদের পরিহিত সূক্ষ্মবস্ত্র এবং অলঙ্কারাদির চেয়ে তোমাদিগকে অধিক সুশোভিত করিবে। তখন তোমাদের অছিস্বরূপে তোমাদের সঞ্চিত অর্থ আমি দরিদ্র

এবং নিঃস্বগণের ভিতর বিতরণ করিব। আমি এই প্রার্থনা করি, আমার এই বিক্ষিপ্ত বাণী তোমাদের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হউক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-'২৭]

৪০

নারী ও জহরত

তামিলনাদের জনৈকা লেডী ডাক্তার কিছু দান করিয়া তদ্বিষয়ে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমার মতে সেই পত্র তাঁহার দানের মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছে। এই কারণে এবং অন্যের পক্ষে দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে ভাবিয়া আমি দাত্রীর নাম, রাজার নাম এবং স্থান উল্লেখ না করিয়া নিম্নে ইঁহার চিঠির মর্ম সংক্ষেপে দিতেছি—

"এই কয়েকটি ছত্রে আপনাকে জানাইতেছি যে, গতকল্য আপনাকে একটি পার্শ্বেলে একটি হীরার আংটী এবং একজোড়া মাকড়ী পাঠাইয়াছি। রাজার ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্ম উপলক্ষ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে রাজপ্রাসাদে আমার চাকুরীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঐগুলি আমাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। আপনি যখন নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন তখন আপনাকে তাঁহার রাজ্যে আমন্ত্রণ করিবার সাহস রাজার হয় নাই ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্লেশবোধ করিয়াছিলাম এবং আমি জানিতে পারি যে সরকারের ভয়ে আপনাকে আহ্বান করা হয় নাই। এই হীরাখচিত অলঙ্কারগুলি পূর্বে আমার সঙ্গে সঙ্গে

থাকিত ; আপনার আগমনের পর সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার মনের অবস্থা কি হইতেছিল তাহা আপনি অনুমান করিতে পারেন। বর্তমানে যখন আমি সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার হৃদয়ে সন্তাপ উপস্থিত হয়। তৎপর যে সকল নিরন্ন লক্ষ লক্ষ লোকের কথা আপনি এখানে অবস্থানকালে বলিয়াছিলেন, সেই সন্তাপ তাহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে পরিণত হয়। নিজেকে এই প্রশ্ন করিলাম, 'এই সকল হীরাখচিত অলঙ্কার কি জনসাধারণের টাকাদ্বারা নির্মিত হয় নাই? এবং সেগুলি আমার নিজস্ব বলিয়া রাখিবার আমার কি অধিকার আছে?' তখন সেগুলি আমি আপনার নিকট পাঠাইবার সংকল্প করিলাম। আপনি খাদি সংক্রান্ত কাজে সেগুলি ব্যবহার করিতে পারেন এবং সেভাবে নিরন্ন লক্ষ লক্ষ লোকের কয়েকজনকেও সাহায্য করিতে পারেন। আমি ইহা নিশ্চিত অনুভব করি যে, আমার বাক্সের কোণে পড়িয়া থাকার চাইতে এরূপভাবে সেগুলির ব্যবহার অনেক ভাল। জনৈক বন্ধু সেগুলির মুল্য পাঁচশত টাকা সাব্যস্ত করিয়াছেন। ঐ পরিমাণের মূল্যে সেগুলিকে ইন্‌সিওর করিয়া ডাকে পাঠান হইল। যদি কোন মহানুভব ব্যক্তি জানিতে পারেন কি ঘটনাসমাবেশে এগুলি আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছে তবে আমি শুধু এই আশা করি তিনি প্রকৃত মূল্য হইতে বেশী দিবেন। চিঠির যথেচ্ছ ব্যবহার আপনি করিতে পারেন।"

—ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে কোন কারণ নাই সেখানেও আমরা ভয় কল্পনা করিয়া থাকি। বহু রাজা আছেন যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে খাদি আন্দোলন স্বেচ্ছায় সমর্থন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা দরিদ্রগণের স্বার্থেরও সহায়তা হইয়াছে ; বস্তুতঃ আমার

পত্রলেখিকা সত্যই বলিয়াছেন যে, এই দরিদ্রগণের নিকট হইতেই তাঁহাদের সম্পদ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা সত্য যে খাদির একটা রাজনৈতিক দিকও আছে, কিন্তু এখনও আমরা সেই অবস্থায় পৌঁছাই নাই যখন খাদি আন্দোলনের সহায়তা করা সরকার দণ্ডনীয় বলিয়া অবাধ ঘোষণা করিতে পারেন। প্রত্যেক জনহিতকর কার্যকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘুরাইয়া নেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের হুর্দিন বলিতে হইবে যে খাদির জনহিতকর দিকটা ভুলিয়া গিয়া উক্ত কারণে এই আন্দোলন বয়কট বা বর্জন করা হয়। কিন্তু ইহা বলা সঙ্গত হইবে, যে রাজার কথা লেডী ডাক্তার তাঁহার চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন খাদি আন্দোলন সমর্থন করিতে যাঁহারা ভয় পান অথবা আমার ন্যায় জনসেবকের প্রতি সাধারণ ভদ্রতা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচবোধ করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই একা নন। ইহা ভালই যে, রাজা আমাকে বয়কট করাতেই এই দান প্রণোদিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল ভগিনী এই মন্তব্য পাঠ করিবার সুযোগ পাইবেন তাঁহাদিগকে আমি এই বিষয় উপলব্ধি করিতে বলি—নিরন্ন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া চিন্তা করিবার জন্য যে ঘটনা উক্ত দানশীলা মহিলাকে প্রণোদিত করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবার জন্য সেই রকম ঘটনা সমাবেশের আবশ্যকতা নাই। বাস্তবিক ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যতদিন কাজের অভাবে খাদ্যাভাবহেতু দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী ক্ষুধার্ত হইয়া আছে, ভগ্নীদের পক্ষে দেহসৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য

অথবা আমার আছে শুধু এই আনন্দের জন্য বহুমূল্য রত্নালঙ্কার সঞ্চিত রাখার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই পত্রিকায় আমি ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, যদি ভারতের ধনী ভদ্রমহিলাগণ তাঁহাদের অনাবশ্যক জিনিসগুলি পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহাদিগকে যে বেশভূষা খাদি দিতে পারে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তবে খাদি আন্দোলনের সম্যক্ ব্যয় মিটান যাইতে পারে। ভারতের ঐশ্বর্যশালিনী কন্যাগণ যদি এই পথ অনুসরণ করেন তাহার কি বিপুল নৈতিক ফল জাতির উপর, বিশেষতঃ নিরন্ন জনগণের উপর বর্তিবে, সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৪-'২৮]

৪৯

নারী ও হীরাজহরৎ

নারীগণকে রত্নালঙ্কার দান করিবার জন্য আমার আবেদন এবং দানপ্রাপ্ত জিনিসগুলি নিলামবিক্রী সম্বন্ধে কোন পত্রিকায় বিরুদ্ধ সমালোচনামূলক একটি অনুচ্ছেদ আমি দেখিয়াছি। বস্তুতঃ হাজার হাজার ভগ্নী যাঁহারা আমার সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরিহিত সবগুলি না হইলেও, অধিকাংশ রত্নালঙ্কার দান করুন, এই আমি ইচ্ছা করি। এই দেশে যেখানে শতকরা প্রায় আশিজন লোক উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক প্রায় অনশনের অবস্থায় রহিয়াছে

সেখানে রত্নালঙ্কার পরিধান চক্ষুর পীড়াদায়ক। ভারতের নারীর নিজস্ব বলিয়া কোন নগদ টাকা প্রায়ই থাকে না। কিন্তু তিনি যে সকল অলঙ্কার পরিধান করেন তাহা তাঁহার নিজস্ব, যদিও তাঁহার প্রভু এবং কর্তার অনুমতি ছাড়া তিনি নিজে তাহা দান করিতে ইচ্ছা বা সাহস করেন না। যে সম্পত্তি তাঁহার নিজস্ব বলিয়া মনে করেন, সৎকার্যে তাহা দান করিলে তাঁহার মন উন্নীত হয়। পরন্তু এই রত্নালঙ্কারের অধিকাংশ শিল্পকলার কোন ধার ধারে না—তাহার কয়েকটা নিতান্ত কদাকার এবং কতকগুলি ময়লার বাহন। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে পায়ের মল, ভারী কণ্ঠহার, আঁকড়া যাহা চুল গুছাইবার জন্য ব্যবহৃত না হইয়া অমার্জিত, অধৌত এবং প্রায়শঃ দুর্গন্ধবাহী চুলের শুধু শোভা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং মণিবন্ধ হইতে কনুই পর্যন্ত সারির পর সারি বলয়নিচয়। আমার মতে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিধান করা দেশের পক্ষে সুস্পষ্টরূপে ক্ষতিজনক। এতদ্দ্বারা বহু মূলধন আটকাইয়া রাখা হয় এবং তদপেক্ষাও ক্ষতিকর, উহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। আত্মশুদ্ধির এই আন্দোলনে নারী কিংবা পুরুষের পক্ষে রত্নাভরণ বিলাইয়া দেওয়া আমি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক মনে করি। যাঁহারা দান করেন তাঁহারা আনন্দের সহিতই তাহা করেন। আমার অপরিবর্তনীয় সর্ত এই—কোন কারণেই অপহৃত রত্নাভরণ পুনরায় গড়িয়া দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ নারীগণ আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন—কেন না, যে সকল বস্তু তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ

রাখিয়াছে আমি সেগুলি বিলাইয়া দিতে তাঁহাদিগকে প্রণোদিত করিয়াছি। বহুসংখ্যক পুরুষেরাও তাহাদের পারিবারিক জীবন সহজ ও সরল করিয়া তুলিবার জন্য অনেক স্থলে আমাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছে।

[হরিজন, ২২-১২-'৩৩]

৪২

পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলো

যখনই আমি বাঙ্গালা, বিহার বা যুক্তপ্রদেশে গিয়াছি, অন্যান্য প্রদেশ হইতে সেখানে পর্দাপ্রথা অধিকতর কড়াকড়ি-ভাবে প্রচলিত দেখিতে পাইয়াছি। দ্বারভাঙ্গাতে বেশী রাত্রিতে যখন একটি সভায় বক্তৃতা দেই—এবং তাহা উচ্ছৃঙ্খল জনতা, গোলমাল ও ব্যস্ত কোলাহল হইতে মুক্ত শান্ত পরিবেশের ভিতর হইয়াছিল—আমার সম্মুখে পুরুষগণকে দেখিতে পাই কিন্তু আমার পশ্চাতে এবং পর্দার পিছনে মেয়েরা ছিলেন ; আমার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ না করিলে তাঁহাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি জানিতে পারিতাম না। একটি অনাথাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে এই আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাকে পর্দার পিছনের মহিলাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা দিতে বলা হয়। আমার শ্রোত্রীবর্গের সংখ্যা আমি জানিতাম না। তাঁহারা যে পর্দার পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই দৃশ্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও অপমানিত

বোধ করি। একটি বর্বরোচিত প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভারতের নারীগণের প্রতি পুরুষ যে অবিচার করিয়াছে তাহার বিষয় আমি ভাবি ; যে সময়ে সেই প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন তাহার উপকারিতা যাহাই থাকুক না কেন, বর্তমানে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং দেশের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতেছে। গত একশত বৎসর যাবৎ আমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছি মনে হয় তাহা আমাদের উপর অতি সামান্য প্রভাবই বিস্তার করিয়াছে ; কারণ আমি দেখিতে পাই যে শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেও পর্দাপ্রথা বজায় রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ এই নয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহার উপকারিতায় নিজেরা বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহার কারণ এই যে তাঁহারা এক ধাক্কায় এই বর্বরোচিত প্রথাকে দূরীভূত করিবার উপযুক্ত সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন না। হাজার হাজার নারীর উপস্থিতিতে শত শত সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ-সুবিধা আমার হয়। যে সকল স্ত্রীলোক এই সকল সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকে কার্যকরীভাবে কিছু বলা এই সকল সভায় নানা কোলাহলের মধ্যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণ এবং গৃহের খাঁচায় আবদ্ধ রাখা হইবে, ততদিন এর চেয়ে অধিক কিছু আশা করা যায় না। কাজেই তাঁহারা যখন কোন বড় ঘরে সম্মিলিত হন এবং হঠাৎ যদি কাহারও বক্তৃতা শুনিতে হয় তাঁহারা নিজেরা কি করিবেন এবং বক্তার সমক্ষেই বা কি করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। এবং যখন সভায় গোলমাল থামান হয়, অনেক দৈনন্দিন বিষয়ের আলোচনায়

তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ এই সকল বিষয়ের তাঁহারা কিছুই জানেন না, যেহেতু স্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন করিতে তাঁহাদিগকে কখনও প্রবুদ্ধ করা হয় নাই। আমি জানি এই চিত্র কতকটা অতিরঞ্জিত। যে সকল হাজার হাজার ভগিনীর সম্মুখে আমার বক্তৃতা দিবার সুযোগ হয় তাঁহাদের অতি সুমার্জিত রুচি ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি। আমি জানি পুরুষ যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাঁহারাও তদ্রূপ উচ্চস্তরে উঠিতে সমর্থ এবং ইহাও জানি যে, তাঁহাদেরও সময় সময় বাহিরে যাইতে হয়। এর জন্য শিক্ষিত শ্রেণীসমূহের বাহাদুরী নেওয়ার কিছু নাই। প্রশ্ন এই—তাঁহারা আরও অগ্রসর হন নাই কেন? পুরুষেরা যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে আমাদের মেয়েরা সেই স্বাধীনতা ভোগ করেন না কেন? তাঁহারা বাহিরে ভ্রমণ করিতে এবং মুক্তবায়ু সেবন করিতে পারিবেন না কেন?

সতীত্ব রৌদ্রবৃষ্টিবর্জিত উষ্ণ গৃহে জন্মে না। বাহির হইতেও ইহা চাপাইয়া দেওয়া যায় না। চারিদিকে পর্দার আড়াল দিয়া ইহা রক্ষা করা যায় না। ইহা ভিতর হইতেই বিকশিত হয় এবং ইহার কোন মূল্য দিতে হইলে প্রত্যেকটি অবাঞ্ছিত প্রলোভন এড়াইবার ক্ষমতা ইহার থাকিবে। সীতার সতীত্বের ন্যায় ইহা দুর্ধর্ষ হইবে। পুরুষের দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারা অত্যন্ত দুর্বলতার পরিচায়ক। মেয়েরা যেমন পুরুষদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন, পুরুষদিগকেও পুরুষপদবাচ্য হইতে গেলে তাহাদের স্ত্রীজাতিকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে হইবে।

একটা অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া যেন আমরা বাঁচিয়া না থাকি। রামের মত সীতা যদি স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগতি না হইতেন, শ্রীরামের কোন প্রভাব থাকিত না। ইহা অপেক্ষাও তেজঃপূর্ণ স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ দ্রৌপদী। সীতা ছিলেন নম্রতার প্রতিমূর্তি—একটি কোমল পুষ্পের ন্যায়। দ্রৌপদী ছিলেন বিশাল বনস্পতির মত। তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাক্রান্ত ভীমকেও নতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল। অন্য সকলের নিকট ভীম ছিলেন ভয়ঙ্কর কিন্তু দ্রৌপদীর নিকট তিনি ছিলেন মেষের ন্যায়। পাণ্ডবগণের কাহারও নিকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনার আবশ্যকতা তাঁহার ছিল না। ভারতের নারীজাতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ আজ ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিয়া আমরা স্বাধীনচেতা এবং সরল প্রকৃতির পুরুষের বিকাশও ব্যাহত করিতেছি। আমাদের নারীজাতির প্রতি এবং "অস্পৃশ্যগণের" প্রতি আমরা যে অবিচার করিতেছি তাহা শতসহস্রগুণে বর্ধিত শক্তিতে আমাদের মাথার উপর উল্‌টিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। আমাদের দুর্বলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা, সঙ্কীর্ণতা এবং উপায়হীনতার জন্য ইহা কতক পরিমাণে দায়ী। বিপুল উদ্যমে আসুন আমরা পর্দা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-২-'২৭]

৪৩

পর্দা

আমার মত এই যে, পর্দা ভারতবর্ষে একটি নূতন আমদানী এবং হিন্দুদের অবনতির সময় ইহা গৃহীত হইয়াছিল। তেজস্বিনী দ্রৌপদী এবং নিষ্কলঙ্ক সীতার যুগে পর্দার কোন স্থান ছিল না। গার্গী পর্দার আড়াল হইতে তাঁহার বাদানুবাদ চালান নাই। পর্দাপ্রথা সমগ্র ভারতে প্রচলিত নহে। দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে এবং পাঞ্জাবে ইহা অজ্ঞাত। কৃষকদের মধ্যে ইহা অজ্ঞাত এবং এই সকল প্রদেশে এবং কৃষকদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে তাহার ফলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এরূপ কেহ শুনে নাই। পরন্তু ইহা বলাও যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, পৃথিবীর যে সকল স্থানে পর্দাপ্রথা প্রচলিত নাই সেখানে পুরুষগণ বা স্ত্রীলোকগণ নৈতিক দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত হেয়। পত্রলেখক যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল ইহা সমর্থন করিতে চান। যদিও আমার মত এই যে, প্রাচীন মনীষিগণ আমাদিগকে এরূপ নীতিশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা দিয়াছেন যাহা হইতে ভাল আর কিছু করা যায় না, তথাপি প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহারা অভ্রান্ত এই মত আমি সমর্থন করি না। এবং প্রকৃতপক্ষে কি প্রাচীন তাহা কে বলিবে? ১০৮টি উপনিষদের সবগুলিই কি সমানভাবে প্রামাণ্য? আমার মনে হয় যুক্তির কষ্টিপাথরে যাহা পরীক্ষা করিয়া নেওয়া যায়

তাহা নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষা করিয়া লইব এবং সেই পরীক্ষা দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা প্রাচীনতার পরিচ্ছদে থাকিলেও বর্জনীয় হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৩-'২৭]

৪৪

পর্দার অবসান

সম্প্রতি বিহারে প্রভূত ক্ষমতাশালী বহু লোকের এবং ঐ প্রদেশের প্রায় সমসংখ্যক মহিলাগণের স্বাক্ষরিত একটি যুক্তিপূর্ণ আবেদন বাহির হইয়াছে, পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিবার জন্য। উক্ত আবেদনে পঞ্চাশের অধিক মহিলা স্বাক্ষর করিয়াছেন ; এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে উদ্যমের সহিত এই কার্য চালাইতে পারিলে বিহারে পর্দাপ্রথা অতীতের বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা উল্লেখযোগ্য, যে সকল মহিলা উক্ত আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা বিলাতী ভাবাপন্ন শ্রেণীর নন ; তাঁহারা গোঁড়া হিন্দু। উহাতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—

"আমরা চাই যে আমাদের প্রদেশের নারীগণ কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজ প্রদেশের তাহাদের ভগিনীগণের ন্যায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবে এবং সামাজিক জীবনে সকল বিষয়ে তাহাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে এবং পাশ্চাত্যভাব অনুকরণের সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তাহা মূলতঃ ভারতীয় ভাবেই করিতে হইবে। যদি আমাদের

দেশের নারীদিগকে ভারতীয় আদর্শমূলে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে হয় তবে আমাদের মতে পর্দা উঠাইয়া দিতে হইবে ; কারণ ইহা আমাদের ধারণা যে, বলপূর্বক প্রবর্তিত নির্জনবাস হইতে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য জগতের অবস্থায় উপনীত হওয়া জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের মত হইবে। যদি আমাদের সামাজিক জীবনে শ্রী ও মাধুরী বাড়াইতে চাই এবং নৈতিক মান উন্নত করিতে চাই, যদি নারীদিগকে বাড়ীতে সুনিপুণা গৃহকর্ত্রীরূপে, তাহাদের স্বামিগণের সহায়কারী সঙ্গিনীরূপে এবং সমাজের উপকারী অঙ্গরূপে দেখিতে চাই, তবে বর্তমানে পর্দাপ্রথা যেভাবে প্রচলিত আছে তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। বস্তুতঃ যদি পর্দা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়া না হয় তবে নারীগণের মঙ্গলের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া যায় না। ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি একবার আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের কৃত্রিম উপায়ে নিরুদ্ধ শক্তি বন্ধনমুক্ত হয় তবে ইহা এমন একটি বীর্যের সৃষ্টি করিবে যাহা উপযুক্ত-ভাবে চালিত হইলে এই প্রদেশের অসীম উপকার সাধন করিবে।”

বিহারে পর্দা যে সব কুফল প্রসব করিয়াছে তাহা আমি জানি। এই আন্দোলন উপযুক্ত সময়েই আরম্ভ হইয়াছে।

এই আন্দোলনের আরম্ভ অদ্ভুত রকমের। বাবু রামানন্দন মিশ্র নামক জনৈক খাদিকর্মী পর্দার অত্যাচার হইতে তাঁহার স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার স্ত্রীকে আশ্রমে আনিতে না দেওয়ায় তিনি আশ্রম হইতে দুইটি মেয়েকে তাঁহার স্ত্রীর সহচরীরূপে নেন। তাহাদের একজন মগনলাল গান্ধীর কন্যা রাধাবেন, তাঁহার শিক্ষকতার কাজ করিবেন, এবং তাঁহার সঙ্গে গেলেন স্বর্গীয় লালবাহাদুর গিরির কন্যা দুর্গাদেবী। বালিকাবধূর পিতামাতা তরুণী শ্রীযুক্তা

মিশ্রকে পর্দামুক্ত করার জন্য আশ্রমবালিকাদের এই উদ্যমে রুষ্ট হইলেন। বালিকাগণ সকলপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে সাহস করিলেন। ইতিমধ্যে মগনলাল গান্ধী তাঁহার কন্যাকে দেখিতে গেলেন এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই না ছাড়িবার জন্য সাহস দিয়া গেলেন। রাধাবেন যে গ্রামে তাঁহার কাজ করিতেছিলেন সেখানে মগনলাল অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পাটনাতে তিনি দেহত্যাগ করেন। সেইজন্য বিহারের বন্ধুগণ পর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা একটি সম্মানজনক কার্য বলিয়া গণ্য করিলেন। রাধাবেন তাঁহার ছাত্রীকে আশ্রমে নিয়া আসিলেন। তাঁহার আশ্রমে আসার ফলে আরো জোরে আন্দোলন জাগিয়া উঠে, এবং তাঁহার স্বামী পূর্ব হইতেই তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত আন্দোলনে যোগদান করিতে বাধ্য হন। এইভাবে এই আন্দোলন ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিশেষ শক্তিসহকারে পরিচালিত হইবে আশা করা যায়। এই আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছেন বিহারের পাকা সৈনিক এবং বহুযুদ্ধে জয়ী বীর বাবু ব্রিজকিশোর প্রসাদ। তিনি নেতারূপে যে সকল আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহার কোনটি বিফল হইয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হয় না।

এই প্রথার বিরুদ্ধে গভীরভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য উক্ত আবেদনে পরবর্তী ৮ই জুলাই দিন ধার্য করা হইয়াছে। এই পর্দাপ্রথার ফলে বিহারের জনসংখ্যার অর্ধেক লোককল্যাণের জন্য সমাজসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উহা

দ্বারা এই নারীদিগের স্বাধীনতা, এমনকি বিশুদ্ধ আলোক ও বায়ুতে বিচরণ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যত শীঘ্র আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে আমাদের সমাজের অনেকগুলি কুসংস্কার স্বরাজের দিকে আমাদের গতি ব্যাহত করিতেছে, বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে আমাদের অগ্রগতি তত বেশী ত্বরান্বিত হইবে। স্বরাজলাভ না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক সংস্কার ফেলিয়া রাখার অর্থ স্বরাজ দ্বারা কি বুঝায় তাহা না জানা। যদি আমাদের নারীগণকে পঙ্গু করিয়া রাখার অবসর দেই তবে ইহা নিশ্চিত যে, আমরা নিজেদের রক্ষা করিতে পারিব না কিংবা অন্যান্য জাতির সহিত সদুপায়ে প্রতিযোগিতা করিতেও সমর্থ হইব না।

কাজেই বিহারের নেতাগণকে পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য মনে প্রাণে ধন্যবাদ দিতেছি। সাধারণতঃ সকল সংস্কারের, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর সংস্কারের জয়লাভ কর্মিগণের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। যে সকল মহিলা আবেদনপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের উপরও অনেকটা নির্ভর করিবে। পর্দা উঠাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা যদি ভারতের নারীসমাজের সনাতন লজ্জাশীলতা রক্ষা করেন এবং গুরুতর বাধাবিপদের সম্মুখেও সাহস এবং দৃঢ় সংকল্প দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের প্রচেষ্টা শীঘ্রই জয়যুক্ত হইবে। পর্দার বিরুদ্ধে আন্দোলন যথাবিহিতরূপে পরিচালিত হওয়ার অর্থ হইবে বিহারের স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষে প্রকৃত রকমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৬-২৮]

৪৫

বিহারে পর্দা

একজন বিহারী বন্ধুর পত্রে জানা যায় যে, বর্তমান জুলাই মাসের ৮ই তারিখ বিহারের অনেকগুলি প্রধান প্রধান কেন্দ্রে পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে জনমত প্রদর্শন করা হয় তাহা উদ্যোক্তৃগণের মতে আশাতীতভাবে জয়যুক্ত হইয়াছিল। পাটনার সভার কার্যবিবরণী 'সার্চলাইট' পত্রিকায় এইভাবে আরম্ভ করা হয়—

বিগত ৮ই জুলাই রবিবার পাটনার রাধিকাসিংহ ইনস্টিটিউটে পুরুষ ও মহিলাগণের যে যুক্ত সভার অধিবেশন হয় তাহাতে অনন্যসাধারণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও, যাহা সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সভার প্রাক্কালে থামিয়া যায়, শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা আশাতীতরূপে অধিক ছিল। বস্তুতঃ রাধিকাসিংহ ইনস্টিটিউটের বিস্তৃত কক্ষের প্রায় অর্ধাংশ মহিলাদের দ্বারা পূর্ণ হয়; এবং তাঁহাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ একদিন পূর্বে, এমনকি একঘণ্টা পূর্বেও, পর্দা মানিয়া চলিতেছিলেন।

সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার ভাষান্তর এই—

"আমরা পাটনার নরনারীগণ সম্মিলিত হইয়া এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা অদ্য হইতে ঘোর অকল্যাণকর পর্দাপ্রথা উঠাইয়া দিলাম। এই পর্দা প্রচলনে দেশের, বিশেষতঃ নারীসমাজের, অশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে এবং এই প্রদেশের অন্যান্য

নারীগণ যাঁহারা এখনও এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত আছেন তাঁহাদের নিকট এই আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রথা দূরীভূত করুন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উন্নতিবিধান করুন।"

বিহার প্রদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চালাইবার জন্য সভায় একটি অস্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে প্রদেশের প্রত্যেক সহরে এবং গ্রামে মহিলা-সমিতি গঠনের উপদেশ দেওয়া হয়। চতুর্থ প্রস্তাব এই মর্মে গৃহীত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মহিলা-আশ্রম স্থাপন করা হউক ; সেখানে মহিলাগণ কিছুকালের জন্য অবস্থান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ শিক্ষালাভ করিবেন যেন তাঁহারা "সুশীলা স্ত্রী", "স্নেহশীলা মাতা" এবং "দেশপ্রেমিক সেবিকা"র যোগ্যতালাভ করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি সভাস্থলেই পাওয়া যায় এবং আমি দেখিতেছি দাত্রীগণের মধ্যে অনেক মহিলাই পঁচিশ হইতে আড়াইশত টাকা পর্যন্ত দিয়াছেন। উক্ত পত্রিকায় বিহারের অন্যান্য কয়েকটি স্থানের অনুরূপ সভার বিবরণীসকলও প্রকাশিত হইয়াছে। যদি এই আন্দোলন ভালরূপে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া উৎসাহের সহিত চালান যায় তবে পর্দাপ্রথা অতীতের বিষয়রূপে পরিণত হইবে। ইহা উল্লেখযোগ্য, ইংরেজীভাবাপন্ন করিয়া তোলা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। নেতৃবৃন্দ যাঁহারা স্বভাবতঃই সমাজে স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী অথচ হিন্দুসমাজে যে সকল কুরীতি প্রবেশ করিয়াছে সে সকলের দিকে সজাগ, তাঁহাদের দ্বারাই এই দেশীয়-ভাবাপন্ন রক্ষণশীল প্রচেষ্টা করা

হইয়াছে। বাবু ব্রিজকিশোর প্রসাদ এবং বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, যাঁহারা সুদূর লণ্ডন সহর হইতে আগ্রহের সহিত এই আন্দোলনের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং উহাকে সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভারতবাসীর প্রতীক নহেন। তাঁহারা গোঁড়া হিন্দু, ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অনুরাগী, তাঁহারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী নহেন, অথচ তাহাতে যাহা ভাল আছে তাহা নিজের করিয়া নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। কাজেই যাঁহারা ভীরুপ্রকৃতি এবং সংশয়পূর্ণ তাঁহাদের এমন কোন ভয়ের কারণ হওয়া উচিত নয় যে, ভারতীয় কৃষ্টিতে যাহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিশেষতঃ ভারতীয় নারীর মাধুর্য ও ব্রীড়াশীলতা প্রভৃতি যে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সেগুলি কোন আকারে বা প্রকারে এই আন্দোলনের ফলে বিনষ্ট হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৭-'২৮]

৪৬

নারীগণের আর্থিক স্বাধীনতা

প্রশ্ন ॥ কোন কোন লোক বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের সম্পত্তিতে মালিক হইবার অধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্তনের এই কারণে বিরোধিতা করেন যে, স্ত্রীলোকেরা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহাদের মধ্যে নৈতিক অবনতি বৃদ্ধি পাইবে এবং গার্হস্থ্যজীবন চুরমার হইয়া যাইবে। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কি ?

উত্তর ॥ এই প্রশ্নের উত্তর আমি একটি পাল্টা প্রশ্ন করিয়া দিব। পুরুষের স্বাধীনতা এবং তাহার সম্পত্তির অধিকার কি পুরুষের ভিতর নৈতিক অধঃপতন বাড়ায় নাই? যদি উত্তরে 'হাঁ' বল তবে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সেইরূপ হউক। এবং যখন নারীগণ পুরুষের ন্যায় মালিকী স্বত্বাধিকার প্রভৃতি লাভ করিবে তখন ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল স্বত্ব ও অধিকার ভোগ তাহাদের সৎ বা অসৎ কার্যের কারণ নহে। যে নীতি-ধর্ম স্ত্রী কিংবা পুরুষের উপায়হীনতার উপর নির্ভর করে তাহার সপক্ষে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। নৈতিক চরিত্রের মূল আমাদের হৃদয়ের পবিত্রতার মধ্যে নিহিত।

[হরিজন, ৮-৬-'৪০]

৪৭

জনৈকা ভগিনীর সমস্যা

প্রশ্ন ॥ স্ত্রীলোকের মানসম্ভ্রম কিরূপে রক্ষা করা যায়?

উত্তর ॥ আমার বিশ্বাস আপনি নিয়মিতভাবে হরিজন পত্রিকা পড়েন না। বহু বৎসর পূর্বে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি এবং তৎপরও অনেকবার করিয়াছি। বিষয়টি দুই দিক হইতে আলোচনা করা যায়ঃ (১) কোন নারী নিজের সম্মান নিজে কিভাবে রক্ষা করিবে এবং (২) তাহার পুরুষ আত্মীয়গণই বা কিভাবে তাহা রক্ষা করিবে?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে—যেখানে অহিংস পরিবেশ বিদ্যমান, যেখানে অহিংস-নীতি সর্বদা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইখানে নারী নিজকে পরাধীন, দুর্বল বা উপায়হীন মনে করিবেন না। যতক্ষণ তিনি প্রকৃতই নির্মল চরিত্রবতী হন, ততক্ষণ বাস্তবিক পক্ষে তিনি উপায়হীন নন। তাঁহার পবিত্রতাই তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে সজাগ করিয়া দেয়। আমি সর্বদাই এই মত পোষণ করিয়াছি যে, কোন নারীকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষিত করা বাহ্যতঃ অসম্ভব। তখনই ধর্ষণ ঘটিয়া থাকে যখন তিনি ভয়ে অভিভূত হন অথবা তাঁহার নৈতিক বল সম্বন্ধে ধারণা না থাকে। আক্রমণকারীর শারীরিক শক্তি যদি তিনি প্রতিহত করিতে না পারেন তবে তাঁহাকে ধর্ষিত করিতে সক্ষম হওয়ার পূর্বেই তাঁহার পবিত্রতা তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিবার শক্তি প্রদান করিবে। সীতার কথা ধরুন। রাবণের সম্মুখে তিনি ছিলেন অতিশয় দুর্বল কিন্তু তাঁহার নির্মল চরিত্র রাবণের দানবীয় শক্তিসামর্থ্যকে পরাভূত করিয়াছিল। সর্বপ্রকার প্রলোভন দ্বারা তিনি তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সম্মতি না থাকায় তাঁহাকে কুভাবে স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। পক্ষান্তরে, যদি কোন নারী তাঁহার নিজের শারীরিক বলের উপর বা তাঁহার আয়ত্ত কোন মন্ত্রের উপর নির্ভর করেন তবে তাঁহার শক্তি ফুরাইয়া গেলে তিনি নিশ্চয়ই বিফলপ্রয়াস হইবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। ভাই, পিতা বা বন্ধু তাহার রক্ষণীয় ব্যক্তি এবং আক্রমণকারীর মাঝে

আসিয়া দাঁড়াইবে। তৎপর হয় সে আক্রমণকারীকে তাহার অসৎ উদ্দেশ্য হইতে নিবারিত করিবে অথবা তাহাকে বাধা দিতে গিয়া তাহার হাতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে। এইভাবে মৃত্যু বরণ করিয়া সে শুধু নিজ কর্তব্য পালন করিল তাহা নয়, তাহার আশ্রিতা নারীর হৃদয়ে নূতন বল সঞ্চারিত করিতে পারিবে এবং তিনি নিজের সম্মান কিভাবে রক্ষা করিতে হইবে তদ্বিষয়েও প্রবুদ্ধ হইবেন।

পুণা হইতে জনৈকা ভগিনী বলিয়াছেন, "কিন্তু সেইখানেই গোল। নারী তাহার জীবন কিভাবে বিসর্জন দিবে? তাহার পক্ষে ইহা করা কি সম্ভবপর?"

গান্ধীজী উত্তরে বলিলেন, "পুরুষের পক্ষে না হইলেও নারীর পক্ষে ইহা সর্বদাই অধিক সম্ভবপর। আমি জানি যে নারী এর চাইতে অনেক ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও প্রাণ দিতে পারে। অল্প কয়েক দিন পূর্বে কুড়ি বৎসরের একটি তরুণী সামান্য লেখাপড়া শিখিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যখন মনে করিল যে তাহার উপর জোরজুলুম করা হইতেছে তখন সে আগুনে পুড়িয়া মরিয়া গেল। এবং সে ধীরভাবে অত্যন্ত সাহসের সহিত দৃঢ়সংকল্প হইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সাধারণ তেলের বাতি দ্বারা তাহার শাড়ীতে আগুন ধরাইয়াছিল, কোনরূপ চীৎকারও করে নাই এবং পার্শ্ববর্তী ঘরের লোকেরা সব শেষ হইয়া যাইবার পূর্বে কি ঘটিতেছিল তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত অনুমোদন করিবার জন্য আমি এইরূপ বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি না, কিন্তু নারী কিরূপ

সহজে নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্তই দিতেছি। অন্ততঃ আমি এরূপ সাহস দেখাইতে অসমর্থ। কিন্তু আমার এই মত যে, ভিতরের আলোরই দরকার, বাহিরের আলোর নয়।"

উক্ত ভগিনী ইহা আশ্চর্য মনে করেন যে ছেলেদিগের সঙ্গে ব্যবহারে ক্রোধ এবং পীড়ন সম্পূর্ণরূপে কি করিয়া পরিত্যাগ করা যায়। গান্ধীজী প্রাণের সহিত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের পুরাতন নীতিবাক্যটি জান পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তাহার সঙ্গে খেলা করিবে, দশ বৎসর পর্যন্ত বার বার শাসন করিবে এবং যখন সে ষোড়শ বৎসরের হইবে তখন তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে।" তিনি আরও বলিলেন, "কিন্তু চিন্তা করিও না। সময় সময় যদি তোমার সন্তানের উপর রাগ করিতে হয় সেই রাগকে আমি অহিংস রাগ বা ফোঁস করা বলিব। আমি বুদ্ধিমতী জননীদের কথাই বলিতেছি; যাহারা অজ্ঞ এবং মাতৃনামে অভিহিত হইবার অযোগ্য তাহাদের কথা বলিতেছি না।"

[হরিজন, ১-৯-'৪০]

৪৮

বিধবার আর্তি

বিধবাদের পুনর্বিবাহ কোন কোন ক্ষেত্রে দরকার। আমাদের যুবকগণ নিজেরা নির্মল চরিত্রের হইলেই এই সংস্কার

সম্ভব হইতে পারে। তাহারা কি নির্মল? শিক্ষাদ্বারা তাহারা কি কোন উপকার পায়? আর তাহাদের শিক্ষারই বা দোষ দাও কেন? শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের ভিতর একটি দাসত্বের মনোভাব যত্নের সহিত অনুশালন করা হয় এবং যদি আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে না শিখি তবে স্বাধীন-ভাবে কাজ করিব কি করিয়া? আমরা সমভাবে জাতিভেদের, বিদেশী শিক্ষার এবং বিদেশী সরকারের দাস। আমাদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় তাহার প্রত্যেকটি আমাদের নিগড়স্বরূপ। আমাদের ভিতর কত শিক্ষিত যুবক রহিয়াছে, তাহাদের ভিতর কয়জন তাহাদের নিজেদের ঘরের বিধবাগণের অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করে? তাহাদের ভিতর কয়জন অর্থের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিয়াছে? তাহাদের ভিতর কয়জন নারীদিগকে আপনার ভগ্নী বা মাতার ন্যায় জ্ঞান করে এবং তাহাদের সন্মান রক্ষা করে? তাহাদের কয়জনের নিজের মতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং কয়জন বা জাতিগত অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস রাখে? নিরুপায় বিধবাগণ কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে যাইবে? আমি তাহাদিগকে কি সান্ত্বনা দিতে পারি? তাহাদের কয়জন 'নবজীবন' পত্রিকা পড়ে? যাহারা পড়ে, তাহাদের কয়জনই বা নিজেদের মত অনুযায়ী কাজ করিতে পারে? তথাপি আমি সময় সময় নবজীবন পত্রিকার স্তম্ভে বিধবাগণের আর্তির কথা লিখিয়া থাকি এবং সুযোগ হইলে আরও বেশী কিছু করিবার ইচ্ছা রাখি। ইতিমধ্যে যাঁহাদের তত্বাবধানে

বালবিধবা আছে তাঁহাদের প্রত্যেককে বলিব যে, তাঁহাকে বিবাহ দেওয়া তাহাদের কর্তব্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-২-'২৬]

৪১

বাধ্যতামূলক বৈধব্য

স্যর গঙ্গারাম সমগ্র ভারতের বিধবাগণের সংখ্যার একটি মূল্যবান তালিকা প্রত্যেক প্রদেশের অতিরিক্ত তালিকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক সমাজসংস্কারকের নিকট এই তালিকাগুলি থাকা উচিত।

স্যর গঙ্গারাম যে পর্যায়ক্রমে সংস্কারকার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করেন অনেকে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। এইরূপ পর্যায় তিনি দিয়াছেন—

প্রথম—সামাজিক সংস্কার,
দ্বিতীয়—অর্থ নৈতিক সংস্কার,
তৃতীয়—স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

স্যর গঙ্গারামের পূর্ববর্তিগণ, যাঁহারা সর্বাংশে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী সমাজসংস্কারক ছিলেন, এরূপ ভাবে চিন্তা করেন নাই। রাণাডে, গোখ্‌লে এবং চন্দ্রভারকর স্বরাজকে সামাজিক সংস্কারের ন্যায় গুরুত্ববিশিষ্ট মনে করিয়াছেন। লোকমান্য তিলক সামাজিক সংস্কারের বিষয়ে এতদপেক্ষা কম চিন্তা

করেন নাই। কিন্তু তিনি ও তাঁহার পূর্ববর্তিগণ সকল প্রকারের সংস্কার একসঙ্গেই পরিচালিত করিবার আবশ্যকতা স্বীকার ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লোকমান্য এবং গোখ্‌লে রাজনৈতিক সংস্কারকে অন্যান্যগুলি হইতে অধিকতর জরুরী মনে করিতেন। তাঁহাদের মত ছিল এই যে, রাজনৈতিক দাসত্ব আমাদিগকে অন্য সব কাজের ক্ষেত্রে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ জনসাধারণের চেতনা উদ্বুদ্ধ করা। জাতীয় কর্মধারার সবগুলি দিক প্রভাবিত না করিয়া সেই স্বাধীনতা আসিতে পারে না। সংস্কারমাত্রেরই অর্থ একরূপ জাগরণ। একবার প্রকৃতপক্ষে জাগরিত হইলে জাতি জীবনের শুধু একটি বিভাগের সংস্কার দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। সবগুলির আন্দোলন চলিতে থাকিবে এবং প্রত্যেকটিই একসঙ্গে চলিবে।

কিন্তু স্যর গঙ্গারামের প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারাদির ক্রমধারার সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। যদিও তাঁহার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষেধকগুলির সম্বন্ধে একমত হওয়া যায় না, তথাপি সামাজিক সংস্কার বিষয়ে তাঁহার প্রবল উৎসাহ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। তিনি যে সংখ্যাগুলি দিয়াছেন তাহা ভয়াবহ। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "বাল্যবিবাহ এবং বাধ্যতামূলক বৈধব্যজনিত দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্র এই সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় তজ্জন্য এমন

কে আছে যে অশ্রুবিসর্জন করিবে না ?" ১৯২১ সালের আদমস্থমারি মতে হিন্দুবিধবাদের সংখ্যা এই—

পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিধবা—	১১৮৯২
পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের বিধবা—	৮৫০৩৭
দশ হইতে পনের বৎসর বয়সের বিধবা—	২৩২১৪৭
	৩২৯০৭৬

পূর্ববর্তী দুইটি লোকগণনার সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। পূর্ববর্তী বিশ বৎসরের সংখ্যা হইতে ১৯২১ সালের মোট সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক। অন্যান্য শ্রেণীর বিধবাগণের সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি আরও বিশেষভাবে হিন্দু বালবিধবাগণের প্রতি সামাজিক অবিচারের আতিশয্য সপ্রমাণ করে। আমরা ধর্মের দোহাই দিয়া গাভীরক্ষার জন্য চীৎকার করি, কিন্তু বালবিধবারূপী নরগাভীদিগকে রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হই। ধর্মের নামে আমরা বলপ্রয়োগ করিতে পারি, কিন্তু ধর্মের নামে আমাদের তিন লক্ষ বালবিধবাকে আমরা জোর করিয়া বৈধব্যদশায় রাখি,—যাহারা বিবাহ-ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ কখনও বুঝিতে পারে নাই। ছোট ছোট বালিকাদিগকে বৈধব্য অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করা নৃশংস অপরাধ এবং তাহার জন্য আমরা হিন্দুগণ প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। যদি আমাদের বিবেকবুদ্ধি প্রকৃতরূপে জাগরিত হইত তাহা হইলে পনের বৎসরের পূর্বে কোন বিবাহই হইতে পারিত না এবং বৈধব্যের কথাই উঠিত না এবং এই তিন লক্ষ বালিকা কখনও ধর্মতঃ বিবাহিতা হয় নাই, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতাম।

কোন শাস্ত্র দ্বারাই এই প্রকার বৈধব্য সমর্থিত হয় না। যে নারী জীবনসঙ্গীর ভালবাসা উপলব্ধি করিয়াছে সে যদি জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছাক্রমে বৈধব্য অবস্থাই বরণ করে তাহা হইলে জীবন সুন্দর এবং মর্যাদাসম্পন্ন হয়, গৃহ পবিত্রীকৃত হয় এবং ধর্ম পর্যন্ত উন্নীত হয়। ধর্ম বা প্রথা দ্বারা যে বৈধব্য কায়েম করা হয় তাহা অসহনীয় জোয়ালস্বরূপ এবং উহার ফলে গোপন পাপ দ্বারা গৃহ কলুষিত হয় এবং ধর্মের অবনতি ঘটে।

পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্ক বৃদ্ধ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ বালিকাবধূ গ্রহণ করিতেছে অথবা ক্রয় করিতেছে—সময় সময় এক স্ত্রী থাকিতেই আর একজনকে বিবাহ করিতেছে—এই সব বিষয় যখন চিন্তা করা যায় তখন হিন্দুবিধবাগণের অবস্থা মনে করিয়া তাহার পূতিগন্ধে কি নাসিকা জ্বালা করে না? হাজার হাজার বিধবা আমাদের মধ্যে যতদিন থাকিবে, আমরা বারুদপূর্ণ গহ্বরের উপরই বসিয়া থাকিব; উহার বিস্ফোরণে প্রতিমুহূর্তেই সমাজ ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। যদি আমরা পবিত্র হইতে চাই, যদি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিতে চাই, তবে বাধ্যতামূলক বৈধব্যদশার বিষ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যাঁহাদের আশ্রয়ে বালবিধবাসকল রহিয়াছে তাঁহারাই এই সংস্কার প্রভূত সাহসের সহিত আরম্ভ করিবেন এবং যাহাতে তাহারা বিধি-অনুযায়ী যথাযোগ্য স্থলে বিবাহিত হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন—ইহা পুনর্বিবাহ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহারা কখনই বিবাহিত হয় নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৮-'২৬]

৫০

স্বাধিকার-বঞ্চিত মানবসম্প্রদায়

অস্পৃশ্যগণই স্বাধিকার-বঞ্চিত মানবসমাজের একমাত্র অংশ নহে। হিন্দুসমাজে বালবিধবাগণ তদপেক্ষা কম নহে। বঙ্গদেশ হইতে একজন লিখিয়াছেন—

"মুসলমানদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধ নাই; পরন্তু ক্রমান্বয়ে চারিটি পত্নী গ্রহণ করিবার বিধান রহিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক মুসলমানেরই একাধিক পত্নী রহিয়াছে। এইজন্য মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যে কেহই অবিবাহিত থাকে না। কাজেই ইহা কি সত্য নয় যে যেখানে বিধবাগণের পুনর্বিবাহে বাধা নাই সেখানে পুরুষদের সংখ্যা হইতে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী? অর্থাৎ ইহা কি সত্য নয় যে যে-সকল সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে সেখানে বহুবিবাহও প্রচলিত থাকা উচিত?

"যদি বিধবাদের পুনর্বিবাহ হিন্দুদের ভিতর প্রচলিত করা যায় তাহা হইলে তরুণী বিধবাগণ কি যুবকগণকে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে প্ররোচিত করিবে না এবং তদ্দারা অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য বর পাওয়া কঠিন, এমনকি অসম্ভব, করিয়া তুলিবে না?

"যদি হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে বিধবাগণ যে সকল পাপে লিপ্ত হয় বা লিপ্ত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়, সেই সকল পাপকার্য তখন অবিবাহিতা মেয়েরা করিবে না?

"বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিবার সময় দাম্পত্যপ্রেম, গার্হস্থ্য-জীবনের শুচিতা, পাতিব্রত্যধর্ম এবং এরূপ অন্যান্য বিষয় যাহা বিবেচনা করা উচিত সেই সম্বন্ধে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"

—বিধবাগণের বিবাহ বন্ধ করিবার আগ্রহাতিশয্যে লেখক অনেকগুলি বিষয় বাদ দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান সমাজে যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশেরই এক স্ত্রী থাকে। লেখকের বোধ হয় জানা নাই যে, হিন্দুধর্মে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোন বাধানিষেধ নাই। সমাজের অতি উচ্চ স্তরের হিন্দুগণও একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিয়াছেন জানা যায়। অনেক রাজা অসংখ্য স্ত্রী বিবাহ করেন। লেখক ইহাও ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কেবল তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। অবনমিত শ্রেণীর লোকের অধিকাংশের ভিতর বিধবাগণ বিনাবাধায় পুনরায় বিবাহ করে এবং তজ্জন্য কোন অশুভ ঘটনা ঘটে নাই। যদিও তাহাদের একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণেও বাধা নাই, ইহা প্রায় সর্বদাই দেখা যায় যে তাহারা সব সময় একজন সঙ্গিনী নিয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

তরুণী বিধবাগণ সমস্ত যুবককে বিবাহ করিয়া ফেলিবে এবং অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না, এইরূপ মন্তব্য দ্বারা সংখ্যানুপাতিক জ্ঞানের শোচনীয় অভাব প্রকাশ পায়। তরুণবয়স্কা মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে অত্যধিক আশঙ্কা মানসিক বিকারের পরিচয় দেয়। অল্পসংখ্যক বিধবাগণের পুনর্বিবাহ হইলে বহুসংখ্যক তরুণী মেয়েদের অবিবাহিত থাকিতে হইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। এবং যদি এইরূপ কোন প্রশ্ন কখনও উঠে তবে ইহা অন্ততঃ দেখা যাইবে যে, বর্তমানে যে সকল বাল্যবিবাহ ঘটে তাহাই তাহার

কারণ। ভবিষ্যতের প্রতিকারের উপায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।

অতিঅল্পবয়স্কা বিধবাদের সম্বন্ধে প্রেম, গার্হস্থ্যজীবনের পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

কিন্তু লেখক আমার বক্তব্য বিষয়টি মোটেই ধরিতে পারেন নাই। আমি সর্বব্যাপকভাবে বিধবাবিবাহ কখনও অনুমোদন করি নাই। স্যর গঙ্গারামের সংকলিত সাংখ্যিক বিবরণ এবং এই পত্রিকায় যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল পনের বৎসরের অনূর্ধ্ব বিধবাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই উপায়হীন হতভাগ্য বিধবাগণ পাতিব্রত্যধর্মের কিছুই জানিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। প্রেম সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহা বলাই বরং সত্য হইবে যে, এই সকল মেয়েরা কখনও আদৌ বিবাহিত হয় নাই। যদি বিবাহ ধর্মমূলক সংস্কার হয় (তাহাই হওয়া বিধেয়) এবং তাহা নূতন জীবনের প্রবেশদ্বার হয়, তবে মেয়েদিগকে বিবাহের পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতালাভ করিতে হইবে, জীবনসঙ্গী নির্বাচন বিষয়ে তাহাদের কতকটা স্বাধীনতা থাকাও দরকার এবং কৃত কার্যের পরিণাম সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত হওয়াও আবশ্যক। শিশুদের মিলনকে বিবাহিত অবস্থা বলা এবং তৎপর তথাকথিত স্বামীর মৃত্যু হইলে বালিকাটিকে চিরতরে বৈধব্য অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করা ভগবানের নিকট, মানবের নিকট অপরাধ।

আমি ঠিক বিশ্বাস করি যে, একটি প্রকৃত হিন্দু বিধবা রত্নস্বরূপা। মানবজাতিকে হিন্দুধর্ম যাহা দান করিয়াছে তিনি তাহার মধ্যে একটি। রমাবাই রাণাডে এইরূপ একটি রত্ন

ছিলেন। কিন্তু বালবিধবাগণের অস্তিত্ব হিন্দুধর্মের কলঙ্ক-স্বরূপ। রমাবাইর তুল্য একজনের অস্তিত্বদ্বারা সেই কলঙ্ক-মোচন হয় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-৪-'২৬]

৫১

বিধবার পুনর্বিবাহ

যৌক্তিকতার সহিতই একজন লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন স্যর গঙ্গারামের প্রদত্ত হিন্দু বিধবাগণের সাংখ্যিক বিবরণসকল হিন্দু বিধবাদিগের সম্বন্ধে, না শুধু প্রথানুযায়ী যাহাদের বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাদের সম্বন্ধে? স্যর গঙ্গারামের নিকট উক্ত প্রশ্ন পাঠাইয়া আমি জানিতে পারি "তাঁহার সংখ্যাসম্বন্ধীয় বিবরণী যে সকল শ্রেণীতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ তাহাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সর্বশ্রেণীর হিন্দু বিধবাই উহার অন্তর্ভুক্ত।" স্যার গঙ্গারাম আরও বলেন, "পরন্তু শুধু এই সকল শ্রেণীর সংখ্যা দিয়া কোন লাভ নাই। আমরা সকলেই জানি যে, মুসলমানেরা এবং খৃষ্টানরা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। তথাপি তাহাদের মধ্যে এমন বিধবাসকল রহিয়াছে যাহারা আগেই হউক পিছেই হউক, পুনরায় বিবাহ করিবে। হিন্দু বিধবাগণের উপর বিবাহের যে নিষেধ আছে আমি তাহাই দূর করিতে চাই। আমি প্রত্যেক বিধবাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে চাই না।"

ইহা ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজের অনুশাসন সেই সকল শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ যাহারা বিধবা-বিবাহমূলক নিষেধের আওতায় পড়ে। এই আওতার বাহিরে হিন্দু বিধবাগণ মুসলমান ও খৃষ্টান বিধবাদের ন্যায় প্রায় একই রকম স্বাধীনতার সহিত বিবাহ করে, যদিও শেষোক্তগণের পক্ষে ন্যায়ের খাতিরে বলিতে হয় যে মুসলমান ও খৃষ্টান বিধবাগণের সকলেই "আগে কিংবা পরে" বিবাহ করে না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজ ইচ্ছানুসারেই বিবাহ করেন না। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, উক্ত নিষিদ্ধ আওতার বাহিরে যে সকল সমাজ আছে তাহারা তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে অনুকরণ করিবার দাসোচিত একটি প্রবৃত্তির বশে তরুণী বিধবাদিগকে অবিবাহিত রাখিবার মনোবৃত্তি পোষণ করে। কিন্তু আরও বিস্তৃত সাংখ্যিক বিবরণী না পাওয়া পর্যন্ত বিধবাগণকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধজ্ঞাপক প্রথা দ্বারা যে কি পরিমাণ অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভবপর নহে। আশা করা যায়, স্যর গঙ্গারাম এবং অন্যান্য যে সকল সঙ্ঘ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা আবশ্যকীয় বিবরণী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিবেন। তখন নিষিদ্ধ শ্রেণীর ভিতর, ধরুন বিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা হিন্দু বিধবাদের সংখ্যা কত তাহা জানাও সম্ভবপর হইবে।

আমার পত্রলেখক সম্ভবতঃ এই নিষেধ সমর্থন করিবার ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমত তাঁহারা যেন তরুণী বিধবাগণের

বিবাহনিষেধরূপ অমঙ্গলকে উপেক্ষা না করেন। একটিও বালবিধবা যতদিন পর্যন্ত থাকিবে ততদিন হিন্দুসমাজ সেই অন্যায় প্রতিকারের দাবী পোষণ করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৯-'২৬]

৫২

বিধবাগণ

আমি এই বিষয়ই সর্বদা বলিয়া আসিতেছি, যে সকল পিতামাতা অল্পবয়সে তাঁহাদের কন্যাগণকে বিবাহদানের পাপ অর্জন করেন, যদি এই কন্যাগণ বিংশতিবর্ষের ন্যূন বয়সে বৈধব্যপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যদি প্রাপ্তবয়সে এই সকল বালিকা বৈধব্যপ্রাপ্ত হয় তবে তাহারা চিরবৈধব্য অবলম্বন করিবে কিংবা পুনরায় বিবাহ করিবে তাহা তাহাদের নিজেদের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। আমাকে যদি কোন নিয়ম নির্ধারণ করিতে বলা হয় তবে আমি এই বলিব যে, পুরুষ এবং নারী একই নিয়মানুযায়ী চলিবে। যদি পঞ্চাশৎবর্ষ-বয়স্ক বিপত্নীক নির্বিবাদে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে তবে সমবয়স্কা বিধবাও পুনরায় পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে। উভয়েই পুনরায় বিবাহ করিয়া পাপ অর্জন করিবে ইহা আমার ব্যক্তিগত মত—কিন্তু সে অন্য কথা। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কিংবা নারী স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যদি বিপত্নীক বা বিধবা

হয় এবং পুনরার বিবাহ করে তবে আইনমতে তাহা পাপজনক বিবেচিত হওয়া উচিত। হিন্দু আইনের এইরূপ কোন সংস্কার আমি সর্বদাই সমর্থন করিব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১০--'২৬]

৫৩

বিপত্নীক ও বিধবাগণ

জনৈক লেখক জানাইতেছেন—

"গত ১৪ই অক্টোবর ইয়ং ইণ্ডিয়াতে প্রকাশিত প্রশ্নাবলী এবং আপনার উত্তর এবং পত্রাবলী আমি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, 'পরিণত বয়সে স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাঁহারা বিপত্নীক বা বিধবা হইয়াছেন তাঁহারা পুনরায় বিবাহ করিলে ঐ কাজ পাপজনক হইবে এই মর্মে যদি হিন্দু আইনের সংস্কার হয়, তাহা আমি সর্বদাই সমর্থন করিব।'

"আমার মতে হিন্দু আইনে এই প্রকারের সংস্কার অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে এবং সমগ্র সমাজের নৈতিক মান বহুপরিমাণে প্রভাবিত করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরুন, কোন পুরুষ বা নারী পরিণত বয়সে বিবাহ করিবার কতিপয় দিবসের মধ্যেই দুর্ভাগ্যক্রমে যদি পত্নী বা পতিহারা হন তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান যে বিবাহিত জীবন উপভোগ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সেই পুরুষ বা নারীকে পুনরায় বিবাহ করিতে দেওয়া হইবে না? যেহেতু তাহারা পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়াছে ইহাই কি এই নিষেধের একমাত্র

কারণ ? হিন্দু আইনের যদি এই প্রকারের সংস্কার হয়, আমার ধারণা সেই পুরুষ বা নারী তাহার অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করিবার জন্য কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করিবে এবং সমাজের সম্পূর্ণ নৈতিক অবনতি ঘটিবে। সেইজন্য আমার মতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পুরুষ বা নারীর নিজ বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।"

—প্রশ্নকর্তাকে যে উত্তর আমি দিয়াছিলাম তাহা আইন-প্রণয়নকারী পুরুষের বিরুদ্ধেই ঘোষণা। পুরুষ তাহার স্বাধীনতা খর্ব হইতে দিবে না। সেইহেতু আমার উত্তরে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পুরুষের পক্ষে যাহা সঙ্গত মনে করা হয়, নারীর পক্ষেও তাহা সঙ্গত হইবে এবং পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে বিপত্নীকের ন্যায় নিজ বিবেচনামতে কাজ করিবার স্বাধীনতা বিধবারও থাকিবে। পরন্তু ইংরেজের নিয়মতন্ত্রের অধীনে প্রচলিত আইনের ন্যায় হিন্দু আইন অপরিবর্তনশীল নয়। ইহা লক্ষ্যের বিষয় যে আমি ইচ্ছা করিয়াই "অপরাধ" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "পাপজনক" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। মানব পরিচালিত রাজ্যে অপরাধের শাস্তি বিহিত রহিয়াছে। পাপের শাস্তি দিতে পারেন একমাত্র ভগবান বা বিবেক-বুদ্ধি। ইহা আমার বিশ্বাস, যদি হিন্দু সমাজ আমার উত্তরের লক্ষ্যীভূত স্তরে উন্নীত হইতে পারে তবে তাহা শুধু উক্ত সমাজের নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রভূত মঙ্গলজনক হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-১১-'২৬]

৫৪

আদর্শের ব্যভিচার

বালবিধবাগণের পুনর্বিবাহসম্বন্ধীয় একখানা চিঠি হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ইয়ং ইণ্ডিয়ার ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'বি. আগ্রা'র প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে বালবিধবাগণের পিতামাতা তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দিবে। যে সকল পিতামাতা শাস্ত্রীয় বিধানমতে তাঁহাদের কন্যাদিগকে দান করেন তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ধর্মের অনুশাসনমতে বিধি-বিধানানুযায়ী তাঁহারা তাঁহাদের জামাতাগণের হস্তে কন্যাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছেন; জামাতার মৃত্যুর পর অপর কাহারও সঙ্গে তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়া পিতামাতার পক্ষে অসম্ভব। যদি সে নিজে ইচ্ছা করে তবে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু পিতামাতা দান-স্বরূপে তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট অর্পণ করে; স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে পুনরায় বিবাহ দিবার অধিকার পৃথিবীতে কাহারও নাই; এবং সেই একই কারণে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার বিধবার নিজেরও নাই। কাজেই যদি তাহার স্বামীর মৃত্যু সময়ে দেওয়া বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সে পুনরায় বিবাহ করে তবে তাহাকে ব্যভিচারিণী এবং মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী বলিতে হইবে। ন্যায় ও যুক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে, বিধবা শিশুই হউক তরুণীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক—তাহার পক্ষে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত পুনরায় বিবাহ করা অসম্ভব। সনাতনীদের মধ্যে প্রচলিত কন্যাদানপ্রথা অনুযায়ী তাহার বিবাহ হইয়াছে। যথার্থ স্বামী এরূপ অনুমতি দিবার কথা ভাবিতেই পারেন না। তিনি বরং তাঁহার পত্নী সমর্থ হইলে চিতারোহণ

করিয়া "সতী" হইবেন ইহাতে আনন্দের সহিত মত দিবেন কিংবা অন্ততঃ তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিবেন ইহা তিনি ইচ্ছা করিবেন ; ভগবানের সেবা ও স্মৃতিপূজা একই জিনিস। হিন্দুবিবাহ এবং বৈধব্য পরস্পর বিভিন্ন নয়—একে অন্যের পরিপূরক। কেবল হিন্দুধর্মের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে সহায়তা করিবার কর্তব্য-জ্ঞান বা ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বামী উপরি-উক্ত ব্যবস্থায় সম্মতি দিবেন।"

—এই প্রকার যুক্তিকে আমি উচ্চ আদর্শের ব্যভিচার বলিয়া মনে করি। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল সন্দেহ নাই ; কিন্তু নারীগণের পবিত্রতা সম্বন্ধে অধ্যধিক চিন্তা তাঁহার সাধারণ ন্যায়-বুদ্ধি ঘোলাটে করিয়া ফেলিয়াছে। ছোট ছোট শিশুদের সম্বন্ধে "কন্যাদানে"র অর্থ কি? সন্তান কি পিতার কোন অস্থাবর সম্পত্তি যে দানের অধিকার পিতার থাকিবে? তিনি সন্তানের রক্ষক ;—মালিক নহেন। যখন তিনি তাঁহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তখন ন্যস্ত ধনের অপব্যবহারের জন্য তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার হারাইতে হয়। অন্য দিকে, যে শিশু দান গ্রহণ করিতে অক্ষম তাহাকে কিছু দান করা যায় কিরূপে? গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যেখানে নাই সেখানে কোন দান করা যায় না। "কন্যাদান" নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত ধর্মানুমোদিত রহস্যাবৃত একটি অনুষ্ঠান। এই সকল শব্দ আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা ধর্ম ও ভাষার অপব্যবহার। তাহা হইলে পুরাণের রহস্যাবৃত ভাষাকেও মূলশব্দানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া

ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, সহস্রশীর্ষ বাসুকীর ফণার উপর পৃথিবী একটি সমতল থালার ন্যায় ধৃত রহিয়াছে এবং ভগবান ক্ষীর-সমুদ্রকে শয্যারূপে আশ্রয় করিয়া বিশেষ আরামে শয়ান রহিয়াছেন।

যে পিতা শিশুকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধের সহিত অথবা বিংশতি-বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের সহিত বিবাহ দিয়া তাহার ন্যায়ের অপব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে তাঁহার কন্যাকে বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে। পূর্বেও আমি একবার লিখিয়াছি যে, এইরূপ বিবাহ প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ বাতিল বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১১-'২৬]

৫৫

বিধবার পুনর্বিবাহ

[৩০-৭-১৯২৭ তারিখে মহীশূরে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে]

আমি শত শত বালিকা দেখিয়াছি, কিন্তু আমার ভ্রমণকালে কদাচিৎ দুই তিনটি তের বৎসরের উর্ধ্ববয়স্কা অনূঢ়া বালিকা আমার চোখে পড়িয়াছে। কোলে বসাইবার যোগ্য বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা ধর্মসঙ্গত ত নহেই, পরন্তু অধর্মের পরাকাষ্ঠা। ভারতের কোন যুবকই ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্কা কোন বালিকাকে বিবাহ না করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে, ইহা আমি

আশা করি। হিন্দুধর্মের বিধবা পবিত্রস্থান অধিকার করেন; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু বিধবা বর্তমান সময়ের হিন্দু বিধবার ন্যায় দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় কখনও ছিলেন না। পনের-বৎসর-বয়স্কা বালিকা বিধবা—ইহা আমি কল্পনাই করিতে পারি না। যে বালিকার পিতামাতা তাহার সম্মতি না লইয়া, কিংবা আর্থিক বা অন্য কোনরূপ সুবিধার জন্য তাহাকে পাত্রস্থ করে, তাহার প্রকৃত বিবাহ হইয়াছে ইহা আমি মনে করি না। এইরূপ কোন বালিকা বিধবা হইলে আমার মতে তাহার পিতামাতার কর্তব্য তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া। অন্য বিধবাদের সম্বন্ধে এই বলা যায়—যদি তাঁহারা মনে করেন যে বিধবার পবিত্র জীবন তাঁহারা যাপন করিতে পারিবেন না তবে সমাবস্থাপ্রাপ্ত বিপত্নীকদিগের ন্যায় তাঁহাদেরও পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিয়াছে। তোমাদের সমাজ এই তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিক এবং তাহার সমাধান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৮-'২৭]

৫৬
ছাত্রদের কর্তব্য

[মাদ্রাজে পচাইয়াপ্পা কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে]

আপনারা বাল্যবিবাহ এবং বালবিধবাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একজন বিদ্বান্ তামিলদেশবাসী ছাত্রদিগকে বালবিধবাগণের বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য লিখিয়াছেন। তিনি

বলেন, ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে এই প্রদেশে বালবিধবাগণের দুর্দশা ও কষ্ট অনেক বেশী। এই উক্তির সত্যতা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। আমার চাইতে আপনারা ইহা ভালরূপে জানেন। কিন্তু আমার চতুষ্পার্শ্বে যে সকল যুবককে দেখিতে পাইতেছি তাহাদের মধ্যে নারীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের ভাব দেখিতে চাই। যদি তোমাদের তাহা থাকিয়া থাকে তবে একটি গুরুতর বিষয় তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আমার ধারণা তোমাদের অধিকাংশই অবিবাহিত এবং তোমাদের মধ্যে "ব্রহ্মচারী"র সংখ্যা নেহাত কম নয়। আমার "নেহাত কম নয়" বলার তাৎপর্য এই যে, আমি ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে জানি; যে ছাত্র তাহার ভগিনীর প্রতি লালসার দৃষ্টিতে চাহিতে পারে তাহাকে আমি "ব্রহ্মচারী" বলিব না। আমি তোমাদিগকে এই পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিতে বলি—"বিধবা বালিকা ভিন্ন কাহাকেও বিবাহ করিব না, বিধবা বালিকা খুঁজিয়া লইব এবং না পাইলে আদৌ বিবাহ করিব না।" এই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং সকলকে এই বিষয় জানাইয়া দাও; পিতামাতা বর্তমান থাকিলে তাঁহাদিগকে কিংবা নিজেদের ভগিনীগণকে ইহা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দাও। সত্যের দিক হইতে আমি তাহাদিগকে বিধবাবালিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, দশ পনের বৎসর বয়সের শিশু, যে তথাকথিত বিবাহে কখনও সম্মতি দেয় নাই কিংবা বিবাহের পর যে তথাকথিত স্বামীর সঙ্গে বাস করে নাই, এবং যাহাকে হঠাৎ বিধবা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সে

কখনও বিধবাপদবাচ্য হইতে পারে না। ইহা বিধবা শব্দের অপব্যবহার, ভাষার কদর্থনা এবং ধর্মের নামে কলঙ্ক। হিন্দুধর্মে "বিধবা" শব্দের সঙ্গে পবিত্র ভাব জড়িত রহিয়াছে। স্বর্গীয়া শ্রীযুক্তা রমাবাই রাণাডের তুল্য প্রকৃত বিধবাকে আমি পূজা করিয়া থাকি। বৈধব্যজীবন কিভাবে পালন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু স্বামী কিরূপ, নয় বৎসরের বালিকা তাহার কিছুই জানে না! এই প্রদেশে যদি এই শ্রেণীর বালবিধবা না থাকিয়া থাকে তবে আমার বক্তব্যের কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু যদি এই শ্রেণীর বালবিধবা থাকিয়া থাকে এবং যদি আমাদিগকে এই অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে চাও তবে বালবিধবাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা তোমাদের পবিত্র কর্তব্য। কোন জাতি যখন এই শ্রেণীর পাপের প্রশ্রয় দেয়, সেগুলি জাতির উপর দৈহিক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। ইহা আমার কুসংস্কার হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমি বিশ্বাস করি। আমার ধারণা, আমাদের এই সকল পাপরাশি একত্রীভূত হইয়া আমাদিগকে দাসত্বের অবস্থায় পাতিত করিয়াছে। যতদূর উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা কল্পনা করা যায় তাহা হাউস অব কমন্স (House of Commons) উপর হইতে তোমাদিগকে দিতে পারে; কিন্তু সেই রাজ্যভার বহন করিবার যোগ্য পুরুষ বা নারী যদি না থাকে তবে উহার কোন মূল্যই থাকে না। প্রকৃতিগত মূল অভাব দূর করিবার জন্য লালায়িত অথচ জোর করিয়া তাহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, এইরূপ একটিমাত্র বিধবাও সমাজে যতদিন থাকিবে ততদিন কি

মনে কর আমরা নিজেকে শাসন করিতে কিংবা ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে যোগ্যতা লাভ করিয়াছি এই কথা বলিতে পারি? উহা ধর্ম নয়—নিছক অধর্ম। হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট ভাবরাশি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিপ্লুত হইয়া আমি এই কথা বলিতেছি। পাশ্চাত্যভাবে প্রণোদিত হইয়া আমি এইরূপ বলিতেছি বুঝিলে ভুল হইবে। ভারতের অনাবিল বিশিষ্ট ভাবরাশি দ্বারা কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকিবার দাবী আমি রাখি। পাশ্চাত্যের অনেক বিষয় আমি নিজস্ব করিয়া লইয়াছি—কিন্তু ইহা পারি নাই। হিন্দুধর্মে এই প্রকার বৈধব্যের কোন অনুশাসন নাই।

আমি বালবিধবাদের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি বালবধূগণের প্রতিও তাহা যুক্তিযুক্তভাবে প্রযোজ্য। তোমাদের কামনা অন্ততঃ এই পরিমাণে দমন করিতে হইবে যে, ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্কা কোন বালিকার পাণিগ্রহণ করিবে না। আমার ক্ষমতা থাকিলে বিবাহের জন্য বিংশতি বৎসরই বালিকাদের ন্যূনতম বয়ঃক্রম নির্ধারিত করিতাম। এমনকি, ভারতবর্ষেও কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রম কম বলিয়াই গণ্য হওয়া উচিত। বালিকাদের অকালপরিপক্কতার জন্য আমরাই দায়ী,—ভারতবর্ষের জলবায়ু দায়ী নহে। কারণ বিংশতিবর্ষবয়স্কা বহু নির্মল ও পূতশীলা বালিকাকে আমি জানি যাহারা চতুর্দিকে প্রবহমাণ ঝঞ্ঝাবাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম। অল্পবয়সে তাহাদের এই বুদ্ধিবিকাশের জন্য আমাদের আত্মপ্রসাদের কোন হেতু নাই।

কোন কোন ব্রাহ্মণ ছাত্র আমাকে বলিয়াছে যে তাহারা এই নিয়ম মানিয়া চলিতে অক্ষম ; কারণ তাহারা ষোড়শবর্ষবয়স্কা ব্রাহ্মণ বালিকা পাইবে না ; অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণই ঐ বয়স পর্যন্ত কন্যাগণকে অনূঢ়া রাখেন এবং সাধারণতঃ দশ, বার এবং তের বৎসরেই ব্রাহ্মণ কুমারীগণের বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি আমার উত্তর এই—"যদি নিজেকে সংযত করিতে না পার তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিও না ; শৈশবে বিধবা হইয়াছে এইরূপ ষোল বৎসরের কোন বয়স্থা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর ; যদি এই বয়সের কোন ব্রাহ্মণ বিধবা না পাও তবে তোমার পছন্দমত যে কোন বালিকার পাণি-গ্রহণ কর। আমি জোরের সহিত বলিতে পারি, যে যুবক দ্বাদশ বৎসরের বালিকাকে ধর্ষিত না করিয়া বরং নিজ জাতির বাহিরে বিবাহ করা উপযুক্ত মনে করে, হিন্দুর দেবতা তাহাকে মার্জনা করিবেন। যখন তোমার হৃদয় পবিত্র নয় এবং তোমার রিপুসকল তুমি দমন করিতে পার না তখন আর তোমাকে শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত করা যায় না। তোমাদের শিক্ষায়তনকে প্রাচীনতম বলিয়া আখ্যা দিয়াছ। আমি এই ইচ্ছা করি যে তোমাদের জীবনের ধারা সেই বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে ; এবং সেখান হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইবে তাহারা চরিত্রবলে পুরোভাগে স্থানলাভ করিবে। চরিত্র-বল ছাড়া শিক্ষার মূল্য কি ? এবং সাধারণ ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা না থাকিলে চরিত্রেরই বা মূল্য কি ? আমি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। আমি বর্ণাশ্রমধর্ম সমর্থন করি। কিন্তু

যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অস্পৃশ্যতা, বালবৈধব্য এবং কুমারী-ধর্ষণ অনুমোদন করে, তাহার পূতিগন্ধে আমার নাসিকা কুঞ্চিত হয়—আমি প্রাণে জ্বালা অনুভব করি। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়—তাহার উপহাসমাত্র। সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, সেখানে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধও নাই। ইহা নিছক পশুর ধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্ম উচ্চতর উপাদানে গঠিত। আমার এই কয়েকটি উক্তি তোমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীরভাবে প্রবেশ করুক ইহা আমি চাই। আমি বক্তৃতা দিবার সময় বালকদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি; আমার হৃদয় উন্মুক্ত করিবার সময় একটি হাসিও যদি আমার কানে আসে আমি ব্যথা পাই। আমি তোমাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে আসিয়াছি—বুদ্ধিবিকাশের জন্য কিছু বলিতে আসি নাই। তোমরাই দেশের আশার স্থল এবং আমি যাহা বলিয়াছি তাহা তোমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা জরুরী বিষয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯'২৭]

৫৭

ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ

বাঙ্গালার কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখিয়াছেন—

"মাদ্রাজের ছাত্রদিগকে শুধু বিধবা বালিকাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য যে সকল উপদেশ ও উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়াছি। আমার বিনীত প্রবল প্রতিবাদ পাঠাইতেছি।

আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে বলিয়া ভারতের নারী পৃথিবীতে অতি উচ্চ অথবা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই প্রকারের উপদেশ বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য পালনের মানসিক গতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এবং সাংসারিক সুখের পঙ্কিল পথে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া এক জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা মুক্তিলাভের আশাও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিবে। বিধবাদের প্রতি এই প্রকারের প্রবল সহানুভূতি তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিবে এবং কুমারীদের প্রতিও অবিচার করা হইবে ; কারণ বর্তমানে কুমারীদের বিবাহ-সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মত, হিন্দুদের দেহান্তরপ্রাপ্তি, পুনর্জন্ম, এমনকি মুক্তিসম্বন্ধীয় মতবাদ উল্টাইয়া দিবে এবং আমরা যে সকল সমাজকে পছন্দ করি না হিন্দু সমাজকে সেই সকল সমাজের সমপর্যায়ে টানিয়া আনিবে। আমাদের সমাজে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু হিন্দু আদর্শের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অন্যান্য সমাজ এবং আদর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়া যতদূর সম্ভব উন্নতির দিকে যাইতে পারি তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, বেহুলা, সাবিত্রী, সীতা এবং দময়ন্তীর আদর্শ হিন্দুসমাজকে পরিচালিত করিবে এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী সমাজকে আমাদের চালাইতেই হইবে। সেইজন্য আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এই সকল জটিল সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে আপনি মত প্রকাশ করিতে বিরত থাকিবেন এবং সমাজ যাহা করা ভাল মনে করে তাহা সমাজকে করিতে দিবেন।"

—এই ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে আমার মতের পরিবর্তন ঘটে নাই বা আমার কোন অনুশোচনাও হয় নাই। ব্রহ্মচর্য কি তাহা জানেন এবং তাহা পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্না একজন বিধবাও আমার উপদেশে তাহার সংকল্প হইতে

বিচ্যুত হইবেন না। পক্ষান্তরে, যে সকল অল্পবয়স্কা বালিকা তাহাদের তথাকথিত বিবাহ-উৎসবের সময় বিবাহ কি তাহা পর্যন্ত জানিত না, আমার উপদেশমতে চলিলে নিশ্চয়ই তাহাদের দুঃখভার অনেকটা লাঘব হইবে। পবিত্র ভাবরাশির সহিত জড়িত "বিধবা" শব্দটি এই সকল বালবিধবা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা শব্দার্থের অত্যন্ত গুরুতর অপব্যবহার। লেখক যে উদ্দেশ্য লইয়া পত্র দিয়াছেন ঠিক সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি দেশের যুবকগণকে এই শ্রেণীর তথাকথিত বিধবাগণকে বিবাহ করিতে কিংবা আদৌ বিবাহ না করিতে উপদেশ দিতেছি। বিবাহ-অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় উহাকে বালবৈধব্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা।

ব্রহ্মচর্য পালন করিলে বিধবাগণ মোক্ষলাভ করে, বাস্তব-ক্ষেত্রে এই উক্তির কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। পরম আনন্দ লাভ করিতে হইলে শুধু ব্রহ্মচর্য পালন ছাড়া আরও অনেক জিনিসের দরকার। যে ব্রহ্মচর্য জোর করিয়া উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহার কোনও মূল্য নাই; তাহা প্রায়শঃ গোপন পাপেরই সৃষ্টি করে এবং যে সমাজে এই পাপ প্রবেশ করে তাহার নৈতিক দিক সম্পূর্ণরূপে ধ্বসিয়া পড়ে। লেখক যেন মনে রাখেন আমি নিজ পর্যবেক্ষণ হইতে এই বিষয় লিখিতেছি।

যদি আমার উপদেশের ফলে কুমারী বিধবাগণের প্রতি সাধারণ সুবিচার করা হয় এবং তজ্জন্য অপরাপর কুমারীগণ পরিণত বয়সে উপনীত হইবার এবং জ্ঞানের পরিপক্বতা লাভ করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হয় তবে আমি বাস্তবিক সুখী হইব,

এবং তাহা হইলে শেষোক্ত কুমারীগণকে অকালে পুরুষের লালসার নিকট বিক্রীত হইতে হইবে না।

জন্মান্তর-পরিগ্রহ, পুনর্জন্ম বা মুক্তি এই সকল মতবাদের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন বিবাহ সম্বন্ধে কোন মত আমি পোষণ করি না। পাঠক জানিয়া রাখিবেন, যে সকল লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে আমরা ঔদ্ধত্যের সহিত সমাজে নিম্নশ্রেণীভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহে কোন বাধা নাই। যদি বৃদ্ধ বিপত্নীকগণের পুনরায় বিবাহ এই মতের বিরুদ্ধে না যায় তবে অন্যায়ভাবে বিধবারূপে আখ্যাত বালিকাবিধবাগণের প্রকৃত বিবাহ কিরূপে উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে যায় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। লেখকের অবগতির জন্য আমি বলিতে পারি জন্মান্তর-পরিগ্রহবাদ এবং পুনর্জন্মবাদ আমার নিকট দৈনিক সূর্যোদয়ের ন্যায় প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিভাত, শুধু মতবাদরূপে নহে। মুক্তিও সত্য, এবং তাহা লাভ করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং এই সকল কুমারী বিধবাদের প্রতি যে অবিচার হইতেছে তাহা আমি মুক্তি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা হইতেই সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। আমাদের বর্তমান ক্লীবত্বের যুগে লেখকের উল্লিখিত সীতা এবং অন্যান্য অমর নামাবলীর সহিত এই সকল আধুনিক ব্যথিত কুমারী বিধবাগণের নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সর্বশেষে, হিন্দুধর্মে প্রকৃত বৈধব্যের উচ্চপ্রশংসা রহিয়াছে এবং তাহা সম্পূর্ণ ন্যায্য। তৎসত্ত্বেও আমি যতদূর জানি, বৈদিক যুগে বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল

এইরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। প্রকৃত বৈধব্যের বিরুদ্ধে আমি এই যুদ্ধ ঘোষণা করি নাই। ইহার নৃশংস বিকৃত চিত্রের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ। আমি যে সকল বালিকার কথা বলিতেছি তাহাদিগকে বিধবা বলিয়া গণ্য না করাই ভাল! নারীদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞান কণিকাংশেও আছে এইরূপ প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য এই সকল বিধবাকে তাহাদের অসহনীয় দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত করা। আমি বিনীতভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত প্রত্যেক হিন্দু যুবককে পুনরায় উপদেশ দিতেছি যে, এই সকল কুমারীকে অন্যায়ভাবে বিধবা বলা হয় এবং তাহারা যেন এই সকল কুমারী ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ না করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০'২৭]

৫৮

বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা

একজন লিখিয়াছেন—

"একটি প্রবন্ধের কোন স্থলে আপনি বলিয়াছেন, 'যেখানে বিবাহ ধর্মমূলীয় সংস্কার, সেখানে মিলন দৈহিক মিলন নয়—তাহা আত্মার অবিচ্ছেদ্য মিলন, একের মৃত্যুতেও তাহার বিলোপ হয় না। যেখানে আত্মার প্রকৃত মিলন হয় সেখানে কোন বিধবা বা বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ অচিন্তনীয়, অসঙ্গত এবং অন্যায়।'

"একই প্রবন্ধের অন্য অংশে আপনি বলিয়াছেন, 'কুমারী বিধবা-গণের পুনর্বিবাহ শুধু ঈপ্সিতই নয় কিন্তু যে সকল পিতামাতার এইরূপ

বিধবা কন্যা রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে পুনর্বিবাহ অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

"এই দুইটি মতের সামঞ্জস্য কোথায়?"

—এই দুই মতের সামঞ্জস্য করিতে কোন গোলমাল আমি দেখি না। অজ্ঞ বা হৃদয়হীন পিতামাতা কোন ক্ষুদ্র বালিকাকে তাহার মঙ্গলের দিকে না চাহিয়া, তাহার অজানা মতে এবং তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে দান করিয়া দিলে তাহাকে আদৌ বিবাহ বলা যাইতে পারে না। উহা নিশ্চয়ই ধর্ম্মমূলীয় সংস্কার নয়, এবং সেইজন্যই এইরূপ বালিকার পুনর্বিবাহ কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ স্থলে "পুনর্বিবাহ" শব্দ ব্যবহার করাই ভুল। বিবাহের প্রকৃত অর্থ ধরিলে এই কুমারীর বিবাহ আদৌ হয় নাই। সেইজন্য তাহার তথাকথিত স্বামীর বিয়োগ হইলে পিতামাতার পক্ষে তাহার জন্য একটি উপযুক্ত জীবনসঙ্গী অনুসন্ধান করা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অবশ্য-করণীয় বিষয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬.৯'২৯]

৫৯

অসহায় বিধবাগণ

জনৈক শোকার্ত বন্ধু একখানা মর্মস্পর্শী চিঠিতে সপ্তদশ-বর্ষীয়া একটি বালিকার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন; কোয়েটা শহরে তাহার স্বামী, দুই মাসের শিশু, শ্বশুর এবং

দেবর অর্থাৎ স্বামীর ঘরের সবাইকেই সে হারাইয়াছে। লেখক আরও বলিয়াছেন যে, বালিকাটি শুধু পরিধানবস্ত্র লইয়া প্রায় অক্ষতদেহে রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মেয়েটি তাঁহার খুল্লতাত ভগিনী এবং তাহার সম্বন্ধে কি করিবেন এবং তাহাকে কিভাবে সান্ত্বনা দিবেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বালিকাটির পায়ে চোট লাগিয়াছে, যদিও সৌভাগ্যক্রমে হাড় ঠিকই আছে। লেখক এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন—

"আমি তাহাকে তাহার মা'র নিকট লাহোর শহরে রাখিয়াছি। আমি তাহার মাকে ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে সন্তর্পণের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া যায় কিনা। কেহ কেহ সহানুভূতির সহিত সেই কথা শুনিয়াছেন—কেহ কেহ এইরূপ প্রস্তাব রোষভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার কোন সন্দেহ নাই যে, আমার এই খুল্লতাত ভগিনীর ন্যায় বহু বালিকা অনুরূপ দুর্গতির ফলে নিপীড়িত হইয়াছে। আপনি এই সকল নিরুপায় বিধবাদিগকে দুই একটি আশ্বাসবাণী দিতে পারেন না কি?"

—যুগব্যাপী সংস্কারসমূহ যে সকল বিষয়ের সহিত জড়িত, সেখানে আমার লেখনী বা আমার কথা কি করিতে পারিবে আমি জানি না। আমি বার বার বলিয়াছি, প্রত্যেক বিপত্নীকের ন্যায় প্রত্যেক বিধবার পুনরায় বিবাহ করিবার সমান অধিকার রহিয়াছে। স্বেচ্ছায় বৈধব্যজীবন যাপন হিন্দুধর্মের অমূল্য অবদান এবং জোর করিয়া সেই অবস্থায় রাখা এক অভিশাপ। এবং আমি ইহা বিশেষভাবে অনুভব করি যে, অনেক তরুণী বিধবা, যদি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যায়, পুনরায়

বিবাহ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না; হিন্দু জনমতের ভয় তাহাদিগকে যতটা নিরস্ত করে বাহিরের বাধাবিঘ্নের ভয় ততটা করে না। কোয়েটা-প্রত্যাগত এই শোকার্তা ভগিনীর ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত সকল তরুণী বিধবাকে পুনরায় বিবাহ করিবার প্রেরণা দেওয়া উচিত এবং তাহারা বিবাহ করিতে চাহিলে সমাজ তাহাদের উপর কোন দোষারোপ করিবে না এই বিষয়ে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে এবং তাহাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এই কাজ করা সম্ভবপর নয়। যাঁহাদের আত্মীয়গণ বিধবা হইয়াছে এইরূপ সংস্কারকগণ ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ করিতে পারেন; তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতর সম্ভ্রমের সহিত, সংযতভাবে প্রবল আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং যখনই কৃতকার্য হইবেন সেই ঘটনাকে সর্বসাধারণের সম্মুখে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিবেন। শুধু এই উপায়েই ভূমিকম্পের সময় যে সকল বালিকা বিধবা হইয়াছে তাহাদিগের দুঃখ বস্তুতঃ দূর করিবার ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে। এই দুর্ঘটনার স্মৃতি লোকের মনে জাগ্রত থাকিতে থাকিতে সর্বসাধারণের সহানুভূতি এই বিষয়ে আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হইতে পারে। এবং যদি বৃহদাকারে সংস্কার একবার আরম্ভ হয় তবে স্বাভাবিক নিয়মে যাহারা বিধবা হইয়াছে তাহারাও বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে সহজেই তাহা করিতে পারিবে।

[হরিজন, ২২-৬-'৩৫]

৬০

বাধ্যতামূলক বৈধব্য

সিসিলীদ্বীপবাসী দিওদোরাস (Diodorus) জুলিয়স সিজারের (Julius Cæsar) সমসাময়িক। তিমি বিশ্বের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "সতী" এবং বৈধব্য সম্বন্ধে উক্ত পুস্তক হইতে নিম্নের তথ্যপূর্ণ অংশ প্যারীলাল উদ্ধার করিয়াছে—

"ভারতবাসীদের মধ্যে প্রাচীনকালে এই আইন ছিল যে যখন তরুণ যুবকগণ ও কুমারীগণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিত তাহারা পিতামাতার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ করিত। কিন্তু অপরিণতবয়স্কদের মধ্যে যখন বিবাহ হইত প্রায়ই দেখা যাইত নির্বাচনে ভুল হইয়াছে। যখন উভয় পক্ষ অনুতপ্ত হইত, বহু নারী ভ্রষ্টা এবং ব্যভিচারিণী হইয়া অন্য লোকের সঙ্গে প্রণয় করিত। অবশেষে প্রথম নির্বাচিত স্বামীকে তাহারা যখন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিত অথচ প্রকাশ্যভাবে ভদ্রতার খাতিরে তাহা করিতে পারিত না—বিষপ্রয়োগে তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করিত। তাহাদের দেশে প্রাণান্তকারী শক্তিশালী নানাপ্রকারের ঔষধাদি বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং জীবননাশ করিবার জন্য বিষ তাহারা সহজেই সংগ্রহ করিয়া থাকে; এই সকল বিষের কতকগুলি গুঁড়ার আকারে খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যখন এই দুষ্ট প্রথা প্রায় সর্বত্র প্রচলিত হইয়া বহু জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলে এবং ইহা প্রতীত হয় যে অপরাধীর শাস্তিবিধান করিয়াও অন্যান্য বিবাহিতা নারীদিগকে তাহাদের পাপজীবন হইতে

নিবৃত্ত করা যায় না, তখন একটি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। সেই আইনমতে ইহা প্রচারিত হয় যে—স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা না থাকিলে অথবা পূর্বে সন্তানের জননী না হইয়া থাকিলে, মৃত স্বামীর সঙ্গে তাহাকে পুড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং যদি সে আইন মানিতে ইচ্ছা না করে তবে তাহাকে আমৃত্যু বৈধব্যবরণ করিতে হইবে এবং তাহাকে পাপিষ্ঠা গণ্য করিয়া যজ্ঞ এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ হইতে চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত করা হইবে।

—যদি উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশে দুইটি নৃশংস প্রথার উৎপত্তির সঠিক বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকে তবে আমাদের উপর আইন জারী করিয়া সতীদাহপ্রথা নিবারিত হওয়ায় ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হয়। যে সকল বালিকা বিবাহ কি তাহা পর্যন্ত জানে না হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে বৈধব্য অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। বাহিরের কোন আইন-কানুন দ্বারা সমাজকে সংশোধন করা যাইবে না। ইহার সংস্কার দুইভাবে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হিন্দুদের ভিতর পূর্বের সংস্কার দূর করিয়া প্রবল জনমত গঠন করা এবং দ্বিতীয়তঃ, কর্তব্যবোধে বালবিধবাগণকে বিবাহ দেওয়া। এ বিষয়ে তাহাদের পিতা-মাতাকে অবহিত হইতে হইবে। যেখানে বালিকাদের সম্মতির অভাব, সেখানে তাহারা শিক্ষাদ্বারা তাহাদের মন এইভাবে গঠিত করিবে, যেন তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের বিবাহ করাই সঙ্গত। ইহা অল্পবয়স্কা মেয়েদের সম্বন্ধেই খাটে; ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন, যেখানে তথাকথিত বিধবারা পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়,

তাহাদিগকে শুধু এই বলিতে হইবে যে ঠিক অনূঢ়া কুমারীদের ন্যায় তাহারাও স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে। বালিকারা, এমনকি, পরিণতবয়স্কা নারীগণও ভ্রমবশতঃ তাহাদের রূপার বা সোণার হার এবং অঙ্গুরীয়ককে অঙ্গের ভূষণ বলিয়া মনে করে; সেইরূপ যে সকল লোকের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ এবং যাহারা এই সকল বিধবাকে ভুলক্রমে সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ মনে করে এবং আদর করে তাহাদের মোহান্ধকার দূর করা কঠিন।

[হরিজন, ২০-৩-'৩৭]

৬১

বিংশ শতাব্দীর 'সতী'

[বোম্বাইয়ের একটি গুজরাটী কাগজে সস্ত্রীক একজন "সতী" হইয়াছে, এরূপ ঘটনা প্রকাশিত হয়। জনৈক মহিলা ঘাটকোপর হইতে গান্ধীজীকে এই বিষয়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী এই বিষয়ে গুজরাটী ভাষায় যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার তরজমা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।]

আমি আশা করি সংবাদপত্রে ঘটনাটি যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। কথিত মহিলা অসুখে বা কোন আকস্মিক কারণে মারা গিয়া থাকিবেন—আত্মহত্যা করিয়া নয়। প্রাচীনেরা "সতী"র যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অদ্যাপি প্রচলিত। স্বামীর প্রতি যাঁহার অচলা ভক্তি এবং ভালবাসা, স্বামীর জীবদ্দশায় এবং তাঁহার অভাবে ও নিঃস্বার্থ সেবাদ্বারা

যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ, চিন্তায়, বাক্যে এবং কর্মে যিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র—তিনিই "সতী" পদবাচ্য। স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ উন্নত শিক্ষার পরিচায়ক নহে বরং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই ইহা সূচিত করে। আত্মা অমর, অবিকারী এবং সর্বগত। নশ্বর দেহের সহিত আত্মার বিনাশ হয় না। পার্থিব বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করে। অগণিত সাধু, সন্ত ও ঋষিগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে যে কেহ অদ্যাপি ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। এই সকল সত্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আত্মহত্যার সপক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে ?

পুনশ্চ, প্রকৃত বিবাহ দ্বারা দৈহিক মিলনই শুধু বুঝা যায় না। আত্মার মিলনও ইহা দ্বারা সূচিত হয়। যদি বিবাহ দ্বারা শারীরিক সম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু বুঝা না যায় তবে শোকার্তা বিধবা তাহার স্বামীর চিত্রপট বা মোমের প্রতিমূর্তি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু আত্মবিনাশ দ্বারা কোন ফললাভ করা যায় না। ইহা দ্বারা মৃতের জীবন ফিরিয়া পাওয়া যায় না ; পক্ষান্তরে, প্রাণিজগৎ হইতে আরও একটি প্রাণীকে বিনষ্ট করা হয়।

দৈহিক মিলনের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক মিলনই বিবাহের লক্ষ্য এবং আদর্শ। বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম সঞ্জাত হয় তাহা স্বর্গীয় বা বিশ্বপ্রেম অর্জনের প্রথম স্তর। সেইজন্যই মীরা গাহিয়াছিলেন—

"একমাত্র ঈশ্বরই আমার পতি—আর কেহ নয়।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, "সতী" রমণী বিবাহকে পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবেন না; পরন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে স্বামীর প্রাণের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবেন যে বিবাহ নিঃস্বার্থ এবং আত্মত্যাগমূলক সেবার আদর্শে পৌঁছিবার উপায়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার চিতারোহণ করিলেই তাঁহার "সতীত্ব" প্রমাণিত হইবে না। বিবাহকালে সপ্তপদী ক্রিয়ার সময় তিনি স্বামীর নিকট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন জীবনের প্রতি মুহূর্তে স্বামীর, স্বামীর পরিজনের এবং দেশের সেবাতে আত্মত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারা তিনি তাঁহার "সতীত্ব" প্রমাণ করিবেন। শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বিষয় তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষুদ্র পারিবারিক স্বার্থ ও বিষয়াদি চিন্তা করিয়া তিনি নিজেকে জড়িত করিবেন না। জ্ঞানলাভের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা তিনি গ্রহণ করিবেন; আত্মত্যাগ এবং আত্মসংযম অনুশীলন করিয়া সেবা করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং স্বামীর সঙ্গে নিজকে সম্পূর্ণরূপে এক করিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত নিজকে মিশাইতে শিক্ষা করিবেন।

এই শ্রেণীর "সতী" স্বামীর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন না। তাঁহার কার্য দ্বারা তাঁহার স্বামীর আদর্শ ও গুণাবলী জীবন্ত রাখিতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিবেন এবং এইরূপ করিলে তাঁহার স্বামী অমরত্বের গৌরবলাভ করিবেন। তিনি বুঝিতে সক্ষম হইবেন যে, তাঁহার স্বামীর আত্মার বিনাশ

হয় নাই, তাহা এখনও জীবিত এবং ইহার পর তিনি আর পুনরায় বিবাহ করিবার বিষয় চিন্তাও করিবেন না।

পাঠক কৌতূহলী হইয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—"আপনার অঙ্কিত 'সতী' বিষয়বাসনা বা যৌনক্ষুধা দ্বারা স্পৃষ্ট নহে। সন্তানলাভের ইচ্ছা তাঁহার থাকিতে পারে না। তিনি আর বিবাহ করিবেন কেন?" ইহার উত্তর এই—বর্তমান হিন্দু সমাজে অধিকাংশ স্থলেই বিবাহ পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক নির্বাচনের উপর নির্ভর করে না। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বর্তমান যুগবিপর্যয়ের মধ্যে ধর্ম ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং আত্মসংযমের সহায়তার জন্য বিধবার বিবাহ হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ আমি নিজে কয়েকজন নারীর বিষয় জানি—তাঁহারা বিবাহের সময় পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ছিলেন না; পরে তাঁহারা পুরামাত্রায় সতীত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেম যে উক্ত আদর্শ অনুযায়ী চলিবার পক্ষে বিবাহিত জীবনই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমি "সতী"র যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছি তাহা শুধু নিখুঁত আদর্শমাত্র নয়, ভাবরাজ্যের বাহিরেও তাহার স্থান আছে; এই বাস্তব জগতে সেই আদর্শ অনুযায়ীই আমাদিগকে চলিতে হইবে এবং জীবনে তাহা দেখাইতে হইবে।

আমি ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে, সাধারণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে সকল নারী "সতীর" আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবেন তাঁহাদিগকে সন্তানের জননীও হইতে হইবে। সেইজন্য

উপরিউক্ত গুণাবলীর সঙ্গে সন্তান লালনপালনের জ্ঞানও তাঁহাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। এবং এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের প্রকৃত সেবিকারূপে জীবন যাপন করিতে পারিবেন।

স্ত্রীর সম্বন্ধে উপরে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সমভাবে স্বামীর প্রতিও প্রযোজ্য। যদি স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত ও তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিসম্পন্ন হইতে হয়, স্বামীকেও তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন হইতে হইবে। একই রকম মাপকাঠি দিয়া উভয়কে মাপিতে হইবে—একই আদর্শে উভয়কে বিচার করিতে হইবে। তথাপি কোন স্বামী মৃতা স্ত্রীর চিতারোহণ করিয়াছেন ইহা আমরা কখনও শুনি নাই। সেইজন্য ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, স্বামীর মৃত্যুতে বিধবার সহমরণের প্রথা অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং পুরুষের অন্ধ একগুঁয়েমি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কোন সময়ে এই প্রথার সার্থকতা ছিল ইহা প্রমাণিত হইলেও বর্তমান যুগে ইহা বর্বরতার পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গিনী—তাঁহার দাসী নন; তাঁহাকে স্বামীর সহযোগিনী, বন্ধু এবং অর্ধাঙ্গিনী বলা হইয়া থাকে। স্বামীর অধিকার এবং কর্তব্যাদির তিনি সমান অংশীদার। পরস্পরের প্রতি এবং জগতের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্যসমূহও সেইজন্য এক এবং পারস্পরিক হইতে বাধ্য।

কাজেই আমি এই ভগিনীর কথিত সহমরণ নিষ্ফল মনে করি। নিশ্চয়ই ইহা অনুকরণের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নয়। আমাকে

সম্ভবতঃ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, আমি কি তাহার মৃত্যু-বরণের সাহসকেও অন্ততঃ প্রশংসা করি না ? সত্য কথা বলিতে গেলে, আমি উত্তরে "না" বলিব। এমনকি দুষ্কৃতকারীদের মধ্যেও আমরা কি সাহসের পরিচয় পাই না ? তথাপি কেহ কখনও তাহাদিগকে সেজন্য প্রশংসা করে নাই। আত্মহত্যা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিহীন প্রশংসা দ্বারা একটিও অজ্ঞ ভগিনীকে অজ্ঞাতসারে পথভ্রষ্ট করিবার পাপ আমি অর্জন করিতে যাইব কেন ? "সতীত্ব" পবিত্রতার চরমোৎকর্ষ। মৃত্যুবরণ করিয়া এই পবিত্রতা লাভ করা যায় না। সর্বদা অনুশীলন ও অবিচল আত্মাহুতি দ্বারাই কেবল ইহা অর্জন করা যায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৫-'৩১]

৬২

অন্ধ দেশে

১

উদ্দীপনাময় বিষয়সকল ছাড়িয়া এখন আমি প্রাণঘাতী নূতন নূতন বিষয়ের মধ্যে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছি। কোকনদে মহতী জনসভার অব্যবহিত পরে রাত্রি নয় ঘটিকার সময় ডাকবাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিবার পর কতিপয় নারী ও বালিকা আমার সহিত সাক্ষাৎ করে। প্রবেশকালে আলো অতি ক্ষীণ ছিল। তাহাদের চালচলন ও চাহনির ভিতর অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করিলাম। আমার সাধারণ অভ্যর্থনা-

বাণী—"আপনারা সূতা কাটেন কিনা? তিলক স্বরাজ ফণ্ডে আপনারা আমাকে কি দিবেন?"—এই বাক্যগুলি আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। পক্ষান্তরে আমার আমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরা কারা?" তিনিও জানিতেন না ইহারা কাহারা? জিজ্ঞাসা করার পর সঙ্কুচিতভাবে তাহারাই উত্তর দিল, "আমরা নর্তকী।" আমার মনে হইল আমি যেন ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছি। গৃহস্বামী প্রবোধচ্ছলে আমাকে বলিলেন, তাহাদের এই জীবনে প্রবেশকালে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হয়। আমার নিকট ইহা আরও গুরুতর বিষয় হইয়া পড়িল। এতদ্দারা এই ঘৃণ্য বিষয়টিকে বিশুদ্ধতার রূপ দেওয়া হইল। আমি জেরা করায় তাহারা অত্যন্ত নম্রভাবে বলিল তাহারা আমাকে "দর্শন" করিতে আসিয়াছে। "তাহারা অন্য কোন কাজ করিতে প্রস্তুত আছে?" "হাঁ, যদি তদ্দারা আমাদের জীবিকার উপায় হয়।" ঠিক তখনই তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া বিষয়টির সমাধান করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। পুরুষজাতি সম্বন্ধে আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলাম। পরবর্তী বিশ্রামস্থান রাজমাহেন্দ্রীতে আমি পরের দিন প্রাতে খোলাখুলি বলিলাম, অন্ধ্রদেশে এই একটিমাত্র অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ভারতের অবশিষ্টাংশেও এই পাপের স্রোত কোন না কোন আকারে প্রবাহিত হইতেছে। যদি আত্মশুদ্ধি দ্বারা স্বরাজলাভ করিতে হয় তবে আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, আমরা যেন নারীকে আমাদের কামনার বস্তু না করি। এই

ক্ষেত্রে দুর্বলকে সর্বদা রক্ষা করিবার বিধি বিশেষ জোরের সহিত প্রযোজ্য। আমার মতে নারীগণের সতীত্বরক্ষা, গোরক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মাতা ভগিনী ও কন্যাগণকে আমরা যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখি, যদি সমগ্র নারীজাতিকে আমরা সেইভাবে দেখিতে না শিখি, তবে ভারতবর্ষ পুনর্জীবিত হইবে না। যে সকল পাপ আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে এবং আমাদিগকে পশুতে পরিণত করে, সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-৪-'২১]

অন্ধ্র দেশে

২

রাজমাহেন্দ্রীতে একটি গুরুতর বিষয়ে আমার যাহা বলিবার ছিল সমস্তই বলিয়াছি এবং আমি আশা করি, কোন তেলেগু বন্ধু এই বক্তৃতাটি সংকলন ও তরজমা করিয়া শত শত দেশবাসীকে চতুর্দিকে বিতরণ করিবেন। গতরাত্রে প্রায় নয় ঘটিকার সময় কোকনদে নর্তকী বালিকারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তাহারা কে এবং কি করে এই বিষয়ে যখন সম্পূর্ণ অবগত হইলাম তখন মনে হইল আমি যেন ভূগর্ভে তলাইয়া যাইতেছি। এই পাপ আমাদের মধ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের কামনার ইন্ধন যোগাইবার জন্য একটি ভগিনীও

লজ্জাকর এবং ঘৃণ্য জীবন যাপন করিবে ইহা সঙ্গত নয়। আত্ম-শুদ্ধির এই আন্দোলনে এই সকল ভগিনীকে আমাদের নিজ ভগিনী ও কন্যার ন্যায় বিবেচনা করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। এই উদ্ধত গবর্নমেন্ট আমাদের উপর যে অত্যাচার করে তাহার যাতনা আমরা অনুভব করিয়া থাকি; ভারতবর্ষের একটি বালিকারও জীবনের সর্বনাশ সাধন করিয়া আমরা যেন ততোধিক অত্যাচার না করি। ভাই ভগিনীগণ, আমি আপনাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, যত শীঘ্র সম্ভব আপনারা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি পাঠাইবেন যে দেশের এই অংশে একটিও নর্তকী আর নাই। যে সকল ভগিনী আমার পশ্চাতে বসিয়া আছেন তাঁহাদের উপর আমি এই ভার ন্যস্ত করিতেছি যে, তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া প্রত্যেকটি নর্তকীকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং তাহা হইলে পুরুষেরা যে অন্যায় করিতেছে লজ্জাবনতমুখে তাহারা তাহা পরিহার করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৫-'২১]

৬৩

সমাজে নারীর স্থান

কটক হইতে শ্রীমতী সরলাদেবী লিখিতেছেন—

"আপনি কি স্বীকার করেন না যে অস্পৃশ্যতার ন্যায় নারীদের প্রতি আচরণও নিন্দনীয় ব্যাধিস্বরূপ? আমি যে সকল যুবক 'স্বদেশসেবী'র সঙ্গে মিশিয়াছি তাহাদের শতকরা নব্বই জনের

মনোভাব পশুর তুল্য। ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনকারিগণের কয়জন নারীগণকে ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করে না? আন্দোলনে জয়লাভ করিতে হইলে আত্মশুদ্ধি সর্বাগ্রে প্রয়োজন; নারীদিগের প্রতি মনোভাব পরিবর্তিত না হইলে আত্মশুদ্ধি কি সম্ভবপর?"

—অস্পৃশ্যতার ন্যায় নারীদিগের প্রতি আচরণ একই প্রকার "নিন্দনীয় ব্যাধি", এই মত আমি সমর্থন করিতে পারি না। শ্রীমতী সরলাদেবী এই দুর্নীতি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাও সমর্থন করা যায় না। কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া সুফল পাওয়া যায় না। তবে আমি অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি যে, প্রকৃত স্বরাজলাভের জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইলে নারীগণের প্রতি, তাঁহাদের পবিত্রতার প্রতি পুরুষেরা যেরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা হইতে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব অনুশীলন করিতে হইবে। মিস্টার অ্যান্‌ড্রুস্‌ এই মহিলার উক্তি হইতে অধিকতর সত্যকথা ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন—"পতিতা ভগিনীদের লজ্জাকর অবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হইবার দুঃসাহস আমাদের নাই। কতিপয় পথভ্রষ্টা ভগিনী অসহযোগী কর্মীদের ভোগ্যরূপে নির্দিষ্টা, এই কথা বাহবার সহিত বলিতে পারে এমন কোন অসহযোগী মিলিতে পারে ইহা ভাবিতেও যে হীনতায় মাথা নত হয়। আমাদের নৈতিক উৎকর্ষের জন্য এই গুরুতর বিষয়ে সহযোগী ও অসহযোগীদের ভিতর কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত একটিমাত্র নারীও আমাদের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য রক্ষিত

থাকিবে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তক লজ্জায় হেঁট হওয়া উচিত। নারী ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাহাকে পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসার ইন্ধনে পরিণত করিয়া পশুরও অধম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র পুরুষজাতি সমূলে বিনাশ হউক ইহাই বরং আমি দেখিতে চাই। শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র জগতের এই সমস্যা। পশুত্বেরও হীন অবস্থা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সুবুদ্ধিপরিচালিত সহজ জীবনযাত্রায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। সেইজন্যই আমি বর্তমান ইন্দ্রিয়ভোগসর্বস্ব অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেছি এবং পুরুষ ও নারীগণকে সহজ ও সরল জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেছি। চরকার ভিতর ইহার সারমর্ম নিহিত রহিয়াছে। আমি নারীগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অন্তরের সহিত কামনা করি। আমি বাল্যবিবাহ ঘৃণার চক্ষে দেখি। বালবিধবাকে দেখিলে আমি শিহরিয়া উঠি। সদ্য বিপত্নীক স্বামীকে নিষ্ঠুর নির্মমতার সহিত পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিলে আমি রাগে কাঁপিতে থাকি। যে সকল পিতামাতা তাঁহাদের কন্যাদিগকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর রাখিয়া কোন অবস্থাপন্ন যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া নিষ্কৃতিলাভের জন্যই শুধু তাহাদিগকে লালনপালন করেন, আমি তাহাদের এই অমার্জনীয় উদাসীনতার জন্য আক্ষেপ করি। এই রাগ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমি সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করি। নারীদের ভোটাধিকার দিতেই হইবে এবং পুরুষের সমপর্যায়ে তাহাদের আইনগত অধিকারাদি থাকিবে। সমস্যার মীমাংসা কিন্তু এখানেই হয় না। জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন যখন নারীগণের দ্বারা

প্রভাবিত হইতে থাকিবে তখনই এই সমস্যা সমাধানের সূত্রপাত হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি চমৎকার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। জনৈক বিশিষ্ট মুসলমান বন্ধুর লণ্ডন শহরে একজন খ্যাতনামা নারী-আন্দোলনকারীর সহিত কথোপকথন হয়। তিনি তাঁহাদের একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। একজন মুসলমানকে সেখানে দেখিয়া একজন মহিলা বন্ধু আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি কি সূত্রে সেখানে গেলেন মহিলাটি এই প্রশ্ন করিলেন। বন্ধু উত্তর করিলেন যে, দুইটি বড় ও দুইটি ক্ষুদ্র কারণে তিনি সেখানে আসিয়াছেন। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। জীবনে তিনি যাহা কিছু হইয়াছেন তজ্জন্য তিনি তাঁহার মাতার নিকট ঋণী। তৎপর যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তিনিও ছিলেন প্রকৃত সহযোগিনী। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, চারটি কন্যা ছিল—সকলেই নাবালিকা এবং পিতা হিসাবে তাহাদের মঙ্গলের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি নারী-আন্দোলনের পক্ষপাতী, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। নারীগণের প্রতি উদাসীন বলিয়া মুসলমানদিগকে দোষ দেওয়া হয়। এর চাইতে গুরুতর কুৎসা আর হইতে পারে না। ইসলামীয় আইন নারীদিগকে সমান অধিকার দিয়াছে। তিনি মনে করেন, পুরুষ কামের বশীভূত হইয়া নারীকে অবনমিত করিয়াছে। তাহার ভিতরের আত্মার শোভা বিকশিত হইতে না দিয়া পুরুষ তাহার দেহকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; সেই গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনে পুরুষ কৃতকার্য হইয়াছে —তাই আজ নারী দাসত্বের চিহ্নস্বরূপ শারীরিক বেশভূষাকেই

আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাষ্পাকুল কণ্ঠে তিনি আরও বলিলেন—যদি তাহা না হইত তবে পতিতা ভগিনীগণ শারীরিক সাজসজ্জা করিতে এত ভালবাসে কেন? আমরা, পুরুষগণ, কি তাহাদের ভিতর হইতে আত্মাকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলি নাই? আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—"না, তিনি শুধু নারীগণের বাহিরের দিকের স্বাধীনতা চান না, যে সকল শৃঙ্খল নারীর স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে তিনি সেগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চান।" সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে তাঁহার কন্যাদিগকে তিনি স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবেন।

এই উদার ও উন্নতস্তরের কথোপকথন আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমার মহিলা লেখিকাকে এই মুসলমান বন্ধুর আলোচনার মূলগত ভাবটির বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। নারী পুরুষের লালসার বস্তু এই ভাব নারীকে ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষের চাইতে নারীর নিজের কাছে প্রতিকারের উপায় বিদ্যমান। পুরুষের সহিত সমান পর্যায়ে অংশীদার হইতে হইলে পুরুষের, এমনকি স্বামীরও, মনোরঞ্জনের জন্য নারীকে সাজসজ্জা হইতে বিরত হইতে হইবে। বাহিরের সাজসজ্জা দ্বারা রামের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য সীতা কখনও একটি মুহূর্ত নষ্ট করিবেন ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-'২১]

৬৪

লক্ষ্ণৌয়ের বেশ্যালয়

জনৈক ইংরেজ বন্ধু আমাকে লক্ষ্ণৌ নগরীতে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন—

"আমি লক্ষ্ণৌ শহরের বেশ্যালয়গুলি সম্বন্ধে আপনাকে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। এখানে উচ্চপদস্থ যাঁহারা আপনাকে সমর্থন করিবেন তাঁহাদের নিকট পরে যাইবেন। অদ্য :প্রাতঃ-কালে আমিনাবাদে সামরিক পুলিশদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। মনে হইল সেই অঞ্চলে এই রকম প্রায় পঞ্চাশটি বাড়ী আছে। ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সৈন্যগণ সেখানে যাতায়াত করে। সীমানার বাহিরে বলিয়া কয়েকজনের সামরিক শাস্তিও হইয়াছে। ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আমি শুনিয়াছি যে তাহারাও এই সকল স্ত্রীলোকের নিকট গিয়া থাকে। এই অকল্যাণকর ব্যাপার মনুষ্যত্ব বিলোপ করে এবং আত্মসংযমের মূলে কুঠারাঘাত করে। ইহার প্রতিকারকল্পে আপনার বাণী সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইবে। এই বিষয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি।"

—আমার বাণীর কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমার ইংরেজ বন্ধুর যে ধারণা আমার নিজের সেরূপ বিশ্বাস থাকিলে সুখী হইতাম। এই অনুচ্ছেদ লিখিবার সময়, কোকনদে রাত্রিকালে যে সকল স্নেহের পাত্রী ভগিনীগণ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল তাহাদের চিত্র স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতেছে। তাহাদের গ্লানিকর জীবনের ইতিহাস জানিবার পর তাহারা আমার আরও প্রিয়

হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের জীবন কিভাবে চলিতেছে তাহা শুধু আভাসে তাহারা আমাকে বুঝাইয়াছিল। আমার সহিত কথা বলিবার সময় তাহাদের অগ্রবর্তিনী মুখপাত্রের চোখে গ্লানি ও বেদনা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। আমি কোনরূপেই তাহাদিগকে দোষী বলিতে পারি নাই। এই সাক্ষাতের পর ব্যক্তিগত চরিত্রের পবিত্রতা আবশ্যক এই সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা দিই। সেইজন্য লক্ষ্ণৌয়ের পতিতা ভগিনীদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। গ্লানিকর জীবনযাপন করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া যে তাহারা এই পথ অবলম্বন করে নাই সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পুরুষের পাশবিক প্রবৃত্তিই এই জঘন্য পাপকে অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে। লক্ষ্ণৌবাসীরা বিলাসপ্রিয়, আরামে জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। কিন্তু এই লক্ষ্ণৌ শহরেই একজন মুসলমান সাধুর বাসস্থান। ইসলাম ধর্মে যাহা কিছু উদার ও উৎকৃষ্ট তাহা সবই এখানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যে প্রদেশে পূতচরিত্রা সীতা ও রাম বিচরণ করিয়া গিয়াছেন এবং রাজত্ব করিয়াছেন লক্ষ্ণৌ তাহারই রাজধানী। হিন্দুদের শৌর্য, উদারতা, পবিত্রতা এবং সত্যে একনিষ্ঠার গৌরবময় দিনের কথা ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়। অসহযোগিতা এবং আত্মশুদ্ধি একই জিনিস। লক্ষ্ণৌ শহরের এই নৈতিক পাপ উন্মূলিত করিবার জন্য অসহযোগ-আন্দোলনকারিগণকে এবং অন্যান্য সকলকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। লক্ষ্ণৌ শহরের সুনাম রক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁহারা কেহই আশা করি

আমাকে ইহা বলিবেন না যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য শহর হইতে লক্ষ্ণৌ অপকৃষ্ট নয়। দৈবক্রমে হঠাৎ লক্ষ্ণৌয়ের কথা দৃষ্টান্তস্থলে বলা হইল। নারীজীবনের শুচিতা ও অনাময়ত্ব রক্ষার দায়িত্ব সমগ্র ভারতের পুরুষের উপর ন্যস্ত। লক্ষ্ণৌ এ বিষয়ে অগ্রণী হইবে না কেন?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৮-'২১]

৬৫

আমাদের পতিতা ভগিনীগণ

যে সকল নারী আত্মবিক্রয় দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে অন্ধ্র প্রদেশে কোকনদে সর্বপ্রথম তাহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কয়েক মিনিটের জন্য তাহাদের জন ছয়ের সঙ্গে দেখা হয়। দ্বিতীয় বার—বরিশালে। পূর্বে সময় নির্ধারণ করিয়া এই শ্রেণীর শতাধিক নারী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া তাহারা পূর্বে চিঠি দেয়। তাহাতে জানায় যে তাহারা কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছে এবং তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে চাঁদা দিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটীতে কর্মীর পদগ্রহণের প্রতিকূলে আমার উপদেশ তাহারা বুঝিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কিসে তাহাদের মঙ্গল হইবে সেই সম্বন্ধে আমার উপদেশ পাইবার আশা করিয়া চিঠি শেষ করে। একটি ভদ্রলোক এই চিঠি আমার নিকট অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না এই চিঠি পাইয়া আমি

বিরক্ত হইব বা খুশী হইব। এই সকল ভগিনীকে কোন উপায়ে সহায়তা করা সম্ভবপর হইলে তাহা আমার কর্তব্য এই আশ্বাস দেওয়ার পর তাঁহার সেই আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

যে দুই ঘণ্টা আমি এই ভগিনীদের সঙ্গে কাটাইয়াছি তাহার বহুমূল্য স্মৃতি অনেককাল জাগরূক থাকিবে। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা মিলিয়া শহরের জনসংখ্যা বিশ হাজার। তন্মধ্যে পতিতাদের সংখ্যা ৩৫০। তাহারা বরিশালের পুরুষদের কলঙ্কস্বরূপ। বরিশালের প্রভূত সুনামরক্ষাকল্পে এই পাপ যত শীঘ্র বিদূরিত হয় ততই মঙ্গল। আমার আশঙ্কা হয় যে বরিশালের পক্ষে যাহা সত্য প্রত্যেক শহর সম্বন্ধেই তাহা খাটে। সেইজন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বরিশালের নাম করিলাম। এই ভগিনীদিগকে কিরূপে সহায়তা করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া বরিশালের কতিপয় যুবক প্রশংসার পাত্র হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পাপ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া বরিশাল শীঘ্রই কৃতিত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

নারীগণ মানবসমাজের বিশিষ্ট অর্ধাংশ। আমার মতে তাহারা সমাজের দুর্বলতর অংশ নহে। সমাজের যত পাপের জন্য পুরুষেরা দায়ী তন্মধ্যে নারীর প্রতি অবিচার, অপমান ও দুর্ব্যবহারের মত এত ঘৃণিত, বীভৎস ও নির্মম অত্যাচার কল্পনা করা যায় না। পুরুষের তুলনায় নারীপ্রকৃতি অধিকতর উদার। কারণ তাহারা আজও আত্মত্যাগ, নীরব সাহষ্ণুতা, ধৈর্য, বিনয়, বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রতীক। পুরুষ অহঙ্কার করিয়া মনে করে সে নারী হইতে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নারীর স্বভাবজাত বুদ্ধিবিবেচনা

পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রাম নামের পূর্বে সীতার এবং কৃষ্ণ নামের পূর্বে রাধার নাম প্রয়োগের বিশেষ কারণ আছে। নারী লইয়া পাপের খেলা প্রবলভাবে চলিতেছে; সভ্য ইউরোপে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা সরকারী আইন অনুযায়ী পরিচালিত; কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রমেও যেন আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত না হই যে সমাজের ক্রমোন্নতি-পথে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতেও এই পাপ পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, ইহার উপর নির্ভর করিয়াও যেন আমরা এই পাপকে চিরস্থায়ী না করি। অতীতের সব বিষয় আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নই; যদি আমরা অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করি কিংবা আমরা পাপপুণ্য বা ধর্ম-অধর্মের বিচার করিতে বিরত হই তবে আমরা কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। অতীত যুগে যাহা সর্বাপেক্ষা উদার এবং উৎকৃষ্ট ছিল উত্তর কালে তাহাই আমরা লাভ করিয়াছি এবং সেইজন্য গৌরব বোধ করি। অতীতের ভুলভ্রান্তি বহুলপরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়া আমরা যেন আমাদের লব্ধ বিষয়ের অবমাননা না করি। আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন ভারতে প্রত্যেক নারীকে নিজের ভগিনীর ন্যায় দেখা এবং সেই দৃষ্টিতে তাহার ধর্মরক্ষা করার দায়িত্ব কি প্রত্যেক পুরুষের নয়? প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজ ভাই কিংবা ভগিনীর মত দেখিবার শক্তি লাভ করাই স্বরাজ।

সেইজন্য পুরুষ হিসাবে এই তিনশত ভগিনীর সম্মুখে আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলাম। কয়েকজন ছিল বয়স্কা, অধিকাংশের বয়স ছিল কুড়ি হইতে ত্রিশের মধ্যে; তুই তিনটির বয়স বার

বৎসরের কম ছিল। তাহারা বলিল, তাহাদের সকলের মধ্যে ছয়টি কন্যা ও চারটি পুত্রসন্তান আছে। ছেলেদের বড়টি তাহাদের শ্রেণীরই একজনকে বিবাহ করিয়াছে। যদি অন্য কোন পথ বাহির করা সম্ভবপর না হয় তবে মেয়েগুলিকেও তাহাদের নিজেদের ন্যায় জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল নারীকে যদি ভাবিতে হয় যে তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায় আর নাই—তাহা জীবিতের মাংসপেশীর উপর ছুরিকাঘাতের ন্যায় আমাকে বিদ্ধ করিবে। কিন্তু তাহারা বুদ্ধিমতী এবং লজ্জাশীলা। তাহাদের কথাবার্তা মর্যাদাব্যঞ্জক, তাহাদের উত্তর সরল এবং পরিষ্কার। যে কোন সত্যাগ্রহীর ন্যায় তাহাদিগকে তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বোধ হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে এগার জন প্রতিজ্ঞা করিল যে, কাহারও নিকট হইতে সহায়তা পাইলে তাহারা পরের দিন হইতেই তাহাদের বর্তমান পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া সূতা কাটিবে এবং বয়ন করিবে। অন্য সকলে বলিল, এই বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য সময় আবশ্যক ; কারণ তাহারা আমাকে কোন কপটবাক্য বলিতে ইচ্ছুক ছিল না।

এই সকল পতিতার মধ্যে বরিশালের নাগরিকদের এক কর্মক্ষেত্র মুক্ত রহিয়াছে। যে সকল নরনারী ভারতের প্রকৃত সেবাব্রতী, তাহাদের জন্য কাজ এখানে রহিয়াছে। যদি বিশ হাজার লোকের মধ্যে ৩৫০ জন হতভাগিনী ভগিনী থাকিয়া থাকে তবে সারা ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা ৫২,৫০,০০০ হইতে পারে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার $\frac{৪}{৫}$ ভাগ কৃষিজীবী, গ্রামেই তাহাদের বসবাস; তাহাদের মধ্যে এই ব্যভিচার প্রবেশ করে

নাই এই ধারণা পোষণ করিয়া আমি আনন্দলাভ করি। কাজেই আত্মবিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা উপার্জন করে এরূপ নারীর সংখ্যা সমগ্র ভারতে ন্যূনকল্পে ১০,৫০,০০০ হইবে। এই হতভাগিনী ভগিনীদিগকে তাহাদের পাপজীবন হইতে ছাড়াইয়া আনিতে হইলে দুইটি ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে। আমাদের পুরুষদের কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়া সংযম শিক্ষা করিতে হইবে এবং এই সকল নারীকে সদুপায়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন কার্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের কোন অর্থই থাকিবে না যদি ইহা আমাদিগের চরিত্র নির্মল না করে এবং আমাদের অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত না করে কর্মীদের ভিড় বাড়িবে না, এমন কোন কাজে নিয়োগ করিতে হইলে সূতাকাটা এবং বস্ত্রবয়ন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। ইহা গৃহকর্মের মত সকলেই করিতে পারে। এই ভগিনীদের অধিকাংশেরই বিবাহের জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে না। কাজেই তাহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্ন্যাসিনী হইতে হইবে। সেবা ছাড়া জীবনে তাহাদের আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না এবং তাহারা পরমানন্দে যত খুশী ইচ্ছা সূতা কাটিতে এবং বস্ত্র বয়ন করিতে পারিবে। দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নারী যদি প্রত্যহ আট ঘণ্টা করিয়া যত্নের সহিত সূতা কাটে এবং কাপড় বুনে তবে শোষিত ভারতের দৈনিক সেই পরিমাণ টাকা আয় হইবে। এই ভগিনীরা আমাকে বলিয়াছে যে তাহারা দৈনিক দুই টাকা পর্যন্ত রোজকার করিয়াছে।

কিন্তু তাহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছে যে, পুরুষের লালসার ইন্ধন যোগাইতে তাহাদের অনেক জিনিসের দরকার হয় ; যদি তাহারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া গিয়া সূতাকাটা এবং বস্ত্রবয়ন আরম্ভ করে তবে ঐ সকল জিনিসের দিকে তাহাদের দৃষ্টি দিতে হইবে না। আমার সঙ্গে তাহাদের কথাবার্তা শেষ হইতে হইতেই, আমার কিছু না বলা সত্ত্বেও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের পাপজীবন পরিত্যাগ না করিলে তাহারা কোন কংগ্রেস কমিটীর কর্মিশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ চিত্ত এবং পবিত্র মন না লইয়া স্বরাজের বেদীতে পূজারীরূপে কেহ অর্ঘ্য অর্পণ করার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯-'২১]

৬৬

পতিতা ভগিনীদের সূতাকাটা

নোয়াখালীতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, দুইটি পতিতা ভগিনী শুধু সূতা কাটে না, সূতা কাটিয়া তাহারা নিজেদের সমগ্র ব্যয়ভার নির্বাহ করে। তাহারা যুবতী নয়,—তাহাদের বয়স চল্লিশ অতিক্রম করিয়াছে ; কাজেই পাপপথে জীবিকা-নির্বাহের উপায় ছিল না। সূতা না কাটিলে তাহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইত। কাজেই প্রকৃতপক্ষে বলিতে হইবে তাহারা শুধু পূর্বের পেশা পরিত্যাগ করিয়াছে এমন নয়, ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়াছে। এই ভগিনীদের

সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এবং তাহাদের ভালমন্দ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নোয়াখালী একটি মহৎ কাজ করিয়াছে। আমি ইহাও জানি যে তাহাদের কেহ কেহ পাপবৃত্তি পরিত্যাগ না করিয়াও সূতাকাটা আরম্ভ করিয়াছে। যদি তাহারা পেশা ত্যাগ না করে তবে সূতা কাটিয়া এই ভগিনীদের কোন লাভ হইবে কিনা আমি বলিতে পারি না। ইহা তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে সূতাকাটাকে জীবিকা অর্জনের উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিতে তাহাদের নিকট অনুরোধ করা যায় না। তাহারা দৈনিক অন্ততঃ এক টাকা, দুই টাকা বা ততোধিক রোজকার করিত। তাহাদিগকে বস্ত্রবয়ন অথবা বুটিতোলা, চিকণের কাজ অথবা অন্য কোন চারুশিল্পের কাজ শিক্ষা করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের আয় মোটামুটি ভাল হইবে। পরন্তু পুরুষদের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। নারীদিগকেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে হইবে। যত দিন পর্যন্ত অসাধারণ চরিত্রবলসম্পন্না পূতশীলা কোন রমণী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পতিত মানবসমাজের এই অংশের উদ্ধারকার্যে নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গিত না করেন ততদিন সমাজে গণিকাবৃত্তি-সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য পুরুষেরাও যথেষ্ট কাজ করিতে পারে; তবে তাহাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকিবে সেই সকল পুরুষের মধ্যে যাহারা কামের বশীভূত হইয়া যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে আত্মবিক্রয়ের পথে প্রলুব্ধ করিয়া নিজদিগকে অধঃপাতিত করে। গণিকাবৃত্তি পৃথিবীর

সৃষ্টি হইতেই বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় নাগরিক-জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে ইহা কখনও ছিল কিনা আমি জানি না। অন্ততঃ একটা সময় আসিবে যখন মানবসমাজ এই অভিসম্পাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং যেভাবে সমাজ বহু পুরাতন অনেক কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়াছে সেইভাবে গণিকাবৃত্তিকেও অতীতের গহ্বরে প্রোথিত করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৫-'২৫]

৬৭

পতিতা ভগিনীগণ

মাদারীপুরে অভ্যর্থনা-সমিতি পতিতা ভগিনীদের দ্বারা সূতাকাটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছিলাম, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের আনুষঙ্গিক বিপদ্ সম্বন্ধে উদ্‌যোক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পতিতা উদ্ধারের জন্য আন্দোলন বরিশালে সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। কিন্তু তাহা সুপথে পরিচালিত হয় নাই এবং নিঃসন্দেহে কুৎসিত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই হতভাগিনী ভগিনীদিগকে তথায় সংঘবদ্ধ করা হইয়াছে। সংঘের যে নামকরণ করা হইয়াছে তাহাতে ভ্রম উৎপাদন করে। ইহার "বর্তমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"(১) দরিদ্রকে সাহায্য করা এবং পীড়িত ভ্রাতাভগিনী-দিগকে শুশ্রূষা করা ;

(২) (ক) নিজেদের ভিতর শিক্ষা বিস্তার করা ;

(খ) একটি নারীশিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, সেলাই, সূচীশিল্প এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের উন্নতি করা ;

(গ) উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষা ;

(৩) অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা তাহাদের সহিত যুক্ত হওয়া।"

এই সম্বন্ধে এই বলা যথেষ্ট হইবে যে, সমগ্র বিষয়টি ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী স্থাপনের ন্যায় ওলটপালট করা হইয়াছে। নিজেদের সংস্কার না করিয়া এই ভগিনীদিগকে জনহিতকর কার্যে ব্রতী হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত-শিক্ষার কল্পনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক মনে করা যায়, যদি না উহার ফলে শোচনীয় সামাজিক অনর্থের সৃষ্টি হয়। কারণ ইহা সকলেই জানে যে, এই সকল নারী নাচিতে এবং গাইতে জানে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি সত্যাগ্রহ ও অহিংসা তাহাদের সঙ্গে উক্ত পতিতাসংঘ যুক্ত হইলে তাহারা তাহাদের পাপবৃত্তি চালাইতে থাকিবে এবং সত্য ও অহিংসার মূলেই কুঠারাঘাত করিবে।

আমার হাতে উক্ত পতিতাসংঘের যে বিবরণী আছে তাহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, তাহারা কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে "তাহাদের নিম্ন অবস্থার উপযোগী অন্যান্য দেশহিতৈষণার কাজ" করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এমনকি, তাহারা প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হইয়াছে।

তাহাদের নামে প্রচারিত একটি ঘোষণাপত্রও আমি দেখিয়াছি। ইহাকে আমি শ্লীলতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি।

উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, আমি এই সমগ্র আন্দোলনকে লজ্জাকর মনে না করিয়া পারি না। সূতাকাটা আমি প্রশংসা করি, কিন্তু পাপপথে চলিবার ছাড়পত্ররূপে ইহার ব্যবহার হইতে পারে না। আমি ইচ্ছা করি, সকলেই সত্যাগ্রহী হউক, কিন্তু নরহত্যা করা যাহার ব্যবসা এরূপ কোন ব্যক্তি অনুতপ্ত না হইয়া যদি সত্যাগ্রহনীতি স্বাক্ষর করিতে চায় তবে আমার সকল শক্তি দ্বারা তাহাকে বাধা দিব। এই সকল ভগিনীর দুঃখ আমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করি। কিন্তু বরিশালে যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে আমি সায় দিতে পারিতেছি না। এই ভগিনীরা সমাজের যে স্তরে নামিয়া গিয়াছে সমাজের নৈতিক কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল পতিতা সংঘবদ্ধ হইয়াছে, অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা কখনই একদল জানা চোরকে সংঘবদ্ধ করিব না। বর্তমান আকারের সংঘের প্রয়োজন আরো কম, কারণ ইহারা চোর হইতেও অধিক বিপজ্জনক। চোর পার্থিব জিনিস চুরি করে, কিন্তু ইহারা ধর্ম নষ্ট করে, মানবাত্মার অধোগতি আনে। সমাজে এই সকল হতভাগিনীর অস্তিত্বের জন্য পুরুষই প্রধানতঃ দায়ী; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে সমাজের অনিষ্টসাধনের অতি ভয়ঙ্কর ক্ষমতা তাহারা অর্জন করিয়াছে। বরিশালে আমি শুনিয়াছি যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া এই সকল স্ত্রীলোক অস্বাভাবিকরূপে

প্রগতিশীলা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই বরিশালের যুবকদিগকে তাহারা কলুষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক ইহা আমি ইচ্ছা করি। আমার দৃঢ় মত এই—যতদিন তাহারা এই পাপজীবন পরিত্যাগ না করে ততদিন তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা বা সেবা গ্রহণ করা অথবা তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা অথবা তাহাদিগকে কংগ্রেসের সভ্য হইতে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়। তাহাদের কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই, কিন্তু আমার আশা ছিল যে জনমত তাহাদিগকে কংগ্রেসের বাহিরেই রাখিবে এবং তাহারাও নিজেদের হীনতাবোধে কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে বিরত থাকিবে।

আমি ইচ্ছা করি আমার বাণী তাহাদের নিকট পৌঁছায়। কংগ্রেস হইতে তাহাদের নাম তুলিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে বলিতেছি ; তাহাদের যে কোন সংঘ ছিল তাহা তাহারা ভুলিয়া যাউক। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহারা তাহাদের পাপব্যবসা পরিত্যাগ করুক। তখনই তাহারা আত্মশুদ্ধির তপস্যারূপে সূতাকাটা আরম্ভ করিতে পারিবে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য বস্ত্রবয়ন বা অন্য যে কোন প্রকার অর্থকরী এবং নির্দোষ কাজে নিজদিগকে নিয়োজিত করিতে পারিবে—কিন্তু তৎপূর্বে কিছুতেই নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৬-'২৫]

৬৮

বেদনাজনক আলোকপাত

"আপনি বাঙ্গলার বহু শহরে এবং গ্রাম্য অঞ্চলে সফর করিতেছেন। বাঙ্গলার সামাজিক জীবনের একটি অতীব মলিন চিত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুযোগ নিতেছি। আমার ঐকান্তিক আশা যে, আপনার উপদেশ ও বাণী এই ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি দোষারোপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নাই। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য বাঙ্গলাদেশের বর্তমান প্রকৃত অবস্থার প্রতি আপনার সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

"আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলাদেশে অহরহঃ যে সকল নারীহরণের ঘটনা আশ্চর্যরকমে বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই দিকে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সামাজিক জীবনের ভিতরে কোথাও যে গলদ রহিয়াছে এই সকল নৈতিক বিভ্রাট তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।

"বাঙ্গলার কোন কোন জিলাতে গণিকাবৃত্তি ও অন্যান্য দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পশ্চিম বাঙ্গলার প্রায় সব জিলাতে এবং উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গলার পাট এলাকায়, এমনকি গ্রাম্য বাজারেও বেশ্যালয় অপরিহার্য অংশরূপে গণ্য হইয়া থাকে। বড় বড় বাজারের বা বন্দরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কাজ-কারবারের মরসুমে প্রধান প্রধান পাটের বাজারে ভাসমান গণিকালয় দ্বারা পতিতাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি পায়। বাজারের সন্নিহিত স্থানে নিবদ্ধ নৌকাতে অসংখ্য গণিকা বাস করিয়া তাহাদের নারকীয় ব্যবসা চালাইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলে প্রায় সকল মেলাতেই এই সকল হতভাগিনী নারীর প্রাদুর্ভাব হয়। মেলাস্থলে তাহারা সাময়িকভাবে বাসা তৈয়ারী করে এবং মেলাতে যাহারা যায় তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করে। কোন কোন

জিলাতে জমিদারের বাড়ীর বা কাছারীর চতুর্দিকে বহুসংখ্যক গণিকাকে আবাসস্থান দেওয়া হয় ; কারণ, সাধারণতঃ জমিদারগণ বা তাহাদের কর্মচারিগণ ইহাদের পৃষ্ঠপোষক। এই বিষয়ে ময়মনসিংহ, পাবনা এবং রাজসাহী জিলা বিশেষভাবে কুখ্যাত। এই সকল জিলাতে নারীহরণ ও নারীধর্ষণের ঘটনা যে সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যায় ঘটে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। ইহাদের অধিকাংশ ভিক্ষা করিয়া এবং গান গাহিয়া জীবিকা উপার্জন করে। সংক্ষেপে এই বলা যায়, বাঙ্গালীরা এই সকল পরগাছাকে পোষণ করিতে বাৎসরিক প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় করে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই, হিন্দুসমাজে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থান নাই,—তাহাদিগকে আবর্জনা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। বৈষ্ণব সমাজের মেয়েদের মধ্যেই অধিকাংশ নারীহরণের ঘটনা ঘটে। ধর্মের ছদ্মবেশে এই সকল উপায়হীন নারীগণ অত্যন্ত কদর্য ও কলুষিত জীবন যাপন করে। আমার বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে আপনাকে গোপনে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দান করা বন্ধ করিলে এবং চরকার প্রবর্তন করিলে এই চার লক্ষ লোককে বাঁচান যাইতে পারে এবং তাহাদিগের দ্বারা সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। কলিকাতা এবং শহরতলীর অবস্থাও কল্পনায় যতদূর আসে ততটা খারাপ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জিলা হইতে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাড়িত হইয়া শত শত স্ত্রীলোক তাহাদের গ্রামাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা ও শহরতলীতে দলে দলে আসিয়া থাকে। এখানে তাহারা ঝি বা পরিচারিকা বা পানওয়ালী ইত্যাদির কাজ করিয়া পাপজীবন যাপন করে। এই সকল জিলাতে জনসাধারণের নৈতিক মান অত্যন্ত হীন এবং এই কারণে তথায়

যৌনব্যাধি ও কুষ্ঠরোগাদির প্রাবল্য। বাঙ্গলার ১৫,৪৫১ জন কুষ্ঠরোগীর প্রায় অর্ধেক ৭,২৪০ জন শুধু বর্ধমান বিভাগ হইতে আসে (১৯২১ সনের লোকগণনা বা আদমসুমারী বিবরণ, ২য় খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা)। পরন্তু বাঙ্গলার সবচেয়ে অপচয়শীল জিলা এইগুলি; এবং তাহাদের লোকসংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় এই সকল জিলাতে মদ্যপানের প্রাবল্যও বহুব্যাপক।

"কলিকাতার নাট্যশালাগুলি প্রধানতঃ পতিতা নারীদের দ্বারা চালিত হয়। বহুসংখ্যক ছাত্র এবং বিখ্যাত জননেতাগণও থিয়েটারে গিয়া থাকেন। এই সকল নাট্যগৃহে জনসাধারণের বড় বড় সভার অধিবেশন হয়। আমাদের দৈনিক কাগজগুলির স্তম্ভে অভিনেত্রী ও নর্তকীদের বিস্তৃত প্রশংসা বাহির হয়। এইগুলির মধ্যে প্রভূত শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী কাগজও রহিয়াছে, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলা চিত্রসম্বলিত মাসিক পত্রিকা আছে; সেগুলিতে নাটক ও নৃত্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। দশ বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষায় বর্তমানে প্রকাশিত হইতেছে।

"এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে নৈরাশ্যে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

"মহোদয়, এই অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিনীতভাবে আপনার মত সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি—

(১) কংগ্রেসের সভ্য অথবা স্বেচ্ছাসেবক অথবা যাহারা জাতীয়-দলে কর্মী হইবার অভিলাষ করে তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত থিয়েটারে যাওয়া উচিত কিনা? অথবা যে সকল ছায়াচিত্রে

কামোদ্দীপক চিত্রাবলী নানাপ্রকার লোভনীয় আকারে প্রদর্শিত হয় সেখানে যাওয়া সঙ্গত কিনা ?

(২) জনসাধারণের কোন সভা নাট্যশালাতে অনুষ্ঠিত হইবে কিনা ?

(৩) কোন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কাগজ নারী-পরিচালিত যাত্রা, নৃত্যশালাবিষয়ক এবং অভিনেত্রীগণের প্রশংসা ইত্যাদি এবং মদ্য ও মাদকদ্রব্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিবে কিনা ?

(৪) ছাত্রগণের এবং কংগ্রেসসেবিগণের ধূমপান এবং মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় কিনা ? ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সঠিক সংবাদ—এই চট্টগ্রাম শহরে প্রতিমাসে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের সিগারেট ও বিড়ি বিক্রী হয়। শহরের লোকসংখ্যা ৩৬,০৩০ এবং জিলার লোকসংখ্যা ১৬,১১,৪২২ !!

(৫) মদ্যপান এবং গণিকালয় বন্ধ করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী এবং লোকাল বোর্ডের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত কিনা ? এবং এই সকল সামাজিক ব্যাধি দূরীভূত করিতে তাহাদের যথাসাধ্য প্রচারকার্য চালানো উচিত কিনা ?"

—এই চিঠি আমাকে চট্টগ্রামে দেওয়া হইয়াছিল এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয় বিবেচনার জন্য উহা আমার জ্যাকেটের ভিতরই ছিল। লেখক হয়ত জানেন, পতিতা ভগিনীদিগকে তাহাদের পাপ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টার ফল আপাততঃ তাহাদের পাপজীবন যাপন করিবার সুবিধায় পরিণত হইয়াছে। আমি জানি, গণিকাবৃত্তি সমাজের মহা অনিষ্টকর প্রথা এবং ইহা ক্রমশঃই বর্ধনশীল। লক্ষ্য করিলেই অনায়াসে দেখা যায় সমাজ নৈতিক কুষ্ঠে আক্রান্ত ; পাপের ভিতর সদ্‌গুণ আবিষ্কার

করিবার মনোবৃত্তি এবং শিল্পকলার পবিত্র নামে বা অন্য কোন ভ্রান্ত ভাবধারার বশীভূত হইয়া কুপ্রথা সমর্থন করার মনোভাব —এই হেয় পাপাচরণকে অতি নিপুণভাবে কল্পিত সম্মানের আসন দিয়াছে ; ইহাই সামাজিক ব্যাধির কারণ। কিন্তু লেখক যে ভয়াবহ অবস্থার অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস তিনি এই সকল কুপ্রথা অতিরঞ্জিত করেন নাই। কারণ আমার সফরের সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ইহার সমর্থন পাইয়াছি। বর্তমান যুগ ঈশ্বরে অবিশ্বাস বা মৌখিক অর্ধবিশ্বাসের যুগ ; ভোগবিলাসপ্রচুর ঐশ্বর্যে ইহা পরিপূর্ণ ; আপাতদৃষ্টিতে রোমক সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল তখন উহার চরম নৈতিক অধঃপতনের কথা এই সকল যুগচিহ্ন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমান যুগেও এই সামাজিক ব্যাধি অত্যন্ত গুরুতর—তাহার প্রতিকার উদ্ভাবন সহজ নয়। আইন দ্বারা ইহার সংশোধন করা যায় না। লণ্ডন এই পাপে ভরপূর। প্যারীনগরী পাপের লীলায় কুখ্যাত এবং উক্ত পাপাচরণ প্রায় শৌখীন ব্যসনে পর্যবসিত। যদি আইন দ্বারা প্রতিকার সম্ভব হইত তবে এই সকল সুনিয়ন্ত্রিত জাতি তাহাদের রাজধানী হইতে এই পাপ বিদূরিত করিত। আমার ন্যায় সংস্কারকগণ যতই লিখুক না কেন, প্রত্যক্ষভাবে এই পাপের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। এদেশে ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব যথেষ্ট অবনতি ঘটাইয়াছে ; ভারতীয় কৃষ্টির উপর তাহাদের আধিপত্য ততোধিক শোচনীয়। আমরা একদিকে রাজনৈতিক আধিপত্যে

অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছি, অপর দিকে তাহাদের কৃষ্টিকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এই মোহে পড়িয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে, কৃষ্টিগত আধিপত্য যখন সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইবে তখন রাজনৈতিক আধিপত্য অখণ্ড হইয়া পড়িবে। আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি এই আভাস দিতেছি না যে, ইংরেজরাজত্বের পূর্বে এদেশে গণিকাবৃত্তি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত আমি বলিতে পারি, বর্তমানের ন্যায় ইহা এতটা উগ্রভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল না। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের ভিতরই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকদিগের ইহা দ্রুতগতিতে সর্বনাশ-সাধন করিতেছে। দেশের যুবকগণ আমার আশাভরসার স্থল। ইহাদের মধ্যে যাহারা এই পাপে নিমগ্ন হইতেছে তাহারা স্বভাবতঃ কলুষিত নয়। বিবেচনার অভাবে এবং নিরুপায়ভাবে তাহারা ইহাতে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহাদের এবং সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা তাহাদের বুঝা উচিত। তাহাদের ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, দেশকে অধঃপতনের অতল গহ্বর হইতে রক্ষা করিতে হইলে এবং নিজদিগকে বাঁচাইতে হইলে কঠোরভাবে সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতে হইবে। অন্যথা তাহা সম্ভবপর হইবে না। যদি ভগবানের দিকে তাহাদের দৃষ্টি না যায়, এবং প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা না করে, প্রাণহীন নিয়মানুবর্তিতার বহুল অনুশীলনেও তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে না। গীতায় ঋষি সত্যই বলিয়াছেন, "নিরাহার দ্বারা

দেহকে সংযত করিলেও কামনা থাকিয়া যায়। ভগবানকে সাক্ষাৎ করিতে পারিলে বিষয়বাসনা দূর হয়।"* ভগবানের সাক্ষাৎ অর্থ তাঁহাকে উপলব্ধি করা। তিনি আমাদের হৃৎ-সিংহাসনে সর্বদা বিরাজমান। কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই যেমন শিশু মাতৃস্নেহ অনুভব করে, আমরাও ভগবানকে তেমন অনুভব করিতে পারি। মাতার স্নেহের অস্তিত্ব কি শিশু যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়া স্বীকার করে? অন্যের নিকট কি সে তাহা প্রমাণিত করিতে পারে? উল্লাসের সহিত সে ঘোষণা করে "ইহা আছে"। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ঠিক তাই। তিনি যুক্তিদ্বারা অধিগম্য নন। কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করা যায়। আমরা পৃথিবীতে যেমন শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অস্বীকার করি না তেমনি আমরা যেন তুলসীদাস, চৈতন্য, রামদাস ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতাও অস্বীকার না করি।

লেখক তাঁহার চিঠিতে উল্লিখিত বহু বিষয়ে কংগ্রেস-সেবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন; যথা, থিয়েটারে যাওয়া ইত্যাদি। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে আইন দ্বারা মানুষকে সৎপথে আনা যায় না। আমার যদি যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া কাহারও মত পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা থাকিত, আমি নিশ্চয়ই গণিকাদিগকে অভিনেত্রী হিসাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে দিতাম না। সকলকে মদ্যপান এবং ধূমপান হইতে

* বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥—গীতা ২।৫৯

বিরত করিতাম। বিখ্যাত সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলিকেও যে সকল হেয় বিজ্ঞাপনে কলঙ্কিত করে, সেইগুলি সবই নিশ্চয় বন্ধ করিয়া দিতাম। কিন্তু হায়! সেইরূপ বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। থাকিলে সুখী হইতাম। এই সকল বিষয় সরকারী আইন বা কংগ্রেসের নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত করিতে গেলে রোগের চেয়ে ঔষধের জ্বালা সম্ভবতঃ আরও শোচনীয় হইবে। এই সবের জন্য প্রয়োজন সুবুদ্ধি-পরিচালিত, ধীর, বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী জনমত। রন্ধনশালাকে পায়খানারূপে কিংবা বৈঠকখানাকে অশ্বশালারূপে ব্যবহার করিবার বিরুদ্ধে কোন আইন নাই। কিন্তু জনমত অর্থাৎ সর্বসাধারণের রুচি এই প্রকার ব্যবস্থা সমর্থন করিবে না। জনমতের অভ্যুদয় কোন কোন ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাই একমাত্র কার্যকরী উপায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৭-'২৫]

৬৯

জুয়াখেলা এবং পাপ

কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে নানা রকম আশ্বাসের কথা উঠিয়াছে। তাহার কতক ন্যায়সঙ্গত এবং নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। অন্যগুলি পূরণ করা যাইতে পারে না। বোম্বাইপ্রদেশে দুর্ভাগ্যবশতঃ জুয়াখেলা বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। কাজেই যাহারা জুয়া খেলে তাহারা ভাবিতেছে ইহাকে আইনসিদ্ধ করা

হইবে এবং বোম্বাই শহরে যে সকল গোপন এবং বে-আইনী জুয়াখেলার আড্ডা আছে সেগুলি আর রাখার আবশ্যক হইবে না। বর্তমানে জুয়াখেলা কতকপরিমাণে আইনসঙ্গত; কিন্তু আমি মনে করি না যদি ব্যাপকভাবে ইহাকে আইনসিদ্ধ করা হয় তবুও বে-আইনী আড্ডা একেবারে লোপ পাইবে। ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা টার্ফ ক্লাবের (Turf Club) একচেটিয়া। কাজেই প্রস্তাব করা হইতেছে একটি অতিরিক্ত প্রবেশদ্বার খুলিতে দেওয়া হউক; তাহা হইলে গরীব লোকেরা আরো সহজে জুয়াখেলায় যোগ দিতে পারিবে। তাহার ফলে অতিরিক্ত রাজস্বের প্রলোভনও দেখান হইয়াছে। গণিকালয়গুলিকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য নিয়মকানুন করিবার কথাও উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হইতেছে যে, ইহাকে আইনসিদ্ধ করা হউক বা না হউক, এই পাপপ্রথা চলিতেই থাকিবে। কাজেই ইহাকে আইনসঙ্গত করাই ভাল,—যাহারা সেখানে যাতায়াত করে তাহারা নিরাপদ হইবে।

আমি আশা করি, মন্ত্রিগণ এই ফাঁদে পা দিবেন না। বেশ্যালয়গুলি সম্বন্ধে কিছু করিবার উপযুক্ত পন্থা এই—স্ত্রীলোকদিগকে দুই দিকে প্রচারকার্য চালাইতে হইবে: (ক) যাহারা জীবিকা অর্জনের জন্য আত্মবিক্রয় করে তাহাদের মধ্যে এবং (খ) পুরুষদিগের মধ্যে; যেন তাহারা লজ্জিত হইয়া তাহাদের ভগিনীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিখে; অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা ঔদ্ধত্যবশতঃই হউক তাহারা ইহাদিগকে দুর্বলতর জীব বলিয়া মনে করে। আমার স্মরণ হয় বহুকাল পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ

দিকে মুক্তিসেনার (Salvation Army) সৎসাহসী লোকেরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া বোম্বাইর কুখ্যাত রাস্তাগুলির মোড়ে পিকেটিং করিত ; সেই সকল স্থান বেশ্যালয়ে পূর্ণ ছিল। এইরূপ কিছু ব্যাপক ও সংঘবদ্ধভাবে না করিবার কোন কারণ নাই। ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু আমদানির মধ্যে উহা অন্যতম। যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তবে আইনের বলে ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা যতটুকু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেইটুকুও তুলিয়া দিতাম। ১৯২০ সালের প্রস্তাবে স্পষ্ট-ভাষায় বলা হইয়াছে যে, আত্মশুদ্ধিই কংগ্রেসের কর্মতালিকার মূলমন্ত্র। কাজেই কোন পাপকার্য হইতে উপজাত আয়ের সহিত কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য মন্ত্রীরা তাঁহাদের অর্জিত ক্ষমতা জনমতকে ঠিক পথে শিক্ষিত ও পরিচালিত করিবার জন্য প্রয়োগ করিবেন এবং উচ্চশ্রেণীর লোকদের ভিতর জুয়াখেলা বন্ধ করিবেন। ইহা আশা করা বৃথা যে তথাকথিত বড়লোকদের কদভ্যাসগুলি অসতর্ক জনসাধারণ অনুকরণ করিবে না। এই তর্ক আমি শুনিয়াছি যে ভাল ঘোড়া জন্মাইবার জন্য ঘোড়দৌড় প্রয়োজনীয়। ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু জুয়াখেলা ছাড়া কি ঘোড়দৌড় হইতে পারে না ? ভাল ঘোড়া উৎপাদনের জন্য জুয়াখেলা কি কিছু সহায়তা করে ?

[হরিজন, ৪-৯-'৩৭]

৭০

আমাদের দুর্গতা ভগিনীগণ

দাক্ষিণাত্যে যতগুলি অভিনন্দনপত্র আমি পাইয়াছি তন্মধ্যে দেবদাসীদের পক্ষে দেওয়া অভিনন্দন অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। মিষ্ট ও সাধু ভাষায় বেশ্যাদিগকে দেবদাসী বলা হয়। যে গোষ্ঠী হইতে এই সকল ভগিনীস্থানীয়া অভাগিনীদিগকে আনা হয়, সেই গোষ্ঠীর লোকেরাই এই অভিনন্দনপত্র রচনা করিয়া আমাকে দেন। যাঁহারা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট জানিতে পারি যে, ভিতর হইতে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। সাক্ষাৎকারী ভদ্রমহোদয়েরা বলিলেন যে, এই সংস্কারের প্রতি জনসাধারণ উদাসীন। কোকনদে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আঘাতে আমি শিহরিয়া উঠি। এবং সেখানকার লোকদিগের সহিত কথাবার্তায় বিষয়টির গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা করি নাই। দ্বিতীয়বার ধাক্কা খাই বরিশালে; সেখানেও ভগিনীস্থানীয়া বহু অভাগিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহাদিগকে "দেবদাসী"ই বল বা অন্য কোন নামে অভিহিত কর, সমস্যা একই। বহু নারী পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসার ইন্ধন-স্বরূপে সতীত্ব বিকাইয়া দিতেছে, ইহা ঘোর লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় এবং গভীর হীনতার পরিচায়ক। আইন-রচয়িতা পুরুষেরা তথাকথিত দুর্বলতর নারীসমাজের উপর যে হীনতা বা অমর্যাদার ভাব চাপাইয়াছে তাহার জন্য ভীষণ শাস্তি

তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। পুরুষের মোহজাল ছিন্ন করিয়া নারী যখন আত্মগৌরবের উপর দাঁড়াইবে এবং পুরুষের রচিত আইন এবং পুরুষের কল্পিত অনুষ্ঠানসকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, সেই বিদ্রোহ যদি অহিংসপথে চালিত হয়, অমোঘ ফল প্রসব করিবে। ভারতের প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য এই সকল হাজার হাজার ভগিনীর অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করা; তাহাদেরই অবৈধ নীতিবিগর্হিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ইহারা পাপজীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা আরও পরিতাপের বিষয়, যে সকল লোক এই সব কদর্য পাপের আগারে গমনাগমন করে তাহাদের অধিকাংশই বিবাহিত এবং সেইজন্য তাহারা দ্বিগুণিত পাপ করে; পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করে এবং সহোদরা ভগিনীর ন্যায় যাহাদের পবিত্রতা অত্যন্ত গৌরবের সহিত তাহাদের রক্ষা করা উচিত সেই সকল ভগিনীর উপরে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আমরা ভারতবাসিগণ যদি আমাদের আত্মসম্মানে প্রবুদ্ধ হই তবে এই পাপ একদিনের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না।

ক্ষুধার্ত মানব যদি একটি কলা চুরি করে তবে অপরাধ হয়; অভাবে পড়িয়া যুবক পকেট মারিলে অপরাধ হয়। আমাদের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই সকল লোক যদি এই পাপে নিমগ্ন না থাকিত তবে এই প্রকারের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পূর্বোক্ত অপরাধ হইতে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। চুরি করা এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করা, এই উভয়ের মধ্যে সমাজের পক্ষে কোনটি অধিক অকল্যাণকর বা গর্হিত?

আমায় যেন কেহ না বলে, আত্মবিক্রয়ে পতিতার সম্মতি ও সাহচর্য থাকে, কিন্তু ঘোড়দৌড়ে লক্ষপতি এবং গাঁটকাটার তেমন যোগ থাকে না ; তাহা হইলে বলিব, যে দুষ্ট বালক পকেট কাটে এবং যে বদমায়েস তাহার শিকারকে ঔষধপ্রয়োগে অচেতন করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তির দলিল লিখাইয়া লয়—এই উভয়ের মধ্যে কে অধিক অপরাধী ? পুরুষ কি নানা সূক্ষ্ম কৌশলে এবং অসদুপায়ে প্রথমে নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বভাবজাত সতীধর্মকে অপহরণ করে না ? এবং তৎপর তাহার উপর পাপাচরণ করিয়া তাহাকেই পাপপথে সহকারিণী করিয়া তোলে না ? অথবা "পঞ্চমাঙ্গের" ন্যায় কোন কোন শ্রেণীর নারী কি লাঞ্ছিত জীবনযাপন করিবার জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ? বিবাহিত, অবিবাহিত প্রত্যেক যুবককে আমি যাহা লিখিলাম তাহার গূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে বলি। এই সামাজিক ব্যাধি, এই নৈতিক কুষ্ঠ সম্বন্ধে আমি যে সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি তাহা সব লেখনীতে আসে না। কল্পনার সাহায্যে বাকীটুকু পূরণ করিয়া নিতে হইবে এবং যদি সে নিজে এই দোষে দোষী হইয়া থাকে তবে যেন লজ্জায় নতশিরে এবং ভয়ে কম্পিত হইয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক পূতচরিত্র ব্যক্তি যেখানেই থাকুন, তাঁহার চতুর্দিকে পবিত্রতার হাওয়া সৃষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আমি জানি শেষের কথাটি বলা সহজ কিন্তু কার্যে পরিণত করা কঠিন। বিষয়টি গুরুতর এবং গুরুতর বলিয়াই প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। অভাগিনীদের ভিতর

কাজ করিতে হইলে সেই কাজ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। যাহারা গণিকালয়ে গমন করে তাহাদের মধ্যেও কাজ করিবার কথা আমার উক্তিতে মিলিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬ ৪-'২৫

৭১

দ্বিগুণ অপরাধ

এই নৈতিক কলুষ আরও গভীরভাবে আঘাত করিয়াছিল গান্ধীজীকে। এই নারীগণ তাহাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একত্রে উপবিষ্ট ছিল; লোকচক্ষে ইহা মর্মান্তিক ব্যাপার। সামাজিক প্রথার নামে এই শয়তানের খেলা তাহাদিগকে যে বিপন্ন অবস্থায় পতিত করিয়াছে তাহা হইতে কি উপায়ে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে উভয় পক্ষের কেহই তাহা জানিত না। সকলেই অসহায়-ভাবে বলিয়া উঠিল, "আমাদের কেহই এই পাপজীবন পছন্দ করি না, কিন্তু কি উপায়ে আমরা বাঁচিব ?" "আচ্ছা, যদি আমি পবিত্র পরিবেশের মধ্যে তোমাদিগকে নিয়া উপযুক্ত খাওয়া-পরা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে তোমরা কি পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যাইবে না ?"— গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "হাঁ"। কিন্তু এই বিষয়ে গান্ধীজীর নিকট ভ্রান্তির স্থান ছিল না। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বিষয়টির উল্লেখ করেন এবং অগ্নিময়ী বাণীর তেজে পতিতাগণের অর্ধসুপ্ত বিবেককে প্রদীপ্ত করিয়া তুলেন।

"তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে যখন এই ঘৃণিত প্রথার মর্ম অনুভব করিতেছিলাম তখন অসদুদ্দেশ্যে নাবালিকাদিগকে দেবতার নামে উৎসর্গ করার বিরুদ্ধে আমার সমগ্র আত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাদিগকে 'দেবদাসী' আখ্যা দিয়া ধর্মের নামে আমরা স্বয়ং ভগবানের নামে কলঙ্ক ঘোষণা করি ; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি অপরাধ করি—আমাদের ইন্দ্রিয়লিপ্সা তৃপ্তির জন্য এই সকল ভগিনীকে নিয়োজিত করি এবং একই নিঃশ্বাসে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া থাকি। যখন ভাবি একদল লোক এই পাপকার্যে নিরত রহিয়াছে এবং অপর একদল লোক তাহাদের এই বীভৎস পাপকে প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছে তখন জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পড়ি।, আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি, যখন আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম, তাহাদের চোখে কুৎসিত কিছু দেখিতে পাই নাই; এবং অপর যে কোন নারীর ন্যায় রুচি মার্জিত এবং চরিত্র বিশুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। আমাদের আপন ভগিনীদের এবং তাহাদের মধ্যে কি বৈষম্য থাকিতে পারে ? আমাদের নিজ ভগিনীগণকে আমরা পাপকার্যে লিপ্ত হইতে দিই না—কোন্ সাহসে ইহাদিগকে তাহা করিতে দিই ? যে সকল হিন্দু কোন না কোন ভাবে এই সকল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারা সমাজের এই কণ্টক দূরীভূত করুন। আমি তাহাদিগকে যে আশা দিয়াছি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে তাহাদের অধিকাংশই এই পাপপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু যদি তাহারা তাহা না পারে তবে যে সমাজে তাহারা এরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে সেই সমাজকে

আমি দোষী করিব—তাহাদিগকে নয়। এই সকল ভগিনীকে সহায়তা করা এবং যাহাতে এই পাপপঙ্কিল জীবন হইতে তাহারা উদ্ধার পায় সেদিকে চেষ্টা করা আপনাদের কর্তব্য। আমি জানি, পুনরায় যখন প্রলোভন তাহাদের সম্মুখে আসিবে, তাহা প্রতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। যদি পুরুষ তাহার লিপ্সা সংযত করে এবং সমাজ এই পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে অতি সহজেই সমাজ হইতে এই পাপ দূরীভূত করা সম্ভবপর হইবে।”*

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-২-'২৭]

৭২

দেবদাসী

অক্লান্তকর্মী ডাঃ এস্. মথুলক্ষ্মী রেড্ডী লিখিতেছেন—

“আপনি হিন্দু দেবালয়ে দেবদাসীপ্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা করিতেছেন দেখিয়া আমি এই অমঙ্গল দূর করিবার মহৎ কাজে আপনার সহায়তা প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি। এই প্রদেশে (মাদ্রাজ) ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলিয়া মনে হইতেছে। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা এবং এমনকি খ্যাতনামা কংগ্রেসসেবিগণের অনেকেই আমার সংস্কারমূলক কাজগুলির বিরোধিতা করিতেছেন এবং এই কুখ্যাত প্রথা সমর্থন করিতেছেন।

“মৎকর্তৃক আনীত দেবদাসী বিল আইনে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ইনামভোগী দেবদাসীগণের প্রতিই প্রযোজ্য। দেবদাসীদের

* তামিলনাদে মায়াভরমে গান্ধীজীর সফর বিবরণী হইতে উদ্ধৃত।

অপর একটি অংশ আছে—যাহারা দেবতার নামে নিজদিগকে উৎসর্গ করে, শুধু ব্যভিচার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিবার জন্য। ইহা শিশুদিগকে লইয়া পেশাদারী ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ শিশুদিগকে ক্রয় করা হয়; তাহারা হিন্দু আইনমতে পোষ্য-সন্তানরূপে গৃহীতও হইয়া থাকে। যে বয়সে তাহাদিগকে এই জঘন্য জীবনযাত্রায় প্রবর্তিত করা হয় তখন তাহারা নিষ্পাপ এবং নিজের বিবেচনামতে কোন বিষয় বিচার করিতে বা কোন কাজ করিতে অসমর্থ। এই পাপজীবনের শৃঙ্খল হইতে তাহারা মুক্ত হইতে প্রায়ই সমর্থ হয় না। এই সমাজের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে আমি বহু আবেদন ও স্মারকলিপি পাইয়াছি—যে সকল পাপিষ্ঠ শিশুদিগের শরীর ও আত্মা নিয়া এই ব্যবসা চালায় তাহাদিগকে শাস্তি-প্রদানের জন্য আইন পাশ করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

"দণ্ডবিধি আইনের ৩৭২ এবং ৩৭৩ ধারাগুলি এই ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নাই। সেইজন্য আর একটি বিলের আমি নোটিশ দিয়াছি এবং উহার সফলতার জন্য আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। কেহ কেহ এই তর্ক তুলিবেন যে, যতদিন জনসমাজ এই প্রথার মন্দ দিকটা হৃদয়ঙ্গম না করিবে ততদিন আইনদ্বারা কোন উপকার হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে—জনসমাজের বিশিষ্ট অংশ এই অবিচার উপলব্ধি করিতেছে। এখন আমারও এই প্রতীতি হইতেছে যে, যদি আইনসিদ্ধ কোন ক্ষমতা থাকিত তবে আমিও অপরাধী পিতামাতার হস্ত হইতে এই সকল বালিকাদের অনেককে রক্ষা করিতে পারিতাম।

"দেবদাসীদের নিজ সমাজের ভিতরও বিশেষ জাগরণ আসিয়াছে এবং তাহারা ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালাইতেছে। কিন্তু উচ্চবংশ-জাত লোকেরা এই সমাজের সংস্কার-প্রচেষ্টাতে কোনরূপ সহায়তা

করিতেছে না দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। তদুপরি অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায়, এমনকি বোম্বাই, বাঙ্গলা প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও এই প্রদেশে শিশু-সংরক্ষণী আইন নাই বলিলেই হয়।

"আমরা জানি, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় ও নৈতিক সংস্কারগুলির অনুকূলে জনমত গঠিত হওয়ার পূর্বেই সভ্যতায় অগ্রগামী দেশগুলিতে সর্বদা এই সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এই প্রদেশে গবর্নমেণ্টকে ততটা দোষ দেওয়া যায় না : এই প্রদেশের অভিজাতবর্গ উপযুক্তরূপে এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না যে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল শিশুই আমাদের যত্ন ও সহানুভূতির পাত্র ; এই নির্দোষ শিশুদিগকে এই ভয়াবহ জীবনের সম্ভাবনা হইতে নির্মুক্ত করিবার কার্যে তাঁহাদিগকে জাতি ও বর্ণগত সকল প্রকার কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে দাঁড়াইতে হইবে।"

—আমি আন্তরিকতার সহিত লেখিকার প্রস্তাব সমর্থন করি। বস্তুতঃ আমি বিবেচনা করি, প্রস্তাবিত আইন সময়োপযোগীই হইবে ; জনমত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র প্রকাশ্য শিক্ষিত জনমত কোনও আকারে বা প্রকারে এই প্রথা প্রচলিত রাখিবার প্রতিকূলে রহিয়াছে। জনমত বিরুদ্ধে থাকিলে, আফিমের আড্ডাগুলি বজায় রাখিবার পক্ষে সেগুলির মালিকদের মতের যেমন কোন মূল্যই থাকে না সেইরূপ এই পাপব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের মতেরও কোন মূল্য থাকিবে না। দেবদাসীপ্রথা সমর্থনকারীদেরই কলঙ্কস্বরূপ। জনসাধারণ জড়-ভাবাপন্ন না হইলে ইহা বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইত। যে কারণেই হউক, এই দেশে জনসাধারণের হিতাহিত জ্ঞান সুপ্ত অবস্থায়

থাকে। অনেক অন্যায় বিষয়ের ভয়াবহ গুরুত্ব প্রায়শঃ অনুভব করিয়াও ঔদাসীন্য এবং মানসিক জড়তাবশতঃ ইহারা কার্যে অগ্রসর হইতে চায় না। ডাক্তার রেড্ডীর ন্যায় কোন উদ্যোগী কর্মী ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই উদাসীনতার মধ্যেও জনগণের শুভবুদ্ধি যতটুকু সম্ভব সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবে। আমার মতে ডাঃ রেড্ডীর প্রস্তাব খুব সময়োপযোগী। পূর্বেই এই প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করা উচিত ছিল। অন্ততঃ আমি আশা করি, যাঁহারা ধর্মজীবনে এবং সাধারণ সামাজিক জীবনে পবিত্রতার অনুরাগী, তাঁহাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি তিনি পাইবেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৮-'২৯]

৭৩

প্রায় হরিজনদের অনুরূপ

অন্ধ্রদেশের জনৈক গ্র্যাজুয়েট একটি দেবদাসীকে বিবাহ করিয়া লিখিতেছেন—

"আমি বহুপূর্বে আপনাকে লিখিব মনে করিয়াছিলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি।

"দেবদাসী সম্প্রদায়ে আমার জন্ম। সামাজিক অত্যাচারে আমার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠে। নর্তকীদের ব্যবসার চেয়ে পৃথিবীতে অধিক কদর্য আর কোন বৃত্তি আছে বলিয়া কি আপনি মনে করেন, মহাত্মাজী? গণিকাবৃত্তি একটি সমগ্র সম্প্রদায়ে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা কি ভারতবর্ষের কলঙ্ক নয়?

“আমি মনে করি অন্ধ্রদেশ এই কুপ্রথার কেন্দ্রস্থল। এখানে হিন্দুসমাজে এই নর্তকীগণকে নিযুক্ত করা হয়—বিশেষভাবে বিবাহ এবং দেবালয়ে উৎসবের সময়। তাহারা পবিত্র দেবতার সম্মুখে লজ্জাজনক হাবভাব দেখাইয়া অশ্লীল গান গায় এবং নববিবাহিত দম্পতীর সম্মুখে কুরুচিপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

“যে সম্প্রদায়ের সকলেই ব্যভিচারবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে তাহাদের দুঃখদুর্দশার সীমা নাই। এখানকার যুবকেরা এই কুপ্রথা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। সাহায্য ও উপদেশ পাওয়া তাহাদের বিশেষ আবশ্যক। হরিজন আন্দোলনের ন্যায় অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুতর মনে করিয়া আপনি কি এ বিষয়ে কিছু করিবেন না? এই ব্যাপারকে অনুগ্রহপূর্বক আপনার হৃদয়ের কোণে স্থান দিয়া ইহাকে সাধারণের গোচরে আনিবেন। শুধু কংগ্রেস নয়, সমগ্র জনমত আপনার পশ্চাতে রহিয়াছে। বেশ্যালয়সম্বন্ধীয় বিল এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন যাহা করিতে পারেন নাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার মুখনিঃসৃত বাণী তাহা করিতে পারিবে। আমি আমার সম্প্রদায়ের একটি বালিকাকে আইনতঃ এবং ধর্মতঃ বিবাহ করিয়াছি। আমার দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে। আমার দৃষ্টিতে আমার স্ত্রী যে কোন হিন্দুস্ত্রীর ন্যায় পূতচরিত্রা। সমাজ তথাপি আমাদিগকে ঘৃণা করে। পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের উপর দিয়া চলিতেছে। যদিও আমরা উভয়েই এই পাপ হইতে মুক্ত তথাপি পূর্বপুরুষের ব্যভিচারের কলঙ্ক আমাদের গায়ে লাগিয়া আছে।

”হরিজনেরা এবং দেবদাসীরা—শুধু এই দুইটি সম্প্রদায়—একই রকম পাপপঙ্কে ডুবিয়া আছে। নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে তাহাদের নিজেদেরই নিজেকে সাহায্য করিতে হইবে। তথাপি তাহারা স্বচেষ্টায় করিলে যত সময় লাগিবে, আপনার ন্যায় উপদেষ্টা তাহাদিগকে

এবং সমাজকে তদপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিবেন। হরিজনদিগের উন্নয়নে আপনার উৎসাহ-উদ্যমের মধ্যে অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের সমস্থানীয় এই সম্প্রদায়কে ভুলিবেন না।”

—আমার প্রতি যে ক্ষমতা আরোপ করা হইয়াছে তাহা আমার থাকিলে সুখী হইতাম। আমার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডী সম্বন্ধে আমি দুঃখিত চিত্তে সর্বদা সজাগ। লেখক বোধ হয় জানেন না যে, আমি যখন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা সম্পাদনা করিতাম তখন সর্বদাই দেবদাসীপ্রথা এবং সাধারণতঃ ব্যভিচারবৃত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সেই চেষ্টাতে এই অমঙ্গল দূরীভূত হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ হইয়াছে। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সম্পাদনাকালে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে ফললাভ করিয়াছি এখন 'হরিজনে' সেই সমস্যার পুনরালোচনা করিয়া তদপেক্ষা ভাল ফল পাইব, এই আশা আমার নাই। যদি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ইহা ফলদায়ক হয় তবে আমি প্রীতিলাভ করিব।

লেখক দেবদাসীদিগকে হরিজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন। দুঃখদুর্দশার বৈষম্য কত তাহা মাপিতে গেলে শুধু সময় নষ্ট করা হইবে মাত্র। যদি হিন্দুধর্মের গ্লানি দূর করিয়া উহাকে পবিত্রীকৃত করিতে হয় তবে অস্পৃশ্যতার ন্যায় ব্যভিচারবৃত্তিকে চিরস্থায়ী করিবার এই কুপ্রথাও দূরীভূত করিতে হইবে। যাঁহারা সমাজের এই দুষ্ট ব্যাধি দূর করিবার উদার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলার

সহিত কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। এবং যদি তাঁহাদের চেষ্টা আশু ফলবতী নাও হয় তথাপি তাঁহারা হতাশ হইবেন না। তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র নিজেদের চতুঃপার্শ্বের এই কুপ্রথা নিরাকরণে নিবদ্ধ থাকুক। এই সমস্যার সমাধান দুইপ্রকারে করা সম্ভব। যাহারা তাহাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেবদাসীদিগকে নিযুক্ত করে তাহাদের মধ্যে এবং দেবদাসী সম্প্রদায়ের ভিতর— এই উভয়স্থানেই তাহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। যদি দেবদাসীরা সমাজে পাপের ইন্ধন যোগাইতে অস্বীকার করে এই কুপ্রথা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে।

কিন্তু কার্যতঃ বিষয়টি তত সহজ নয়। ক্ষুধার্তের দৃষ্টিতে কোন পাপই পাপ বলিয়া মনে হয় না। এমনকি দ্রোণ এবং ভীষ্মের মত, দেবদাসীরা এই পাপের সমর্থনে তাহাদের উদরের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে। তাহাদের ব্যবসা যে পাপজনক অভ্যাসের বশে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। কাজেই ব্যভিচারের পরিবর্তে সদুপায়ের দ্বারা জীবিকার্জনের পথ তাহাদের জন্য বাহির করিতে হইবে। তারপর সমাজের মধ্যেও এ বিষয়ে কাজ রহিয়াছে। যে সকল উৎসবে এবং বিবাহে দেবদাসীরা নিযুক্ত হয় সেগুলির সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সেগুলির ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহাদিগকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইতে হইবে। হুকুম চালাইয়া সমাজের সংস্কার করা যায় না, ইহা সংস্কারকদের মনে রাখিতে হইবে। সমাজের বিচারবুদ্ধি ও প্রাণ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে হইবে। সাধারণতঃ শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা

বুঝি তাহা যেমন অত্যাবশ্যক—বলিতে গেলে সর্বপ্রকার সংস্কারই তদ্রূপ অত্যাবশ্যক সামাজিক শিক্ষাবিশেষ। কাজেই সংস্কারমাত্রেই শিক্ষাবিজ্ঞান এবং যখন বিজ্ঞানচর্চার মত উহা শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠার সহিত পরিচালিত হয় কেবল তখনই ইহা ফলপ্রসূ হয়।

লেখক সৎসাহস দেখাইয়া একজন দেবদাসীকে বিবাহ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। নিজ বিবেকের অনুমোদনের ভিতর তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলে তিনি দেখিবেন যে, তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রতি সমাজের বিরূপ ভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

[হরিজন, ১৪-৯-'৩৪]

৭৪

আইনের দ্বারা ব্যভিচার নিরোধ

ডাক্তার মথুলক্ষ্মী রেড্ডী কংগ্রেসপরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট যে সকল আশ্বাস পাইবার আশা করা হইতেছে তাহার আর একটি প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ আশাভরসা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। কংগ্রেসের প্রতিপক্ষগণও স্বীকার করিয়াছেন যে মন্ত্রিগণ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতেছেন। শাসনব্যবস্থা প্রকৃত ভারতীয় পরিবেশের ভিতর আনিবার জন্য কংগ্রেসমন্ত্রিমণ্ডলীগুলি দেশকল্যাণের অনুষ্ঠানে পরস্পরের সহিত যেন প্রতিযোগিতা করিতেছে। দেবদাসীদিগকে

পাপপঙ্কিল জীবনে পাতিত করিবার কুপ্রথা দূর করিবার জন্য ডাঃ মথুলক্ষ্মী রেড্ডী মাদ্রাজ মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট তাঁহার আনীত বিলকে আইনে পরিণত করিবার জন্য প্রকাশ্য আবেদন করিয়াছেন। বিলটি আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। বিলের মূলনীতি যুক্তির উপর এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে এতদিনেও ইহা দক্ষিণপ্রদেশে কেন আইনে পরিণত হয় নাই তাহাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আমি ডাঃ মথুলক্ষ্মীর সহিত এই বিষয়ে একমত যে মাদকদ্রব্য নিবারণের ন্যায় এই সংস্কারও অত্যন্ত জরুরী। তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, অনেক বৎসর পূর্বে মাদ্রাজের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এখন আইনসঙ্গতরূপে এই সমস্যার যথোচিত বিধান করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে বলিয়া তিনি এ সম্বন্ধে যে কম আগ্রহান্বিত নন তাহা আমি জানি। ডাঃ রেড্ডীর সহিত আমি আশা করি যে অনতিকাল-মধ্যে দেবদাসীপ্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবে।

[হরিজন, ২৫-৯-'৩৭]

৭৫

মহীশূরে হিন্দু

বাঙ্গালোর হইতে শ্রীভাষ্যাম্ আয়েঙ্গার লিখিতেছেন—

"যে সকল মূলনীতি অনুসারে বর্তমানে হিন্দু আইন পরিচালিত হয় সেগুলি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং তাহা ন্যায় ও বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধে। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

"১। ভগিনীর কন্যা, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, বিমাতা এই সকল অতি-ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াদের ওয়ারিশী স্বত্বে কোন অধিকার নাই। যদি কেহ তাহার বিধবা পুত্রবধূকে একমাত্র আত্মীয়রূপে বর্তমান রাখিয়া মারা যায় তবে তাহার সম্পত্তি গবর্নমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হয় এবং যে নিরুপায় বালিকা তাহার সব ছাড়িয়া স্বামীর সংসারে আসিয়াছিল তাহাকে গিয়া পথে দাঁড়াইতে হয়।

"২। দূর জ্ঞাতিবর্গ অগ্রে পাইবে এই নিয়ম থাকায়, এমনকি যে সকল ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ওয়ারিশের তালিকায় আছে তাহারা কোন সুযোগ পায় না। ভগিনী একজন ওয়ারিশ; কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি তাহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে পঞ্চমস্থানের কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া মারা যায় তবে ভগিনী কিছুই পায় না। পুত্রের কন্যা, ভগিনীর পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্বন্ধেও এইরূপ।

"৩। স্ত্রীলোকেরা যে সম্পত্তি ওয়ারিশীসূত্রে বা দানসূত্রে পায় তাহাতে তাহারা নির্ব্যূঢ় স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। স্বামীর সম্পত্তি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিধবাকে সংরক্ষণ করিতে হয়; যদি নিজের ভরণপোষণের জন্যও তিনি অধিক ব্যয় করেন বা রেহান দিয়া ঋণ গ্রহণ করেন, দূর 'দায়াদ' (জ্ঞাতি) তাহার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে। এখানে মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত। সেই আইনমতে স্ত্রীলোকেরা যে কোন প্রকারে সম্পত্তিলাভ করুক না কেন, তাহা তাহাদের স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা তাহারা যদৃচ্ছা বিনিয়োগ করিতে পারে। প্রিভি কাউন্সিল ইহা মানিতে অস্বীকার করিয়াছে; কারণ ভারত-বাসীরা স্ত্রীলোকদিগকে অক্ষম বলিয়া মনে করে এবং মিতাক্ষরার রচয়িতা তাহাদের দৃষ্টিতে অগ্নিখাদক বা দ্বন্দ্বপ্রিয় লোক।

"৪। মূক ও বধিরগণ ওয়ারিশী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত। এই ক্ষেত্রে আমরা খোঁড়াকে তাহার নির্ভরদণ্ড দ্বারা প্রহার করিতেছি।

"৫। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে বিধবাবিবাহ যেরূপ আইনসিদ্ধ, মহীশূরে তাহা নহে।

"৬। অরজাঃ কন্যার বিবাহ আইনসিদ্ধ কিনা সন্দেহস্থল। বালিকাদের বেলায় সহবাস-সম্মতির বয়স ১৪ হওয়া উচিত।

"৭। লোকমত অনুকূল হইলে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যায়। অতীতে ভারতবর্ষে ইহা ছিল। পরাশর সংহিতায় প্রথম স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী যে সকল অবস্থায় ও কারণে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে তাহার উল্লেখ আছে।

"৮। বর্তমান আইনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ। সেগুলিকে আইনসঙ্গত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালের লোকদের ভিতর এই প্রথার অবাধ প্রচলন ছিল। বশিষ্ঠ, ব্যাস, নারদ, পরাশর প্রমুখ আমাদের বহু ঋষি অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের সন্ততি। যদি আইনমতে আমি খৃষ্টান রমণীকে বিবাহ করিতে পারি তবে অন্যজাতীয় হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিতে পারিব না কেন?

"৯। যে পিতৃমাতৃহীন অনাথ, সে পোষ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। পোষ্যরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য যদি কোন বালক থাকে তবে সেই; অথচ হিন্দুশাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ।

"১০। স্বামী অনুমতি না দিলে বা 'সপিণ্ড'গণ সম্মতি না দিলে কোন বিধবা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারে না। যদি স্বামী পোষ্য-গ্রহণ নিষেধ করিয়া না গিয়া থাকেন তবে পোষ্যগ্রহণ করার অনুমতি আছে এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিধবাকে

পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত। বোম্বাইয়ে এই আইন প্রচলিত আছে।

"এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়। আমি কয়েকটি মাত্র নির্বাচিত করিয়াছি।

"চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই অত্যাচার ও অসঙ্গতির গুরুত্ব অনুভব করিয়া সংস্কার করিতে ইচ্ছুক। নূতন আইন প্রণয়ন দ্বারাই প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করা সম্ভব। জনমত সংগ্রহ না করিয়া ব্যবস্থাপক সভাও আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। এবং একটি কমিটি সেই উদ্দেশ্যে গঠন না করিয়া জনমত সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। সেইজন্য আমাদের ব্যবস্থাপক সভার গত বাজেট অধিবেশনের সময় এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করিবার প্রস্তাব আনিয়াছিলাম। কমিটি সাক্ষ্যপ্রমাণ লইবে, তৎপর তাহারা আইন প্রণয়ন করার পক্ষে উপদেশ ও মন্তব্যাদি সহ একটি বিবরণী প্রকাশ করিবে। সভায় এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"এই কমিটি গঠিত হওয়ার পক্ষে মহীশূর রাজ্যে লোকেদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাহা গঠিত হয় নাই। ইংরেজ-শাসিত ভারতে এই বিষয়ে কোনরূপ প্রচেষ্টা এখনও না হওয়ায় এই আশঙ্কা হয় যে মহীশূর রাজ্য এইরূপ কোন চেষ্টা করিলে হাস্যাস্পদ হইবে। ইহা অযৌক্তিক এবং আপনি সেরূপ বলিয়াছেন। মহীশূর এই কার্য আরম্ভ করিবার পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে অনেক বাধাবিঘ্ন প্রকৃতপক্ষে রহিয়াছে; মহীশূরের যে সকল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে সেইগুলি উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে মূর্খতার কাজ হইবে। আমাদের বর্তমান মহারাজা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং বর্তমান দেওয়ানও সমভাবে উৎসাহী এবং প্রগতিশীল।

যদি ঈপ্সিত সংস্কারগুলি এই সময় না করিতে পারা যায় তবে আমরা উহা করিতে কখনও আশা করিতে পারি না।

"এই বিষয়ে আপনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে আলোচনা করিবেন কি?"

—আমি উপরের বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন না ভাবেন যে, লেখকের উপদিষ্ট সংস্কারসমূহের প্রত্যেকটিই আমি অনুমোদন করিতেছি। তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় যে অত্যন্ত জরুরী এবং আশুপ্রতিকারযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা হিন্দুসমাজের বর্তমান সময়ের অনুপযোগী বিষয়গুলি দূর করিতে চান উপরিউক্ত সবগুলি বিষয় যে তাঁহাদের গভীরভাবে আলোচনার যোগ্য তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্বেও হিন্দু আইন দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়মিত হইত; কিন্তু তখন ইহার এত কড়াকড়ি ছিল না। স্মৃতির মধ্যে যে সকল নিয়ম ও বিধি লিপিবদ্ধ হইত সেগুলি অপরিবর্তনীয় ছিল না; উহা সামাজিক আচার-পদ্ধতির পথনির্দেশ করিত মাত্র। আধুনিক আইন-ব্যবসায়ীরা আইনের বৈধতা বলিতে যাহা বুঝেন সেগুলির তদ্রূপ কিছু ছিল না। স্মৃতির বিধি-নিষেধগুলি আইনের অনুমোদন অপেক্ষা সামাজিক অনুমোদনের দ্বারাই প্রবর্তিত ও কার্যে পরিণত হইত। স্মৃতির ভিতর পরস্পরবিরোধী বচন রহিয়াছে; আমরা যেমন পরিবর্তনের ভিতর দিয়া উন্নতির পথে যাই, সেইরূপ স্মৃতিগুলিও সমাজবিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্দেশ্যে সর্বদাই পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রবীণ রাজন্যবর্গ নূতন নূতন ব্যাখ্যা অবাধে করাইয়া নিতে পারিতেন। হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রসকল কোন সময়ই অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয় ছিল না; বর্তমানে কিন্তু সেইরূপই বলা হইতেছে। সমাজের শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য দাবী করিবার যোগ্য বুদ্ধিবিবেচনা ও ক্ষমতা সেকালের রাজাদের ও তাঁহাদের মন্ত্রণাদাতাগণের নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, স্মৃতি এবং শাস্ত্র বলিয়া যাহা অভিহিত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয়। যে সকল স্মৃতি বা শাস্ত্রবাক্য বর্তমানে কার্যে পরিণত করা যায় না অথবা আমাদের নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী, আমরা সুযোগ বুঝিয়া সেগুলি উপেক্ষা করি। এই মনোভাব অত্যন্ত অসঙ্গত; ইহার পরিবর্তন একদিন না একদিন যে প্রকারেই হউক অবশ্য করিতেই হইবে, যদি হিন্দুসমাজ মানবের এই ক্রমোন্নতির যুগে অগ্রগতিশীল হইয়া সভ্যজগতে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিতে চাহে। ইংরেজ-শাসকেরা এই সকল পরিবর্তন করিতে পারে না, যেহেতু তাহাদের ধর্ম ও তাহাদের আদর্শ ভিন্নরকমের। তাহাদের লক্ষ্য বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করা এবং তাহা লাভ করিবার জন্য হিন্দুসমাজের নৈতিক বা অন্যপ্রকারের যে কোন স্বার্থ বলি দেওয়া সেই আদর্শের অন্তর্গত। যদি হিন্দুসমাজের জনমত স্পষ্টভাবে দাবী না করে এবং সেই জনমত দ্বারা যদি ব্রিটিশ-শাসকদের আদর্শ কোনপ্রকারে ব্যাহত হয় তবে আমাদের তথাকথিত আইন বা প্রথাগুলির কোন আমূল পরিবর্তন সমর্থন বা তজ্জন্য কোন চেষ্টা, উদ্যোগ তাহারা

করিবে না। ইংরেজ-শাসিত ভারতে বিভিন্নরকমের আইন এবং বিভিন্নরকমের চিন্তাধারা ও মত বর্তমান রহিয়াছে। এত বড় বিস্তৃত দেশে একই বিষয়ে হিন্দুদের জনমত কেন্দ্রীভূত করা কঠিন। যে জনমত বিদ্যমান আছে তাহা স্বভাবতঃ এবং বিশেষ অনিবার্য কারণে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম লইয়াই ব্যাপৃত। মহীশূরের ন্যায় রাজ্যে এইরূপ কোন বাধাবিঘ্ন বা ব্যাপক আন্দোলন নাই। আমার মতে হিন্দু আইনের যে সকল বিষয় বর্তমান সময়োপযোগী নয় এবং তদ্রূপ যাহা কিছু আছে তাহা দূর করিবার জন্য মহীশূরের কর্তব্য ব্রিটিশ-ভারতের অগ্রবর্তী হওয়া। মহীশূর প্রতিষ্ঠাশালী এবং বৃহৎ রাজ্য; সেখানে এই সকল পরিবর্তন আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্ট স্থান। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ইহা নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এখানে ব্যবস্থাপক সভা আছে—প্রায় সকলপ্রকার মতাবলম্বী প্রতিনিধি সেখানে আছেন, কাজেই সামাজিক সংস্কার করিবার ইহা প্রশস্ত ক্ষেত্র। দেখা যাইতেছে, হিন্দু আইনে আবশ্যক বোধে কি কি পরিবর্তন করা বিধেয় তাহা বিবেচনা করিবার জন্য ইতঃপূর্বেই একটি কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব সেখানে গৃহীত হইয়াছে। সনাতন মতাবলম্বী এবং প্রগতিশীল হিন্দুদিগের প্রতিনিধি লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইলে ইহার অভিমত কার্যকরী হইবে এবং আবশ্যকীয় পরিবর্তনের পথ সুগম করিয়া দিবে। এই প্রকার কমিটি গঠনের ব্যবস্থা মহীশূর ব্যবস্থাপক সভায় কিরূপ আমি জানি না, কিন্তু আমি মনে করি, উহা প্রয়োজনমত পরিবর্তনশীল

এবং মহীশূর স্টেটের বাহির হইতেও তাহাতে সভ্য নিযুক্ত হইতে পারে, অথবা মনোনীত সভ্যেরা মিলিয়া রাজ্যের বাহির হইতেও সভ্য নির্বাচিত করিতে পারে। শ্রীভাষ্যাম্ আয়েঙ্গার অন্ততঃ ইহা দেখাইয়াছেন যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের সংস্কার অত্যাবশ্যক। এইরূপ সংস্কার বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল; তথাপি আমি মনে করি, এই সকল সংস্কারকার্য আরম্ভ করিবার পক্ষে মহীশূর হইতে অধিকতর উপযুক্ত আর কোন রাজ্য নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-'২৭]

৭৬

ভারতের নারীগণের প্রতি

প্রিয় ভগিনীগণ, লোকমান্য তিলকের স্মৃতিতর্পণে বোম্বাই নগরীতে বিগত ৩১শে জুলাই যাজ্ঞিক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিলাতী কাপড় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর নির্ধারিত করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বহুমূল্য শাড়ী এবং অন্যান্য পোশাকের বিশাল স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল শাড়ী এবং পোশাক এযাবৎ আপনারা সৌখীন এবং সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। আমি মনে করি, মূল্যবান কাপড়গুলি দিয়া দেওয়া ভগিনীদের পক্ষে উপযুক্ত এবং বুদ্ধিমত্তার কাজ হইয়াছে।

প্লেগ-বিষ-সংক্রামিত দ্রব্যাদির ন্যায় ইহার ধ্বংসই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং মিতব্যয়িতার পরিচায়ক। রাষ্ট্রীয় সমাজের আরো গুরুতর ব্যাধিসমূহ নিবারণের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল।

বিগত এক বৎসর যাবৎ ভারতের নারীগণ মাতৃভূমির যে সেবা করিয়াছেন তাহা আশ্চর্যরূপে ফলপ্রসূ হইয়াছে। দয়ার মূর্তিমতী দেবদূতরূপে আপনারা নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। আপনাদের সুন্দর বহুমূল্য অলঙ্কার ও নগদ টাকা আপনারা অকাতরে দান করিয়াছেন। অর্থসংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন। কেহ কেহ প্রহরীর কার্যও (পিকেটিং) করিয়াছেন, যেন নিষিদ্ধ দ্রব্য কেহ ব্যবহার না করিতে পারে। কেহ কেহ বিচিত্রবর্ণের নানারকম মনোহর পোশাক ব্যবহার করিতেন এবং তাহাও দিনে কয়েকবার পরিবর্তিত হইত ; তাঁহারা এখন নির্মল শুভ্র খাদির মোটা শাড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নারীর স্বভাবজাত পবিত্রতার বিষয়ই খাদি স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতের জন্য, খিলাফতের জন্য এবং পাঞ্জাবের জন্য আপনারা এইসব করিয়াছেন। আপনাদের কথা বা কার্যে কপটতার কোন চিহ্ন নাই। রাগ ও দ্বেষ বিবর্জিত সর্বাপেক্ষা পবিত্র ত্যাগ আপনাদেরই। আপনাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, সারা ভারতবর্ষব্যাপী আপনাদের স্বপ্রণোদিত প্রেমের আহ্বান আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছে যে ভগবান আমাদিগের সহায়। আমাদের সংগ্রাম যে আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম তাহার আর কোন প্রমাণ দরকার করে না—কারণ

লক্ষ লক্ষ ভারতের নারী তাহাতে যোগদান করিয়া সহায়তা করিতেছেন।

আপনারা যথেষ্ট দান করিয়াছেন, কিন্তু এখন আরো কাজ আপনাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পুরুষেরা দান করিয়াছে। আপনারা যদি সবার চেয়ে বেশী অংশ দান করেন তবেই স্বদেশী কর্মতালিকানুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে। আপনারা যদি আপনাদের যাবতীয় বিদেশী বস্ত্রসম্ভার পরিত্যাগ না করেন তবে বিলাতী বস্ত্র বর্জন (বয়কট) সাফল্যমণ্ডিত করা অসম্ভব হইবে। রুচি যতদিন থাকিবে ততদিন সম্পূর্ণ ত্যাগ অসম্ভব। বয়কটের অর্থই সম্পূর্ণ ত্যাগ। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে যে সন্তানসন্ততি দেন কৃতজ্ঞতাভরে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি ; তদ্রূপ ভারতমাতা আমাদিগকে যে বস্ত্র উৎপন্ন করিয়া দিবেন আমাদের তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অপরের নিকট কুৎসিত হইলেও কোন মাতা তাহার সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে এমন কেহ শুনে নাই। ভারতের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যাদি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিকা নারীদের সেইরূপ করিতে হইবে। এবং আপনাদের জন্য হাতে-কাটা এবং হাতে-বুনা জিনিসই ভারতের উৎপন্ন শিল্প বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যুগ পরিবর্তনের সময় আপনারা মোটা সূতার খাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাইবেন। আপনাদের রুচি অনুযায়ী সর্বপ্রকার শিল্পচাতুর্য তাহাতে সংযুক্ত করিতে পারেন। এক সময়ে এদেশের সূক্ষ্ম মূল্যবান এবং রঙ্গীন বস্ত্রসম্ভার সমগ্র

পৃথিবীর ঈর্ষা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; আপনারা কয়েকটি মাস মোটা খদ্দরে সন্তুষ্ট থাকিলে সেই পুরাতন লুপ্ত শিল্পকলার পুনরভ্যুদয় দেখিতে পাইবেন আশা করা যায়। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ছয়মাস কাল আত্মত্যাগের অনুশীলনের পর দেখিতে পাইবেন যাহা আজ শিল্পকলার উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে তাহা ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ হইতেছে এবং প্রকৃত কারুকলার সৌন্দর্য শুধু বাহ্যিক বর্ণ ও গঠনের উপর নির্ভর করে না,—তাহার অন্তর্নিহিত ভাবই সেই সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাদান। একপ্রকার কলা মানুষকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া নেয় এবং আর একপ্রকার কলা মানুষকে জীবন দান করে। পাশ্চাত্য বা সুদূর প্রাচ্য হইতে আমরা যে সূক্ষ্ম এবং সৌখীন বস্ত্রাদি আমদানি করিয়াছি তাহা আমাদের লক্ষ লক্ষ ভ্রাতাভগিনীকে বস্তুতঃ মৃত্যুর পথে টানিয়া নিয়াছে এবং হাজার হাজার প্রিয় ভগিনীকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়াছে। প্রকৃত কারুকলার মধ্যে রচয়িতার আনন্দ, শান্তি, সন্তোষ, তৃপ্তি এবং পবিত্রতা আত্মপ্রকাশ করে। যদি আমাদের মধ্যে এইরূপ কলা পুনরুজ্জীবিত করিতে চান তবে বর্তমানে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠস্থানীয়া তাঁহাদিগকে 'অবশ্যই খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বদেশী আন্দোলন সফল করিয়া তুলিতে হইলে শুধু খাদি ব্যবহারই যে আবশ্যক তাহা মনে করিবেন না, অবসর সময়ে আপনাদের প্রত্যেকের সূতাকাটা অবশ্যকরণীয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদিগকে এবং বালকদিগকে আমি সূতা কাটিতে উপদেশ

দিয়াছি। আমি জানি, তাহারা হাজারে হাজারে প্রত্যহ সূতা কাটিতেছে। কিন্তু প্রাচীন কালের ন্যায় সূতাকাটার ভার প্রধানতঃ আপনাদের উপরেই পড়িবে। দুইশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের নারীদের কাটা সূতা স্বদেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশেও প্রেরিত হইত। তাহারা শুধু মোটা সূতাই কাটিত না, তাহাদের সূতা পৃথিবীর মধ্যে ছিল সূক্ষ্মতম। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ সূক্ষ্ম সূতা কাটিতেন কোন যন্ত্রদ্বারা আজ পর্যন্ত সেরূপ করিতে পারা যায় নাই। যদি আমরা খাদির চাহিদা মিটাইতে চাই তবে এই দুই মাসের মধ্যে এবং তৎপর আপনাদিগকে সূতা কাটিবার সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে; সূতাকাটার প্রদর্শনী করিতে হইবে এবং হাতে-কাটা সূতা দ্বারা ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতে হইবে। এই কাজের জন্য আপনাদের মধ্যে কয়েকজনকে সূতা কাটায়, সূতা পেঁজায় এবং চরকার অংশগুলি যথাযথরূপে সন্নিবেশ করার বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। ইহার অর্থ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম। চরকাকে জীবিকানির্বাহের উপায়স্বরূপ আপনারা মনে করিবেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইহা পরিবারের আয়বৃদ্ধি করিবে এবং অত্যন্ত দরিদ্র স্ত্রীলোকদের পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা জীবিকার্জনের উপায় হইবে। পূর্বে যেমন ছিল,—চরকা বিধবাদের প্রিয় সহচর হইবে। যাঁহারা এই আবেদন পাঠ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা একান্ত কর্তব্য এবং ধর্মানুষ্ঠানরূপে উপস্থিত করা হইতেছে। যদি ভারতবর্ষের সঙ্গতিসম্পন্না সকল নারী দৈনিক কিয়ৎপরিমাণ সূতা কাটেন তাহা হইলে সূতার মূল্য সস্তা হইবে

এবং অতি শীঘ্র যেরূপ সূক্ষ্ম সূতার প্রয়োজন তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবেন ; নতুবা বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপে ভারতবর্ষের নৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি প্রধানতঃ আপনাদের উপর নির্ভর করে। ভারতের ভবিষ্যৎ আপনাদের অঙ্কে ন্যস্ত রহিয়াছে। কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে আপনারাই লালন পালন করিবেন। ভারতের শিশুবৃন্দকে আপনারা সরল, ধর্মভীরু এবং সৎসাহসী স্ত্রীপুরুষ হইবার জন্য শিক্ষা দিতে পারেন অথবা অতিমাত্রায় আদর-আবদারে তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামের অনুপযুক্ত দুর্বল মানবে পরিণত করিতে পারেন। তাহারা বিদেশী সৌখীন জিনিসের প্রতি এরূপ আসক্ত হইয়া পড়িবে যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা পরিত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের ভিতরই দেখা যাইবে ভারতের নারী কি ধাতুতে নির্মিত। আপনারা কোন্ পথ নির্বাচন করিবেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়তি আপনাদের হাতে যেরূপ নিরাপদে ন্যস্ত করা যায়, গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে তেমন নিরাপদ নহে ; কারণ এই শাসনতন্ত্র ভারতের সকল সম্পদ এমনভাবে শোষণ করিয়া নিয়াছে যে আজ ভারত আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। নারীদের প্রত্যেক সভাতে জাতীয় উন্নয়নপ্রচেষ্টায় আপনাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছি এবং আমি এই বিশ্বাসে ইহা করিয়াছি যে আপনারা পবিত্র, সরল এবং ধর্মভীরু এবং সেইজন্য আপনাদের আশীর্বাদ অমোঘ হইবে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিয়া এবং জাতির কল্যাণে

অবিশ্রান্তভাবে আপনাদের অবসর সময়ে সূতা কাটিয়া আপনাদের সেই আশীর্বাদ সফল করুন।

আপনাদের অনুগত ভ্রাতা,

এম. কে. গান্ধী

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-'২১]

৭৭

নারীর কর্তব্য

১

খাদি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে গিয়া কলিকাতার নারীগণ তথাকার পুরুষদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। এই মর্মে সংবাদপত্রের তারের খবরে প্রকাশ যে, সেইজন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতি মহাশয়ের পতিপরায়ণা পত্নী, তাঁহার বিধবা ভগিনী এবং তাঁহার ভাগিনেয়ী এই দলের ভিতর আছেন। আমার ভরসা ছিল যে আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ নারীদিগকে কারাগারে যাইবার সম্ভ্রম হইতে দূরে রাখা হইবে। আইন অমান্য আন্দোলন বলপ্রয়োগে চালাইতে তাহারা প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার স্ত্রীপুরুষের প্রতি কোন ভেদ না দেখাইয়া নিরপেক্ষ উৎসাহের সহিত কলিকাতার এই তিনটি মহিলাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছেন। সমগ্র দেশ, আশা

করি, এই নূতন পদ্ধতি সাদরে অভ্যর্থিত করিবে। স্বরাজলাভের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের নারী পুরুষের সহিত সমান অংশ গ্রহণ করিবে। সম্ভবতঃ এই শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে নারী পুরুষকে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া যাইতে পারিবে। নারী সর্বদাই পুরুষ হইতে অধিক ধর্মপরায়ণা, ইহা আমরা জানি। নীরবে এবং মর্যাদার সহিত দুঃখবরণ নারীজাতির বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গলা সরকার নারীগণকে যুদ্ধের পুরোভাগে টানিয়া নিয়াছে; আমি আশা করি, সমগ্র ভারতের নারীগণ যুদ্ধের এই আহ্বানে সাড়া দিয়া নিজদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে। যথেষ্টসংখ্যক পুরুষ-কর্মিগণকে সরাইয়া নিবার পর যে কোন অবস্থাতেই নারাজাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদের শূন্যস্থান পূরণ করা নারীদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে কারাজীবনের দুঃখকষ্ট তাহারা পুরুষদের সঙ্গে পাশাপাশি সহ্য করিবে। ভগবান তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করিবেন। পুরুষজাতিকে উপহাস করিবার ছলে যখন দ্রৌপদীর স্বাভাবিক ভর্তা ও রক্ষকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হওয়ার অপমান হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি আপন ধর্মবলে নিজ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। চিরকাল এইরূপ হইবে। শারীরিক বলে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তিগণকে নিজ সম্মান রক্ষা করিবার ক্ষমতা ভগবান দিয়াছেন। নারীকে রক্ষা করা পুরুষের গৌরবের বিষয় হউক; কিন্তু পুরুষেরা না থাকিলে বা পুরুষ নারীকে রক্ষা করিবার পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলে ভারতবর্ষের কোন নারীই যেন নিজকে অসহায় মনে না করে।

যে নারী বা পুরুষ কিরূপে প্রাণ দিতে হয় জানে তাহার কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের নারীদিগকে এই উপদেশ দিতেছি—তাঁহারা কালক্ষেপ না করিয়া শান্তভাবে যে সকল নারী সংগ্রামের পুরোভাগে যাইতে প্রস্তুত তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করুন। বাঙ্গলার মহিলাদের নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেওয়া হউক তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্ত অন্য প্রদেশের ভগিনীরাও অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কারাজীবনের দুঃখকষ্ট এবং আনুষঙ্গিক যাহা কিছু নারীদিগের বিবেচ্য তাহার সম্মুখীন হইবার সাহস হয়ত অনেকেরই হইবে না। যদি অল্প কয়েকজনও সর্বপ্রথম ত্যাগের জন্য নিজদিগকে উৎসর্গিত করে, জাতির পক্ষে লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

পুরুষদিগের কর্তব্য সুস্পষ্ট। বিচলিত হইয়া বিচারবুদ্ধি হারাইলে চলিবে না। শুধু উত্তেজনার সৃষ্টিদ্বারা নারীদিগকে বা দেশকে রক্ষা করা যায় না। নারীদিগকে বা শিশুদিগকে রেহাই দিতে আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলি নাই। পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রচলনের সময় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাহা করে নাই। অখ্যাতনামা বসওয়ার্থ স্মিথ (Bosworth Smith) পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালার নারীদিগের উপর থুথু ফেলিয়া, গালিগালাজ করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে অপমানিত করিয়াছিল ; কলিকাতার ভগিনীগণ তথাকার রাজপুরুষদের মতে অপরাধ করিয়াছেন এই আইনের ধূয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহারা গ্রেপ্তার করিয়াছেন ; ইহপূর্বোক্ত কার্য হইতে নিশ্চয়ই অধিকতরর সভ্যতার পরিচায়ক। জনসাধারণের সেবা করিতে গেলে

যদি তাঁহারা নারীগণকে গ্রেপ্তার করেন তবে কারাগারবরণের জন্য তাঁহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি। আমাদের নারীগণ স্বদেশীর মন্ত্র প্রচার করিবে এবং গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের মূল পর্যন্ত ধ্বংস করিবে, আর গবর্ণমেণ্ট উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি না। বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসায় এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পদ লুটিয়া নিবার ক্ষমতাই বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের মূলে। সেইজন্য যদি আমরা পুরুষেরা আমাদের ভগিনীদিগকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে দিই তবে পুরুষদের সঙ্গে নারীদিগকেও কারাগারে প্রেরণ করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের আছে, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১২-'২১]

২

নারী ত্যাগের প্রতীক। সৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি যখন কোন কাজে প্রবৃত্ত হন তখন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। আমাদের নারীদিগকে আমরা ভ্রমপথে চালিত করিয়াছি আমরা সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়াছি। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে চরকা তাঁহাদিগকে ঠিকপথে পরিবর্তিত করিয়া আনিতেছে। যে সকল নেতা এবং অন্যান্য ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সুনজরে আছেন তাঁহারা সকলেই যখন কারাগারে যাইবার সম্মান লাভ করিবেন তখন ভারতের নারীগণ তাঁহাদের

অসমাপ্ত কাজ অধিকতর সুষমার সহিত সমাপ্ত করিবেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-১২-'২১]

৭৮

ভারতের নারীদের প্রতি

এই সত্যের সংগ্রামে কতিপয় ভগিনীর যোগদান করিবার একান্ত আগ্রহ আমি শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। লবণকরের বিরুদ্ধে এই অভিযান যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, আমরা ইহা দেখিতে পাইতেছি, যদি নারীদিগকে ইহাতে আবদ্ধ রাখা যায় তবে অশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। তাহারা জনসমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে এবং যে দুঃখবরণের তৃষ্ণা তাহাদের মনে জাগিয়াছে তাহা তৃপ্ত করিবার উপাদান সেখানে নাই।

এই অহিংস সংগ্রামে পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের দান অনেক বেশী হইবে। নারীকে পুরুষ হইতে দুর্বল বলিয়া অভিহিত করা মিথ্যা অপবাদ; ইহা নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার। যদি শক্তি দ্বারা পশুবল বুঝিতে হয় তবে নারী পুরুষ হইতে বাস্তবিক কম শক্তিশালিনী; যদি শক্তি দ্বারা নৈতিক বল বুঝিতে হয় তবে পুরুষ হইতে নারী অপরিমেয়রূপে অধিক শক্তিশালিনী। তাহাদের স্বভাবজাত বুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য এবং সাহস কি পুরুষের চেয়ে অধিক নয়? নারী

ব্যতিরেকে পুরুষের অস্তিত্ব থাকিত না। যদি অহিংসা আমাদের জীবনের মূল নীতি হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ নারীর হাতে।

বহু বৎসর পূর্ব হইতে এই ধারণা আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি। যখন আশ্রমের মহিলাগণ পুরুষদের সহিত তাঁহাদিগকেও সঙ্গে নিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, আমার অন্তর হইতে এই সাড়া পাই যে শুধু লবণ আইন ভঙ্গ করার চাইতে মহত্তর কার্য করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের রহিয়াছে।

আমার মনে হয় সেই কাজের সন্ধান এখন আমি পাইয়াছি। ১৯২১ সালে পুরুষগণ মাদকদ্রব্য এবং বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিয়া সাময়িকভাবে আশাতীতরূপে সেই আন্দোলনে কিয়দ্দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু হিংসার ভাব ক্রমশঃ প্রবেশ করায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি প্রকৃত জাগরণ সৃষ্টি করিতে হয় তবে পুনরায় প্রহরীর কার্যে অবতীর্ণ হইতেই হইবে। যদি শেষ পর্যন্ত ইহা শান্তিপূর্ণ থাকে তবে এই উপায়ে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিতে পারা যাইবে। জোর করিয়া ইহা কখনও করা যাইতে পারে না ; নৈতিক যুক্তিদ্বারা মনের পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। নারী ব্যতীত অন্তর স্পর্শ করে এমন সনির্বন্ধ অনুনয় আর কেহ সফলতার সহিত করিতে পারে কি ?

শেষ পর্যন্ত মদ্য ও মাদকদ্রব্যাদি নিবারণ এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন আইনের সাহায্যে করিতে হইবে ; কিন্তু সুস্পষ্টভাবে

সমাজের নিম্নস্তর হইতে জনমতের চাপ না দিতে পারিলে 'আইন কখনই বিধিবদ্ধ হইবে না।

এই দুইটি বিষয়ই যে জাতির মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। মদ্য এবং মাদকদ্রব্য সেবন করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের নৈতিক জীবন সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিদেশী বস্ত্র জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তির মূল সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে বেকার অবস্থায় আনিয়া ফেলে। উভয়ক্ষেত্রেই গৃহে গৃহে নারীগণই এই দুরবস্থা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেন। যে সকল গৃহে পূর্বে একসময় শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিত, সেখানে মদ এবং মাদকদ্রব্যের সহিত পাপ প্রবেশ করিয়া পরিবারের কি সর্বনাশ সাধন করে তাহা মদ্যপায়িগণের পত্নীগণই জানেন। বেকার থাকার কি অর্থ তাহা আমাদের গ্রামের লক্ষ লক্ষ নারীর অবিদিত নহে। আজ চরকাসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এক লক্ষেরও উপর স্ত্রীলোক সূতা কাটিতেছে; সেই স্থলে পুরুষ সূতাকাটনীর সংখ্যা দশ হাজারের নিম্নে।

ভারতবর্ষের নারীগণ এই দুইটি কাজে হাত দিন এবং সেই কাজে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করুন; তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য তাঁহাদের অবদান পুরুষের চেয়ে অনেক অধিক হইবে এবং তাঁহারা অননুভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয় ও শক্তি অর্জন করিবেন। নারীগণের সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় বিলাতী বণিক্ ও তাহাদের ক্রেতাগণের অন্তরে পরিবর্তন আনিবে এবং মদ্যবিক্রেতা ও মদ্যপায়িগণের অন্তর বিগলিত না

করিয়া পারে না। অন্ততঃ এই চার শ্রেণীর লোকের উপর মেয়েরা কোনরূপ জোরজুলুম করিবে বা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিবে এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে, এরূপ শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিরোধ আন্দোলনের প্রতি গবর্ণমেণ্টও দীর্ঘকাল উদাসীন থাকিতে পারে না।

এই আন্দোলন কেবল নারীগণ দ্বারাই আরম্ভ করা হইবে এবং তাহারাই ইহা নিয়মিত করিবে; ইহার বৈশিষ্ট্য এইখানে। তাহারা পুরুষদিগের নিকট আবশ্যকমতে সাহায্য চাহিতে পারিবে এবং তাহা পাইবে। কিন্তু পুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া কাজ করিবে।

এই আন্দোলনে শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা হাজার হাজার স্ত্রীলোক যোগদান করিতে পারে।

আমার এই আবেদনের ফলে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ সর্বসাধারণের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পাইবেন এবং তাহাদিগকে নৈতিক এবং আর্থিক সহায়তা করিতে পারিবেন।

তাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বর্জনের বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে খাদি ছাড়া এই আন্দোলন অসম্ভব। কাপড়ের কলের মালিকগণ নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের চাহিদা মিটাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় নিকট-ভবিষ্যতে তাঁহাদের কলগুলি প্রস্তুত করিতে পারিবে না। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে আমাদের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য বাড়ীতে খাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের

নারীগণ প্রত্যেকটি অবসর-মুহূর্তে সূতাকাটায় নিয়োজিত থাকিয়া সেই পরিবেশ সৃষ্টি করুন এবং নিজেরা ধন্য হউন।

খাদি প্রস্তুত করিবার সমস্যা সমাধান করিতে হইলে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পরিমাণ সূতা কাটিতে হইবে। এই অভিযানের গত দশ দিনে অবস্থার চাপে আমি তকলীর শক্তি কি পরিমাণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছি—তৎপূর্বে আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ তকলী আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করে। অন্য কোন কাজের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আমার সঙ্গিগণ হাসিয়া খেলিয়া ১২-নম্বরী সূতা এই পরিমাণ কাটিয়াছে যে তদ্দারা দৈনিক চারবর্গগজ খাদি বুনা যাইতে পারে। সংগ্রামের কার্যপ্রণালী হিসাবে ধরিলে খাদি কখনও পরাভূত হইবে না। এই দুইটি সংস্কারকার্যের নৈতিক ফল দৃষ্টতঃই অসামান্য রকমের। রাজনৈতিক ফলও কম হইবে না। মদ্য ও মাদক-দ্রব্যাদি সেবন বন্ধ করিতে পারিলে পঁচিশ কোটী টাকা আয় গবর্ণমেণ্টের কমিয়া যাইবে। বিদেশী বস্ত্রাদি বর্জন করিতে পারিলে ভারতবর্ষের বিপুল জনসাধারণের অন্ততঃ ষাট কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এই দুইটিতে কৃতকার্য হইতে পারিলে আর্থিক হিসাবে আমরা লবণ-কর প্রত্যাহার করিলে যে লাভ হইবে তাহার চেয়ে অধিকতর লাভবান হইতে পারিব। উভয় সংস্কারের নৈতিক ফল যাহা হইবে তাহা অমূল্য, অপরিমেয়।

কোন কোন ভগিনীরা উত্তরে বলিবেন—"মাদক দ্রব্য এবং বিদেশী বস্ত্রের পিকেটিং ব্যাপারে কোন উত্তেজনা বা সাহসিকতার স্থান নাই।" এই আন্দোলনে যদি তাঁহারা মনপ্রাণ ঢালিয়া

দেন তবে দেখিতে পাইবেন যে ইহাতে প্রভূতপরিমাণ উত্তেজনা এবং উদ্যমের অভিনবত্ব রহিয়াছে। আন্দোলন শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁহারা নিজদিগকে কারাগারে পর্যন্ত আবদ্ধ দেখিতে পারেন। ইহা অসম্ভব নয় যে তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং এমনকি শরীরেও আঘাত পাইবেন। এইরূপ অপমান এবং আঘাত তাঁহাদের সংগ্রাম-জয়ে গৌরবের টিকা হইবে। যদি এইরূপ বিপদে এবং কষ্টে তাঁহারা পতিত হন তাহা হইলে উদ্দেশ্য শীঘ্রই সফল হইবে।

ভারতের নারীগণ যদি আমার আবেদনে কর্ণপাত করেন এবং তদনুযায়ী কিছু করিতে চান তবে অতি শীঘ্র তাহা করিতে হইবে। যদি এক্ষণই সমগ্রভারতব্যাপী কাজ আরম্ভ করিতে না পারা যায় তবে যে সকল প্রদেশ নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে তাহারা কাজ আরম্ভ করুক। অন্যান্য প্রদেশও অতি শীঘ্রই তাহাদের অনুসরণ করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৪-'৩০]

৭৯

নারীদিগের পরামর্শ পরিষদ

নারীদিগের যে সভা গত রবিবার ডাণ্ডিতে আহূত হয় তাহা মহাসভায় পরিণত হইয়াছিল। আমি তাহাই ইচ্ছা

করিয়াছিলাম। নবছরী এবং ডাণ্ডির মধ্যে বরদা রাজ্যের তরফ হইতে যানবাহনাদির চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছে; অনেকে পূরা ১২ মাইল হাঁটিয়া ডাণ্ডিতে আসিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

১। ১৯৩০ সনের ১৩ এপ্রিল ডাণ্ডিতে সম্মিলিত গুজরাটের নারীদিগের এই সভা গান্ধীজীর ভাষণ শ্রবণানন্তর প্রস্তাব করিতেছে যে, সম্মিলিত নারীগণ গুজরাটের মাদকদ্রব্য এবং তাড়ির দোকানগুলিতে পিকেটিং করিবে এবং দোকানদারদিগকে তাহাদের ব্যবসা আর না চালাইতে এবং ক্রেতাগণকে মাদকদ্রব্য সেবন না করিতে যথাক্রমে অনুরোধ করিবে এবং সেইভাবে বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতেও পিকেটিং করিবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতাগণকে যথাক্রমে বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা না করিতে এবং তাহা খরিদ না করিতে অনুরোধ করিবে।

২। বর্তমান সভার মত এই যে, কেবল খাদির প্রচলন দ্বারাই বিদেশী বস্ত্র বর্জন সম্ভবপর হইতে পারে এবং সেইজন্য সম্মিলিত নারীমণ্ডলী প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, অতঃপর তাঁহারা কেবল খাদিই ব্যবহার করিবেন এবং যথাসম্ভব নিয়মিতরূপে চরকায় সূতা কাটিবেন এবং সূতাকাটার পূর্ববর্তী কৌশলগুলি আয়ত্ত করিবেন এবং তাঁহাদের প্রতিবেশিগণের মধ্যে খাদি

প্রচার করিবেন এবং সূতাকাটার প্রণালীগুলি তাহাদিগকে শিখাইবেন এবং নিয়মিতরূপে চরকায় সূতা কাটিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

৩। এই সভা আশা করে যে, সমগ্র গুজরাটের এবং অন্যান্য প্রদেশের নারীগণ এই সভায় অনুমোদিত আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করিবেন।

—স্বরাজ আন্দোলনের এই প্রসার আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। এই পত্রিকায় যে সকল যুক্তি পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি সেগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। মিথুবেন ইতঃপূর্বেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এক মুহূর্তও বিলম্ব করিবার নারী তিনি নন। এই প্রণালীতে কাজ করা সাব্যস্ত হইয়াছে—এক এক দলে ২০।২৫ জন স্ত্রীলোক থাকিবে এবং তাহারা মাদকদ্রব্যের দোকানের সম্মুখে উপবিষ্ট হইবে এবং যে সকল লোক মদের বা তাড়ির দোকানে আসিবে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা বলিবে এবং তাহাদিগের কু-অভ্যাস দূর করিতে চেষ্টা করিবে। দোকানদারগণকেও তাহারা এই পাপব্যবসায় ক্ষান্ত দিতে এবং অন্য কোন সদুপায়ে তাহাদিগের জীবিকা উপার্জন করিতে অনুনয় এবং অনুরোধ করিবে।

দক্ষ এবং নিপুণা নারী-স্বেচ্ছাসেবিকাগণের সংখ্যা উপযুক্ত-পরিমাণ হওয়ামাত্র উপরিউক্ত উপায়ে বিদেশী বস্ত্রের দোকান-গুলিতেও পিকেটিং করিতে হইবে। একই সমিতি যদিও উভয়

বয়কটের কাজ চালাইবে, আবশ্যক হইলে ইহার দুইটি শাখা রাখিতে হইবে—মাদকবর্জন ও স্বদেশী বস্ত্রবর্জন। যে কোন নারী শুধু একটি শাখায় কাজ করিবার জন্য আগুয়ান হইতে পারিবেন; প্রত্যেক কর্মীই যে কংগ্রেসদলভুক্ত হইবেন এমন নয়। তবে ইহা পরিষ্কাররূপে জানা থাকা চাই যে, এই কাজ কংগ্রেসের কর্মতালিকারই অংশবিশেষ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহা প্রভূত ফল প্রসব করিবে। পরন্তু ইহার নৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপকারিতাও সমপরিমাণে বিদ্যমান।

বিদেশী বস্ত্র বর্জন শাখায় যাহারা পিকেটিং করিবে তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খাদি প্রস্তুতের গঠনমূলক কার্য-ব্যতিরেকে শুধু বয়কট মহা অনিষ্টকর আন্দোলনে পরিণত হইবে। খাদি প্রস্তুত না করিয়া যদি এই আন্দোলন সফলতাও লাভ করে, ইহা দ্বারা স্বাধীনতালাভার্থ যে-জাতীয় আন্দোলন তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। লক্ষ লক্ষ লোক সরল বিশ্বাসে ইহাতে যোগদান করিবে, কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে যে তাহারা পরিবার জন্য কাপড় পায় না অথবা যাহা পায় তাহা তাহাদের পক্ষে দুর্মূল্য, তখন তাহারা আমাদিগকে অভিশপ্ত করিবে। যে মূলনীতি মানিয়া কাজ করিতে হইবে তাহা এই—বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ কর, নিজের খাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিধান কর। বর্তমানে খাদির পরিমাণ অপ্রচুর। অধিকাংশ খাদি-কর্মিগণ লবণ সংগ্রামে যোগ দিয়াছে। কাজেই সাময়িকভাবে খাদি প্রস্তুতকার্য ব্যাহত হইয়াছে।

দেহের নগ্নতা ঢাকিবার জন্য কাপড় কিনিতেই হইবে,—

এই কুসংস্কার যে মুহূর্তে দেশ হইতে বিদূরিত হইবে সেই সময় হইতে দেশে কাপড়ের কোন অভাব কোন সময়েই থাকিবে না। যদি কেহ বলে ম্যানচেস্টার বা দিল্লীর বিস্কুট না পাইলে আমরা নিশ্চয়ই উপবাস থাকিব, তাহার উক্তি উপরিউক্ত কুসংস্কারের মতই শোনাইবে। আমরা যেমন রন্ধন করি এবং খাই সেইরূপ যদি শুধু আমাদের ইচ্ছা থাকে তবে আমাদের কাপড়ও আমরা প্রস্তুত করিয়া পরিতে পারি। মাত্র একশত বৎসর পূর্বে আমরা ইহা করিয়াছি এবং আমরা সেই কৌশল এখন পুনরায় শিখিতে পারি। এই মহাসংকটের সময় জাতীয় ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের দ্বিধা করিবার অবসর নাই এবং আমরা অলসতার প্রশ্রয় দিতে পারি না। কলগুলি সম্বন্ধে আমার যুক্তির পুনরুত্থাপন করা অনাবশ্যক। যদি প্রত্যেকটি কল প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী হয় এবং সকলেই দেশভক্ত হয়, তথাপি তাহারা আমাদের চাহিদা মিটাইতে পারিবে না। যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, আমরা ইহা ভালবাসি বা না বাসি, যদি অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয় এবং ১৯২০ সালে বিদেশী বস্ত্রের যে বয়কট আন্দোলনে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলাম তাহাতে সফলতালাভ করিতে চাই,— খাদি ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই।

ডাণ্ডিতে যে-সকল পুরুষ আসিয়াছে তাহাদের সম্মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় 'বয়কট আন্দোলনে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছি। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যেখানে নারীগণ পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন

বা করিবেন, সেখানে পুরুষেরা যদি অনর্থক হস্তক্ষেপ করেন তবে তাঁহারা আন্দোলনের মহা অনিষ্টসাধন করিবেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৪-'৩০]

৮০

নারী ও চরকা

এই উৎপাদনের অর্থ বিহারের ত্রিশ হাজার স্ত্রীলোককে ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া। আমার সঙ্গে দ্বারভাঙ্গার খাদি কেন্দ্রগুলিতে চলুন এবং হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে চরকা কি আনন্দ ও সুখদান করিতেছে তাহা দেখিয়া যান। যদি আরো বেশীসংখ্যক লোককে কাজ না দিতে পারেন তবে দোষ আমায় নয়, আপনাদের। তাহাদের হাতের তৈয়ারী জিনিস যদি আপনারা খরিদ না করেন তবে কাজ অগ্রসর হইতে পারে না। আপনারা এক গজ খদ্দর কিনিলেও এই সকল স্ত্রীলোকের হাতে কিছু পয়সা আসে। কিছু পয়সামাত্র —এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু পূর্বে এই কয়েকটি পয়সাও তাহাদের মিলিত না। আমি বরিশাল ও রাজমাহেন্দ্রীর পতিতা নারীদিগকে দেখিয়াছি। একটি তরুণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গান্ধী, তোমার চরকা আমাদিগকে কি দিতে পারে? আমাদের নিকট পুরুষেরা আসিয়া কয়েক মিনিটের জন্য পাঁচ হইতে দশ টাকা পর্যন্ত দিয়া থাকে।" আমি

বলিলাম, চরকা দ্বারা তাহারা এত উপার্জন করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহারা এই পাপজীবন পরিত্যাগ করিলে আমি তাহাদিগকে সূতাকাটা এবং বুনন শিখাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারি এবং সদ্ভাবে জীবিকা উপার্জনের উপযুক্ত উপায় করিয়া দিতে পারি। উক্ত বালিকার কথা শুনিয়া আমি মরমে মরিয়া গেলাম এবং ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম না কেন? নারী হইয়া না জন্মিয়াও আমি নারীর ভাব আশ্রয় করিতে পারি এবং ভারতবর্ষের নারীগণ, যাহাদের অনেকের দিনে এক আনাও জুটে না, তাহাদের জন্য আমি নারীর সেবাকল্পে চরকা এবং ভিক্ষার ঝুলি লইয়া এখন সারাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-২-'২৭]

৮১

জনৈকা ভগিনীর সমস্যা

জনৈকা ভগিনী লিখিতেছেন—

"খাদি ব্যবহার করা অতীব প্রয়োজনীয়—আপনার মুখনিঃসৃত এই বাণী শ্রবণ করিয়া আমি তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। আমরা গরীব। আমার স্বামী বলেন, খাদি দুর্মূল্য। মহারাষ্ট্রবাসী বলিয়া আমাদের আট গজ লম্বা শাড়ী পরিতে হয়। যদি লম্বায় ছয় গজ করা যায় তাহা হইলে অনেকটা বাঁচিয়া যায়। কিন্তু আমার অভিভাবকগণ তাহা কমাইতে দিবেন না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে বৃথা

তর্ক করিয়াছি যে খাদি পরিধান করাই অধিকতর জরুরী বিষয়—শাড়ী কি রকম হইবে, ইহা কত লম্বা হইবে, এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ অবান্তর। তাঁহারা বলেন, আমি অল্পবয়স্কা বলিয়াই এই সকল অভিনব ধারণা আমার মাথায় ঢুকিয়াছে। আমি মনে করি যদি আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে লিখেন যে বস্ত্রপরিধানের রীতি ভঙ্গ করিয়াও খাদি ব্যবহার করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহারা শাড়ীর দৈর্ঘ্য উল্লিখিত-রূপে কমাইতে সম্মত হইবেন।"

—ভগিনীকে তাঁহার অভীপ্সিত উত্তর দিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অন্যান্য ভগিনীরাও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন বলিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

এই চিঠিদ্বারা লেখিকার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইতেছে; স্বেচ্ছায় পুরাতন চালচলন এবং প্রথা পরিত্যাগ করিতে অনেক ভগিনীই প্রস্তুত নন। কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করিয়া, বিনাব্যয়ে, পুরাতন প্রথাগুলির সঙ্গতি বা অসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সেইগুলিরই অনুসরণ করিয়া যে সকল ভ্রাতাভগিনী আহ্লাদের সহিত স্বরাজ লাভ করিতে চান, তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু স্বরাজ এত সস্তা জিনিস নয়। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আত্মত্যাগের প্রেরণা জোগাইতে হইবে এবং প্রাদেশিকতাও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রাদেশিকতা শুধু জাতীয় স্বরাজলাভ ব্যাহত করে এমন নয়—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনেরও ইহা বিঘ্ন জন্মায়। এই সঙ্কীর্ণতার ভাব পোষণ করার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীগণই

অধিকতর দায়ী। রুচিবৈচিত্র্য বজায় রাখার সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং নানা লোকাচার বৈচিত্র্যের ছদ্মবেশে আসিয়া জাতিস্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করে। দাক্ষিণাত্যের শাড়ী অতি সুন্দর; কিন্তু সৌন্দর্যের খাতিরে যদি জাতিকে বলি দিতে হয় তবে সেই সৌন্দর্যের উপকরণ সর্বাংশে বর্জনীয়। যদি কচ্ছদেশীয় ছোটমাপের "শাড়ী" কিংবা পাঞ্জাবের "ওধানী" দ্বারা খাদি পরিধান সুলভ এবং সুগম করা যায় তবে সেগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে সুন্দর বলিয়া আমরা বিবেচনা করিব। দাক্ষিণাত্যের, গুজরাটের কচ্ছ এবং বঙ্গদেশের শাড়ী পরিবার রীতি সবগুলিকেই নানাপ্রকারের জাতীয় রীতি বলিয়া ধরা যায় এবং ইহাদের প্রত্যেকটির অন্যটির ন্যায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেইহেতু শালীনতার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া যে রীতি অনুযায়ী সবচেয়ে কম পরিমাণ কাপড়ে চলে, তাহাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়। এই বিষয়ে কচ্ছদেশীয় রীতি পুরোবর্তী স্থান অধিকার করে; লম্বায় গুজরাটী শাড়ীর অর্ধেকপরিমাণ—মাত্র তিনগজ কাপড় দরকার হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম ওজন বহন করিতে হয় বলিয়া কষ্টেরও লাঘব হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। "পাচ্চেদো" (pachhedo) এবং পেটিকোট যদি একই রংয়ের হয় তবে তাহা শুধু "পাচ্চেদো" বা পূরা মাপের শাড়ী তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই সকল জাতীয় রীতিনীতির পারস্পরিক বিনিময় এবং অনুকরণ সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা তাঁহাদের পরিচ্ছদাগারে প্রাদেশিক রীতি অনুযায়ী যতরকম পরিধেয় আছে তাহা

রাখিতে পারেন। বাঙ্গালী অতিথিগণের অভ্যর্থনাতে গুজরাটী গৃহস্বামী এবং তাঁহার পত্নী যদি বাঙ্গালীর পোশাক পরিধান করেন এবং বাঙ্গালীও গুজরাটী অতিথিকে অনুরূপ সংবর্ধনা করেন, তবে ইহা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত সৌজন্য ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক হইবে। কিন্তু ইহা স্বদেশপ্রিয় ধনীদের পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে। যে প্রাদেশিক রীতিবিশেষ খদ্দর-পরিধান সুলভ এবং সুগম করিয়া তুলে, মধ্যবিত্ত ও গরীবশ্রেণীর লোকেরা সেই রীতি গ্রহণ করিয়া গৌরববোধ করিবেন এবং সেখানেও তাঁহারা সর্বাপেক্ষা গরীবদের পোশাক-পরিচ্ছদের রীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন।

স্বদেশীর অর্থ এই নয় যে, লোকেরা নিজ নিজ পঙ্কিল কূপে ডুবিয়া থাকিবে; স্বদেশীর অর্থ প্রত্যেকে বিশিষ্ট জীবনধারা-সমন্বিত হইয়া জাতিরূপ মহাসাগরের দিকে অভিযান করিবে। যদি প্রতিটি ধারা বিশুদ্ধ হয় তবেই না ইহা সমুদ্রকে কিছু দিবার দাবী করিতে পারে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যে সকল স্থানীয় বা প্রাদেশিক রীতিনীতি অবিশুদ্ধ বা কুরুচিপূর্ণ নয় শুধু সেইগুলিই সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। এই সত্য একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে স্বদেশপ্রেম বিশ্বজনীন প্রেমে রূপান্তরিত হইবে।

পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্বন্ধে যাহা খাটে ভাষা সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। অপর প্রদেশের পোশাক সময়বিশেষে আমরা যদি অনুকরণ করিতে পারি তবে সেরূপ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ও আমরা ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু বর্তমানে

ইংরেজী ভাষাকে গৌরবের স্থান দিতে গিয়া আমাদের সকল শক্তির অপচয় হইতেছে ; এই অসম্ভব এবং মারাত্মক চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এতদ্দ্বারা আমাদের মাতৃভাষাকে এবং ততোধিক অন্যান্য প্রদেশের ভাষাকে আমরা অনাদর করিতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-'২৮]

৮২

ইহা কি পুরুষের কাজ নয় ?

জনৈক অধ্যাপক লিখিতেছেন—

"চরকা এবং খদ্দরে আমার নিজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর লোকদের।সাধারণ সংযোগ যে খদ্দর ব্যতীত হইতে পারে না তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝি। ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, কোনও দেশই সাধারণ সংহতি ছাড়া এবং সকলের একত্বের ধারণা ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না। ইহা আমি বেশ বুঝি যে যথেষ্টপরিমাণ খদ্দর উৎপাদন করিতে পারিলে বিদেশী বস্ত্রের আমদানি বন্ধ হইবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে খদ্দরবিষয়ক কর্মতালিকা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।

"কিন্তু আমার মতে আপনি উল্টা দিক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুস্থ সবলকায় ব্যক্তিগণকে স্ত্রীলোকদের ন্যায় চরকা নিয়া বসিতে বলা অধিকাংশ লোকের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। বর্তমানে যে আমরা নারীদের চেয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নই এই অপবাদ আমি বেশ

হৃদয়ঙ্গম করি। তথাপি ইহা সত্য, যে কাজ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া স্ত্রীলোকের সহিতই জড়িত ছিল আমরা সকলেই সেই কাজে যোগ দিতে পারি না। পক্ষান্তরে, যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে দেশের সকল স্ত্রীলোকই সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তৎসত্ত্বেও এই কার্যে পুরুষদের সহায়তার প্রয়োজন তবে আমার পূর্বোক্ত ধারণা ত্যাগ করিতে পারিতাম। মেয়েরা বিলাতী শাড়ী পরিয়া গর্বের সহিত চলাফেরা করিবে আর পুরুষেরা চরকায় সূতা কাটিবে—এ যেন ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুড়িবার ন্যায় একটি উদ্ভট ব্যাপার। পরন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের সমস্যা পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেইজন্য পুরুষদিগকে সূতা কাটিতে এবং খদ্দর বুনিতে নারীদের চেয়ে বেশী চাপ দিয়া উল্টা দিক হইতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করা হইতেছে।

"আমার বিনীত মত এই যে, শুধু পুরুষদিগকে বহুমুখী রাজনৈতিক প্রচারকার্যে ব্যাপৃত রাখিয়া আপনার বাণী দেশের নারীদের নিকট সোজাসুজি প্রেরণ করা উচিত ছিল। বর্তমানে চরকা এবং খদ্দরের বৃহৎ কার্যতালিকা স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া পুরুষদিগকে পুরুষোচিত উপায়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে দিন।"

—চিঠিখানা বড় দীর্ঘ ছিল বলিতে হইবে। ভাষার পরিবর্তন না করিয়া আমি যুক্তিটি সংক্ষেপে বলিয়াছি। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই সুপণ্ডিত অধ্যাপক ভারতবর্ষের নারীদের অবস্থা জানেন না। তাহা হইলে তিনি ইহা অবগত হইতে পারিতেন যে সাধারণতঃ পুরুষেরা মেয়েদের সম্মুখে কোন বক্তৃতা দিবার সুযোগ-সুবিধা পায় না। আমার সৌভাগ্য যে, আমার পক্ষে সেইটা কিয়ৎপরিমাণে করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই

সকল সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও আমি পুরুষদিগের যতটা নিকটে আসিতে পারিয়াছি, মেয়েদের নিকট ততটা পারি নাই। তাঁহার ইহাও জানা উচিত যে, পুরুষদের সম্মতি ছাড়া মেয়েরা কোন কাজ করিতেই পারে না। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি যেখানে পুরুষেরা নারীদিগকে চরকা এবং খদ্দর গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ, পুরুষেরা যে সকল নূতন নূতন আবিষ্কার এবং পরিবর্তন উদ্ভাবন করিতে পারে নারীরা তাহা পারে না। সূতাকাটা আন্দোলন শুধু নারীদিগের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলে গত চার বৎসর চরকার যে সকল উন্নতি করা হইয়াছে তাহা অসম্ভব হইত এবং সূতাকাটা আন্দোলনকে যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে তাহা হইতে পারিত না। চতুর্থতঃ, কোন বৃত্তি বা ব্যবসায় শুধু পুরুষ বা নারীর জন্য সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে নির্দিষ্ট থাকিবে, ইহা অভিজ্ঞতা-বিরুদ্ধ। রন্ধন প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ; কিন্তু যে সৈনিক রাঁধিতে জানে না তাহাকে অকর্মণ্য বলা যায়। সৈন্যনিবাসের সমস্ত রন্ধনকার্য প্রয়োজনবশতঃ এবং স্বভাবতঃই পুরুষেরা করিয়া থাকে। পরন্তু মেয়েরা বাড়ীতে স্বভাবতঃই রান্নাবান্না করে। কিন্তু যখনই বৃহদাকারে রন্ধনকার্যের সুব্যবস্থা করিতে হয়, সারা পৃথিবীময় সর্বদাই তাহা পুরুষের দ্বারা করানো হয়। যুদ্ধ করা প্রধানতঃ পুরুষের কাজ, কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক সংগ্রামগুলিতে আরব রমণীগণ তাহাদের স্বামিগণের পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝান্সীর রাণী বীরত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। অতি অল্প পুরুষই সেরূপ সম্মানলাভ

করিয়াছিল। বর্তমানে ইউরোপে আইনব্যবসায়িরূপে, চিকিৎসকরূপে, রাজ্যশাসকরূপে নারীদিগের উজ্জ্বল প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই নারীগণ স্টেনোগ্রাফি এবং টাইপিস্ট-এর কাজ বা কেরাণীর কাজ প্রায় একচেটিয়া করিয়া তুলিতেছে। সূতাকাটা পুরুষের কাজ নয় কেন? অধ্যাপক মহাশয় স্বীকার করেন, সূতাকাটাতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হইবে; যে কাজের এত মর্যাদা হইবে, তাহা পুরুষের পক্ষে উপযুক্ত বা উচিত হইবে না কেন? অধ্যাপক-মহাশয় কি জানেন না যে সূতা কাটিবার কল (Jenny) একজন পুরুষই আবিষ্কার করিয়াছিল? সেই আবিষ্কার তিনি না করিলে মানবজাতির ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত। সূচীশিল্প বস্তুতঃ নারীদিগেরই কাজ; কিন্তু পৃথিবীর খ্যাতনামা দর্জিরা সকলেই পুরুষ। সেলাইর কল একজন পুরুষই আবিষ্কার করেন। সিঙ্গার যদি সূচের কাজে ঘৃণাবোধ করিতেন তবে মানবজাতির জন্য তাঁহার দান রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। যদি অতীতে পুরুষেরা ভারতের নারীগণের পাশাপাশি সূতা কাটিতে শিখিতেন তবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌরাত্ম্যে আমরা সম্ভবতঃ সূতাকাটা একেবারে ছাড়িয়া দিতাম না। রাজনীতিবিদ্ নিছক রাজনীতিতে যত খুশী আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু যদি লক্ষ লক্ষ লোকের সমবেত চেষ্টায় আমাদের বস্ত্রের সংস্থান করিতে হয় তবে দেশের রাজনীতিবিদ্ কবি, রাজা, পণ্ডিত এবং দরিদ্র, পুরুষ হউক বা স্ত্রীই হউক, হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান বা পার্শী অথবা ইহুদী হউক,

সকলকেই অলঙ্ঘ্য কর্তব্যরূপে প্রত্যহ অর্ধঘণ্টা সূতা কাটিতেই হইবে। মানবজাতির ধর্ম কোন শ্রেণী বা পুরুষ বা নারী-জাতির একচেটিয়া বিশেষ অধিকার নয়। ইহাতে সকলের সমান অধিকার—ইহা সকলের পালনীয় কর্তব্য। যে সকল স্ত্রী বা পুরুষ নিজদিগকে ভারতবাসী বলিয়া অভিহিত করে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট ভারতীয় মানবধর্ম অন্ততঃ অর্ধ ঘণ্টার জন্য সূতাকাটা দাবী করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৬-'২৫]

৮৩

নারীর সহায়তায় স্বরাজ

ওয়ার্কিং কমিটী সাব্যস্ত করিয়াছে, আইনভঙ্গ আন্দোলনের জন্য সূতাকাটা অপরিহার্য। ভারতবর্ষের নারীদের পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার এই সুবর্ণসুযোগ। লবণ তৈয়ারী আন্দোলনের সময় লক্ষ লক্ষ নারী তাহাদের নিভৃত গৃহকোণ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখাইয়াছে যে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহারা দেশের সেবা করিতে পারে। গ্রাম্য নারীদিগের মনে এই সাহচর্য মর্যাদাজ্ঞান জাগ্রত করে। এই সম্ভ্রম তাহাদের পূর্বে ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের এই শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে সূতাকাটাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া ভারতের নারীদিগকে মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। স্বভাবতঃই সূতাকাটা বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সুবিধা অধিক।

সৃষ্টির আদি হইতে স্ত্রী ও পুরুষের কাজের বিভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে, ইভ সূতা কাটিত এবং আদম তাহা বুনিত। এই বৈষম্য আজ পর্যন্ত চলিতেছে। পুরুষ সূতা-কাটনী সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ১৯২০-২১ সালে আমি যখন পাঞ্জাবে পুরুষদিগকে সূতা কাটিতে বলি, তাহারা এই উত্তর দিত যে সূতাকাটা শুধু স্ত্রীলোকদেরই কাজ এবং তাহাদের নিজেদের পক্ষে সূতাকাটা সম্মানজনক নয়। মর্যাদার দিক হইতে বর্তমানে পুরুষেরা কোন আপত্তি করে না। হাজার হাজার লোক ত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ সূতা কাটে। যখন দেশহিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া পুরুষেরা সূতা কাটিতে আরম্ভ করে তখন ইহা একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও অনেক নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হয়। তাহা হইলেও অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সূতাকাটা স্ত্রীলোকদেরই একটি বিশেষত্ব। এই অভিজ্ঞতার সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। সূতাকাটা বস্তুতঃ অত্যন্ত ধীর এবং অপেক্ষাকৃত নীরব কাজ। নারী ত্যাগের এবং সেইহেতু অহিংসার প্রতিমূর্তি। তাহাদের জীবনের কাজ সংগ্রাম অপেক্ষা শান্তিরই অধিক সহায়কারী। হিংসাত্মক যুদ্ধের আসরে নারীকে আজ টানিয়া নেওয়া হইতেছে—ইহা বর্তমান সভ্যতার গৌরবের বিষয় নহে। হিংসা নারীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শীঘ্রই নারীসমাজ তাহার মৌলিক প্রকৃতির উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। আমি ইহাও মনে করি যে, পুরুষও তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ করিবে। স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির সমান

অধিকার বলিতে ইহা বুঝায় না যে তাহাদের কর্তব্যসমূহও একই প্রকারের হইবে। নারীর পক্ষে পশু শিকার করা বা বল্লম পরিচালনা করার বিরুদ্ধে আইনের কোন বাধা নাই। কিন্তু যে কাজ পুরুষের করণীয়, নারী তাহার স্বভাবজাত বুদ্ধির বশেই সে কাজ হইতে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের অনুপূরকরূপে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের আকৃতিগত বৈষম্যের ন্যায় তাহাদের কর্তব্যগত কাজগুলিও সুনির্দিষ্ট।

আমার উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্ন কাজের প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ ভারতবর্ষে এই বিষয়টি সত্য যে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক সূতাকাটাকে তাহাদের স্বাভাবিক পেশা বলিয়া মনে করে। ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব স্বতঃই পুরুষের বোঝা নারীর উপর ফেলিয়াছে এবং তাহাদিগকে পারদর্শিতা দেখাইবার এই সুযোগ দিতেছে; আমার ভবিষ্যৎ সেনাদলে পুরুষ হইতে নারীর বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখিতে আমি ইচ্ছা করি। যদি যুদ্ধই করিতে হয় তবে আমি তাহাদিগকে নিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিব, পুরুষের সংখ্যাধিক্য থাকিলে তাহা পারিব না। পুরুষের হিংসাবৃত্তিকে আমি অত্যন্ত ভয় করি। হিংসার এইরূপ অভিব্যক্তির প্রতিকূলে নারীগণ আমার প্রতিভূস্বরূপ হইবেন।

সেবাগ্রাম, ২৭-১১-'৩৯

[হরিজন, ২-১২-'৩৯]

মদ্যপানের অভিশাপ

জনৈকা ভগিনী লিখিতেছেন—

"গ্রামে গিয়া এই সকল লোকের ভিতর মদ্যপান কি সর্বনাশ করিতেছে তাহা জানিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হই। কয়েকজন স্ত্রীলোক কাঁদিতেছিল। তাহারা কি করিতে পারে? এমন স্ত্রীলোক নাই যে তাহাদের মধ্য হইতে মদ্যপান চিরতরে বিদূরিত করিতে ইচ্ছা না করে। পারিবারিক দুঃখদুর্দশা, দারিদ্র্য, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং দৈহিক অক্ষমতার একমাত্র কারণ পানদোষ। পুরুষের এই পানাসক্তির সকল দুর্গতি সাধারণতঃ নারীকেই ভুগিতে হয়। আমি নারীদিগকে কি উপদেশ দিতে পারি? ক্রোধ এবং নৃশংসতার সম্মুখীন হওয়া বড়ই কঠিন। সাম্প্রদায়িক বাঁটওয়ারার অবিচারের বিরুদ্ধে সময়, শক্তি এবং বুদ্ধি না খাটাইয়া এই প্রদেশের নেতৃবৃন্দ পানদোষ দূরীভূত করিবার জন্য এই সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করুন, আমি ইহা ইচ্ছা করি। প্রকৃতপক্ষে গুরুতর কাজগুলি আমরা অনেক সময় অবহেলা করিয়া সামান্য সামান্য বিষয়ে মনোযোগ দিই। লোকের নৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে এই সামান্য বিষয়গুলি আপনা আপনিই মিটিয়া যায়। মদ্যপান সম্বন্ধে আপনি কি কিছু লিখিতে পারেন না? এই পাপে অসংখ্য লোক বস্তুতঃ নরকের পথে যাইতেছে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।"

—যাহারা মদ্যপায়ী তাহাদের নিকট আমার অনুনয়-বিনয়ে কিছু হইবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহারা 'হরিজন' কখনও পড়ে না। যদি বা পড়ে, তবে শুধু উপহাসের জন্য। মদ্যপানের কুফল অবগত হওয়ার জন্য তাহাদের কোনই আকর্ষণ

থাকিতে পারে না। তাহারা এই কু-অভ্যাস আগ্রহের সহিত পোষণ করে। এই পত্রলেখিকা ভগিনীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই এবং তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের সকল নারীকে আমি জানাইয়া দিতে চাই যে, ডাণ্ডি অভিযানের সময় তাঁহারা আমার উপদেশ শুনিয়াছিলেন এবং মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং চরকায় সূতাকাটা তাঁহাদের বিশেষ করণীয় কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। লেখিকা যেন স্মরণ করেন যে হাজার হাজার নারী নির্ভীকচিত্তে মদের দোকানগুলি ঘিরিয়া থাকিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে পানাসক্ত ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের অনুনয়-বিনয় দ্বারা এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে তাঁহারা সফলকাম হইতেন। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকার্য পরিচালনার সময় তাঁহাদিগকে মদ্যপায়িগণের গালিগালাজ, এমনকি আঘাতও সহ্য করিতে হইয়াছে। শত শত নারী মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য কারাগারে গিয়াছেন। সমগ্র দেশের উপর তাঁহাদের এই আন্তরিক আগ্রহপূর্ণ কাজ আশ্চর্যজনক ফল প্রসব করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি তৎপূর্বেও, সেই কাজে শিথিলতা আসে। কি জন্য আন্দোলন শিথিল হইয়া যায় তাহার কারণ নির্দেশের প্রয়োজন নাই। কর্মীদের জন্য সেই পথ আজও উন্মুক্ত। নারীগণের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় নাই। যে পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ না হয় সেই পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা পূরণ হইবে না। নারীর কাজ এখানে ছিল উন্নত স্তরের। পুরুষের মধ্যে যে সকল গুণ লুক্কায়িত

আছে, অনুনয়-বিনয় দ্বারা তাহা উন্মেষিত করিয়া মদের দোকান-গুলি তাঁহারা শূন্য করিয়া দিয়াছিলেন এবং এইভাবে তাঁহারা মাদকদ্রব্য সেবন নিবারণ করেন। যদি তাঁহাদের কাজ ক্রমাগত চালাইয়া যাইতে পারিতেন তবে তাঁহাদের বিনয়, নম্রতা এবং আন্তরিকতা নিশ্চয়ই মদ্যপায়িগণের এই কু-অভ্যাস দূর করিতে পারিত।

কিন্তু জগতে কিছুই বিনষ্ট হয় না। নারীগণ এখনও সেই আন্দোলন পুনরায় নিয়মবদ্ধরূপে আরম্ভ করিতে পারেন। লেখিকা যাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের পত্নীগণ মনেপ্রাণে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের স্বামীদিগকে নিশ্চয়ই সুপথে আনিতে পারেন। সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বামীর উপর স্ত্রীর ক্ষমতা কতদূর তদ্বিষয়ে নারীগণ সচেতন নন। অবশ্য অজ্ঞাতসারে সর্বদাই তাঁহারা স্বামীদিগকে প্রভাবিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়; সেই বোধ তাঁহাদের থাকা চাই এবং এই আত্মচেতনাই তাঁহাদিগকে শক্তি প্রদান করিবে এবং কোন্ পথে তাঁহাদের জীবনসঙ্গীদিগকে চালাইতে হইবে তাহাও নির্দেশ করিয়া দিবে। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর অধিকাংশ পত্নীগণ তাঁহাদের স্বামীদের কার্যাকার্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন না বা তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের ধারণা, এরূপ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ইহা কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় না যে, স্ত্রীর চরিত্ররক্ষা সম্বন্ধে স্বামীর যেরূপ কর্তব্য রহিয়াছে স্বামীর চরিত্ররক্ষা সম্বন্ধেও স্ত্রীর অনুরূপ দায়িত্ব রহিয়াছে। তথাপি ইহা অপেক্ষা সরল আর কিছুই

নয় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পাপপুণ্যের সমান অংশীদার। নারী ব্যতীত আর কে পত্নীদিগকে তাঁহাদের শক্তি এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সফলতার সহিত সচেতন করিতে পারে? পানদোষ নিবারণকল্পে নারী-আন্দোলনের ইহা একদিক মাত্র।

মদ্যপায়ীর সংখ্যা, পানদোষের কারণ ও তৎপ্রতিকারের উপায়, পানদোষের জন্য প্রতি পরিবারের আর্থিক, নৈতিক অবনতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও লোকশিক্ষার্থ তাহার ব্যবহারবিষয়ে শিক্ষিতা বহু রমণীর প্রয়োজন। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা নিতে হইবে এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, মদ্যপায়ীদিগকে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য শুধু অনুনয়-বিনয়ে কোনো স্থায়ী ফললাভ করা যাইবে না। অভ্যাসটিকে একটি রোগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে। অর্থাৎ কতিপয় নারীকে ছাত্রের ন্যায় নানা উপায়ে ও প্রণালীতে গবেষণায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। যে সকল বিষয়ে সংস্কার সাধন করিতে হইবে সেই সকল বিষয়ের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা সেগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে যে সকল সংস্কার বাঞ্ছনীয় মনে হয়, তত্তদ্বিষয়ে সংস্কারকদিগের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবই সেগুলির আংশিক বা সম্পূর্ণ বিফলতার মূল কারণ। সেহেতু সংস্কারের নামে যে সকল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তাহাদের অনেকটিই সংস্কার আখ্যা পাইবার যোগ্য নয়।

[হরিজন, ২৪-৪-'৩৭]

৮৫

দুঃখী ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ কর

জাফ্‌না উদিভিল বালিকা কলেজে ২৯।৯।১৯২৭ তারিখে প্রদত্ত গান্ধীজীর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত—

"আজ সকালে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান তোমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আসিয়াছে; সেইজন্য সাধারণ অর্থভাণ্ডারের সঙ্গে তাহা মিশাইয়া দেওয়া আমার ভাল লাগে নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারটি আমি যথাসম্ভব ভাল অর্থেই গ্রহণ করিতেছি। বালকদের চেয়ে তোমরা বেশী লাজুক; তাই আমাকে যে তোমরা কিছু দিয়াছ তাহা আমাকে জানিতে দিতে চাও নাই। আমি সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ বালিকার সঙ্গে মিশিয়াছি এবং এখন তাহারা যে সকল ভাল ভাল কাজ করে তাহা আর আমার নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে পারে না।

এমন কতিপয় বালিকা আছে যে তাহারা যে সকল মন্দ কাজ করে তাহাও আমাকে বলিতে দ্বিধা করে না। আমি আশা করি, আমার সম্মুখে এমন একটি বালিকাও নাই যে মন্দ কাজ করে। তোমাদিগকে জেরা করিবার সময় আমার নাই এবং তোমাদিগকে প্রশ্ন করিয়া ত্যক্ত করিতেও চাই না। কিন্তু এখানে যদি এমন বালিকা থাকিয়া থাকে যাহারা মন্দ কাজ করে তাহা হইলে

আমি দ্বিধাশূন্যভাবে তাহাদিগকে বলিব, তাহাদের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

পিতামাতা তোমাদিগকে পুতুল বানাইবার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান নাই। পক্ষান্তরে, তোমরা রুগ্ন এবং দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সেবার ব্রত গ্রহণ করিবে, ইহা আশা করা যায়। তোমরা এই ভুল করিও না যে যাহারা বিশিষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত তাহারাই কেবল দয়াব্রতী ভগিনীসঙ্ঘ (Sister of Mercy) বলিয়া অভিহিত হয়। যে নিজের বিষয় খুব কম ভাবে এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত গরীব এবং দুঃস্থ তাহাদের কথাই অধিক চিন্তা করে, সেই নারী তখনই দয়াব্রত পালনের অধিকারিণী হয়। আমাকে যে অর্থভাণ্ড উপহার দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের চেয়ে যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্গত তাহাদের জন্য ; সেই অর্থকোষে তোমাদের যথাসাধ্য দান করিয়া সেবাব্রতী ভগিনীদের ন্যায় কাজ করিয়াছ।

সামান্য অর্থদান করা সহজ ব্যাপার ; নিজে একটি ক্ষুদ্র কাজ করা তদপেক্ষা কঠিন। যাহাদের জন্য অর্থ দান করিয়াছ, প্রকৃতই যদি তাহাদের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদে, তাহা হইলে তোমাদিগকে আরো এক ধাপ আগাইয়া যাইতে হইবে এবং এই সকল লোক যে খদ্দর প্রস্তুত করে তাহা তোমাদের পরিতে হইবে। তোমাদের সামনে খাদি আনিলে তোমরা যদি বল "খাদি একটু মোটা, আমরা উহা পরিতে পারি না" তবে বুঝিব যে তোমাদের ভিতর আত্মত্যাগের ভাব এখনও জাগে নাই।

ইহা এমন সুন্দর একটি জিনিস যে এখানে উচ্চনীচ শ্রেণীভেদ নাই; স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার বালাই নাই। যদি তোমাদের মনের গতিও সেই দিকে গিয়া থাকে এবং অন্য বালিকাদের চেয়ে নিজদিগকে উচ্চ বলিয়া মনে না কর তবে উহা প্রকৃতই অত্যন্ত শুভ লক্ষণ মনে করিব।

ভগবানের আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক।

৮৬

ছাত্রীদের প্রতি উপদেশ

জাফ্না রামনাথান বালিকা কলেজে ২৭।১১।১৯২৭ তারিখে প্রদত্ত গান্ধীজীর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত—

জাফ্নার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষায়তনগুলি পরিদর্শন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আজ সকালে আসিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। পরিভ্রমণের পটে ইহাই যেন শেষ তুলিকাস্পর্শ।

তোমাদের অভিনন্দনপত্রে তোমরা এই দিবসকে একটি বাৎসরিক উৎসবের ন্যায় পালন করিবে এবং খাদির সাহায্যের জন্য এই দিন অর্থসংগ্রহ করিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। ইহা আমার হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছে। আমি জানি, এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের বৃথা বাগাড়ম্বর নয়, এবং অলজ্ঘ্য নিয়মের মত এই প্রতিজ্ঞা তোমরা প্রতিপালন করিবে। অনশনক্লিষ্ট যে লক্ষ লক্ষ নিরন্নের জন্য আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি

তাহাদের ভগিনীদের এই প্রতিজ্ঞার বিষয় যদি তাহারা বুঝিতে পারিত তবে বিশেষ আনন্দিত হইত, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমার এই কথা শুনিয়া তোমরা দুঃখিত হইবে যে, আমি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও সেই মূক জনসাধারণ এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে না, অথচ তাহাদের জন্যই তোমরা আমাকে টাকার থলী উপহার দিয়াছ এবং এরূপ উপহার সিংহলের অন্যান্য বহু স্থান হইতেও আমি পাইয়াছি। আমি তাহাদের দুর্দশার কাহিনী যতই বর্ণনা করি না কেন তদ্দারা সেই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে কি ভয়ানক তাহার বাস্তব চিত্র তোমরা কল্পনা করিতে পারিবে না।

এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠে—ইহাদের জন্য এবং এইরূপ অন্যান্য দুঃস্থ লোকদের জন্য তোমরা কি করিতে পার? জীবনযাত্রা আর একটু সরল এবং সাদাসিধা কর এবং আর একটু বেশী মিতব্যয়ী হও, ইহা বলা সহজ, কিন্তু তদ্দারা বাস্তব সমস্যা শুধু এড়াইয়া যাওয়া হইবে মাত্র।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি চরকার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম। আমি নিজকে নিজে বলিয়াছি এবং তোমাদিগকেও এখন বলিতেছি যে, এই অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের সহিত যদি তোমরা একটি প্রাণসূত্রের যোগ স্থাপন করিতে পার তবে তোমাদের, তাহাদের এবং সমগ্র জগতের বাঁচিবার আশা আছে।

তোমাদের বিদ্যালয়ে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাও দেওয়া হয়,—ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তোমাদের একটি সুন্দর মন্দিরও

আছে। তোমাদের সময়সূচী হইতে দেখা যায় যে তোমরা পূজা করিয়া দিনের কাজ আরম্ভ কর। ইহা ভাল এবং নৈতিক উন্নতির সহায়; কিন্তু ইহা সহজেই শুধু একটি সুন্দর লৌকিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইতে পারে, যদি দৈনন্দিন জীবনে সেই পূজাকে আমরা বাস্তবে পরিণত না করি। সেইজন্য আমি বলি, পূজাকে অনুসরণ করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হও, চরকা গ্রহণ কর, অর্ধ ঘণ্টা সময় চরকা নিয়া সূতা কাট এবং যে জনসমাজের কথা আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি তাহাদের কথা ভাব এবং ভগবানের নাম নিয়া বল "আমি তাহাদের জন্যই সূতা কাটি"। যদি মনেপ্রাণে ইহা কর এবং এই জ্ঞান তোমাদের থাকে যে সেই পূজা তোমাদিগকে অধিকতর বিনয়ী এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারিণী করিয়া তুলিতেছে, যদি বাহ্যিক শোভার জন্য পোশাক পরিচ্ছদ না পরিয়া শুধু দেহাচ্ছাদনের জন্য পর, তাহা হইলে খাদি পরিধান করিতে তোমাদের কোন দ্বিধা হইবে না এবং সেই অগণিত নিরন্নদের এবং তোমাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিবে।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে এই পর্যন্ত বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব না।

স্যর রামনাথান এবং তাঁহার পত্নী এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ তোমাদের প্রতি যেরূপ যত্ন নিতেছেন এবং তোমাদের উপর যেরূপ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি রাখিতেছেন, সেই সকলের উপযুক্ত হইতে হইলে তোমাদিগকে আরো অনেক কিছু করিতে হইবে। তোমাদের পত্রিকায় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রীরা কে

কি করিতেছে এই বিষয় কতকটা গর্বের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই গর্ব মার্জনীয়। এইরূপ চারি-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তি দেখিলাম—অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ হইয়াছে। কিংবা ২২ বা ২৫ বৎসরের প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক ; ইহার মধ্যে গর্বের কিছু নাই। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞপ্তির মধ্যে একটি বালিকাও নিজেকে কেবল সেবাব্রতে উৎসর্গ করিয়াছে এরূপ কিছু দেখিতে পাই না। সেইজন্য আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই, এবং ইহা আমি বাঙ্গালোরের মহারাজার বালিকা কলেজের মেয়েদিগকেও বলিয়াছি যে, শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের পরিচালনায়, অপরিমিত দান ও প্রচেষ্টায় যে সকল মহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হইতেছে তাহার তুলনায় আমরা নগণ্য ফল লাভ করিয়া থাকি, কারণ বিদ্যালয় হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সকলেই পুতুলের মত হইয়া যাও এবং সমাজের জীবন হইতে সরিয়া পড়।

বালিকাদের বেশীর ভাগই স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইবার পরই জাতীয় জীবন হইতে দূরে চলিয়া যায়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সেরূপ হইবার কোন কারণ নাই। মিস এমেরী এবং অন্যান্য যাঁহারা তত্ত্বাবধান করিতেছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদের সম্মুখে ; ইহা আমার বলা বোধ হয় ভুল হইবে না যে তাঁহারা সকলেই অবিবাহিতা।

বালিকামাত্রই, বিশেষতঃ ভারতের প্রত্যেক বালিকাই, বিবাহ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি এমন অনেক বালিকা দেখাইতে পারি যাহারা একজনের সেবিকা না হইয়া

লোককল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। প্রকৃত সময় আসিয়াছে যখন হিন্দু বালিকাদিগকে সীতা এবং পার্বতীর আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কিংবা সম্ভব হইলে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তোমরা নিজদিগকে শৈব বলিয়া থাক। পার্বতা কি করিয়াছিলেন তাহা তোমরা জান। স্বামিলাভের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নাই অথবা তিনি নিজেকে বিক্রীত হইতেও দেন নাই। আজ তিনি সপ্ত "সতীর" একজন বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দুদের চিত্তাকাশে শোভমান রহিয়াছেন। শিক্ষায়তনের উপাধিলাভ করিয়া তিনি এ ঐশ্বর্য লাভ করেন নাই; তাঁহার অশ্রুতপূর্ব তপস্যাই তাঁহার এই গৌরবের কারণ।

আমি জানিতে পারিলাম, এখানে ঘৃণ্য পণপ্রথা বর্তমান। এই কারণে তরুণীদের উপযুক্ত বিবাহ অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। তোমাদের অনেকেই প্রাপ্তবয়স্কা, এই সকল প্রলোভন হইতে তোমরা নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে, আশা করা যায়। তোমরা যদি এই সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াও তবে তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে হয় আজীবন অথবা অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য অবিবাহিতা থাকিতেই হইবে। তারপর যখন তোমাদের বিবাহ করিবার সময় আসিবে এবং বুঝিতে পারিবে কর্মক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গী একজন চাই, তখন পার্বতীর ন্যায় অতুলনীয়গুণসম্পন্ন, চরিত্রবান বরের অনুসন্ধান করিবে; ধনবান বা বিশ্রুতকীর্তি বা সুন্দর পুরুষের জন্য ব্যগ্র হইবে না। নারদ পার্বতীর নিকট শিবের রূপ বর্ণনা

করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা জান—পথের কাঙ্গাল, সর্বাঙ্গ-ভস্মাচ্ছাদিত, সৌন্দর্যবিহীন এবং ব্রহ্মচারী। পার্বতী উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব।" তপস্যা না করিলে তোমরা শিবের মত পতি লাভ করিতে পারিবে না। তবে পার্বতীর ন্যায় সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যার প্রয়োজন নাই; মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর—আমরা ততটা করিতে পারিব না। কিন্তু অন্ততঃ তোমাদের এই জীবনের মধ্যে সেরূপ তপস্যা করিতে পার।

যদি এইসকল নিয়ম মানিয়া চল তবে তোমরা পুতুলের রাজ্যে গিয়া অদৃশ্য হইতে অস্বীকার করিবে। পার্বতী, দময়ন্তী, সীতা এবং সাবিত্রীর মত "সতী" হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিও। যতদিন তাহা না করিতে পারিবে, এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ছাত্রী বলিয়া তোমরা গণ্য হইতে পারিবে না, —ইহাই আমার মত।

ভগবানের কৃপায় এইরূপ আস্পৃহা তোমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক এবং তাহা হইলে তাঁহারই আশীর্বাদে তোমাদের এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

৮৭
নারী এবং অস্পৃশ্যতা

[১৯৩৩-৩৪ সালে হরিজন সফরে বিভিন্ন নারীসভায় গান্ধীজীর দেওয়া বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।]

বিলাসপুরে

ভগিনীগণ, তোমাদিগকে হরিজনদের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব দান করিতে বলি। তোমাদের অভিনন্দনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ—কিভাবে হরিজনদের সেবা করিতে পার। সর্বাগ্রে বলিতে চাই, তোমাদের হৃদয় হইতে অস্পৃশ্যতা উন্মূলিত কর; এবং নিজের সন্তানের ন্যায় হরিজন বালকবালিকাদের সেবা করিতে শিখ। নিজের আত্মীয়ের মত, নিজের ভাইভগিনীর মত একই ভারতমাতার সন্তানের মত তাহাদিগকে ভালবাসিবে। সেবা এবং ত্যাগের জীবন্ত প্রতীকস্বরূপে আমি নারীকে পূজা করিয়া থাকি। প্রকৃতিদেবী নিঃস্বার্থ সেবার মনোবৃত্তি নারীর হৃদয়ে নিহিত করিয়াছেন; সেইক্ষেত্রে পুরুষ কখনও নারীর সমকক্ষ হইতে পারে না। নারীহৃদয় করুণায় পূর্ণ; দুঃখ দেখিলেই তাহার হৃদয় গলিয়া যায়। হরিজনদের দুর্দশা যদি তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করে এবং তোমরা অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে পার, তৎসঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-নীচের প্রভেদ ভুলিয়া যাইতে পার, তবে হিন্দুধর্ম পবিত্রীকৃত হইবে এবং আধ্যাত্মিক

উন্নতির পথে হিন্দুসমাজ বহুদূর অগ্রসর হইবে। ইহার শেষ ফল হইবে সমগ্র ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর কল্যাণ। মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশ পবিত্রীকরণের যে আশ্চর্য উপায় অবলম্বন করিবে, সমগ্র মানবজাতির উপর তাহার প্রতিক্রিয়া মঙ্গলজনক না হইয়া পারে না। সুদূরপ্রসারী অশেষ কল্যাণের ধারা এই আন্দোলনে নিহিত রহিয়াছে; আত্মশুদ্ধির আন্দোলনের মধ্যে ইহাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড়। আমি আশা করি, তোমরা ইহাতে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবে।

দিল্লীতে

জগৎস্রষ্টা ভগবানের নিকট তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীই সমান। তিনি যদি মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ এই ভেদ সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, যেমন হস্তী এবং পিপীলিকার মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিতে ভেদ, তেমন ভেদ মানুষেও থাকিত। তিনি নিরপেক্ষভাবে সকল মনুষ্যকেই একই রকম আকৃতি দিয়াছেন এবং তাহাদের স্বাভাবিক অভাবগুলিও একই রকমের করিয়াছেন। হরিজনেরা ময়লা পরিষ্কারের কাজ করে বলিয়া যদি তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে কর, তবে কোন্ মা নিজ সন্তানের জন্য সেইরূপ কাজ করেন নাই? হরিজনেরা সমাজসেবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়; তাহাদিগকে অস্পৃশ্য এবং সমাজবহির্ভূত মনে করা ঘোরতর অবিচার। অস্পৃশ্যতা যে পাপ এই ভাব হিন্দু ভগিনীগণের

মনে জাগাইবার জন্য আমি বর্তমান সফরে বাহির হইয়াছি। যে কোন মনুষ্যকে নিজের চেয়ে ছোট বলিয়া মনে করা কখনই প্রশংসার বিষয় হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন নামে আমরা সকলেই একই ভগবানের উপাসক। কাজেই মূলতঃ যে আমরা এক ইহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে; অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইবে; এবং মানুষের মধ্যে ছোট বড় এই ভেদের ভাবও দূরীভূত করিতে হইবে।

মাদ্রাজে

আমি তোমাদিগকে একটি কাজ করিতে বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। একেবারে ভুলিয়া যাও যে কেহ উচ্চ, কেহ নীচ। সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাও যে কেহ স্পৃশ্য এবং কেহ বা অস্পৃশ্য। আমি জানি আমার মত তোমরাও ভগবানে বিশ্বাস কর; ভগবান এত নির্দয় এবং ন্যায়পরাঙ্মুখ নন যে তিনি মানুষে মানুষে, নারীতে নারীতে উচ্চ এবং নীচ এই ভেদ সৃষ্টি করিবেন। এই অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের কলঙ্ক; যদি অস্পৃশ্যতা বর্তমান থাকে হিন্দুধর্ম উৎসন্ন যাইবে, ইহা বলিতে আমি দ্বিধা করি নাই। ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানবের ভাষা প্রযোজ্য হইলে বলা যায়, ভগবান আমাদের অনেক অনাচার সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি ভগবানের সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। হিন্দুভারতে মানুষের

প্রতি মানুষ যে নৃশংস অত্যাচার করিতেছে তাহা ভগবানের করুণার সীমা অতিক্রম করিতেছে।

বাঙ্গালোর

যখন আমরা মনে করি কতক লোক আমাদের চেয়ে নীচ, তখন বুঝিতে হইবে আমাদের মধ্যে পাপের মাত্রা অত্যন্ত অধিক। এই পাপ হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ইহা আমাদিগকে সর্বথা গ্রাস করিবে। প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য একটি হিন্দুও বর্তমান থাকিবে না এবং যদি আমাদের অদৃষ্ট সেইরূপই হয় তবে আমার বিবেচনায় তাহা আমাদিগের উপযুক্ত শাস্তিই হইবে। এই সতর্কবাণী প্রচার করিবার জন্যই আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিতেছি। কাজেই যদি হরিজনদিগকে তোমরা তোমাদের সহোদর ভাইভগিনীর মত দেখিতে পার, ইহা তোমাদের পক্ষে একটি মহৎ ধর্মের কাজ হইবে।

[হরিজনদের আবাস পরিদর্শন করিয়া তিনি আর একটি বক্তৃতা দেন ; মহীশূরের হরিজনদিগের বাসস্থানগুলির তুলনায় এখানকার বাসস্থানগুলি অতিমাত্রায় বিসদৃশ ও কদর্য।]

আমি এই নীতিতে বিশ্বাস করি যে তুমি অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে চাও তোমাকেও তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। আজ সকালে এইমাত্র যে সকল খোঁড়ল দেখিয়া আসিলাম সেগুলি মানুষের বাসের অযোগ্য।

জীবনের সর্বনিম্ন একটি মান আছে—মানবতার সীমা পদদলিত না করিয়া তার নীচে আর নাবা যায় না। যে গর্তগুলি আমি দেখিয়া আসিয়াছি সেগুলি সর্বনিম্ন মানের চেয়েও নিকৃষ্ট। অনেক বিষয়ে এই শহরটি সুন্দর এবং সেই জন্য আমি ইচ্ছা করি, সর্বাগ্রে এই সুন্দর স্থানটির কলঙ্কের দাগগুলি দূরীভূত হউক। আমাকে বলা হইয়াছে, এই নিরুপায় ভ্রাতাভগিনীদের অপেক্ষাকৃত ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা ইতঃপূর্বেই করা হইয়াছে। এই বিষয়ে সুব্যবস্থা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। এ ক্ষেত্রে সময়ের প্রশ্ন অতি মূল্যবান। শেষে যেন তোমাদের বলিতে না হয়—'হরিজনদের বাসভবন তৈরী হল, কিন্তু তাতে বাস করবার লোক জীবিত নাই!'

৮৮

নারীগণের প্রতি স্পষ্ট কথা

[কাশীতে নারীদের সভায় হরিজন সফরের শেষ বক্তৃতা দিবার সময় গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মত সংক্ষেপে এইভাবে বলেন—]

ইহা শোচনীয় পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে ধর্ম বলিতে আমরা খাদ্য এবং পানীয়ের কতগুলি বাধা-নিষেধ এবং স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বা উচ্চ-নীচ এই সংস্কার আঁকড়িয়া থাকার অধিক কিছু বুঝি না। এর চেয়ে ঘোরতর মূর্খতা আর কিছু হইতে পারে না, ইহা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই। জন্ম এবং

আচারের কতিপয় নিয়ম পালন দ্বারা কে উচ্চ কে নীচ তাহা নির্ণয় করা যায় না। কেবল চরিত্র দ্বারাই উচ্চ-নীচ নিরূপণ করা সম্ভব। ভগবান মানুষকে উচ্চ বা নীচ কোন চিহ্ন দিয়া সৃষ্টি করেন নাই, যে ধর্মশাস্ত্র স্ত্রী বা পুরুষের জন্ম দ্বারা মানুষকে উচ্চ বা নীচ বলিয়া নির্দেশ করে সেই শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। ইহা দ্বারা ভগবানকে এবং সত্যকে অস্বীকার করা হয়; সত্যই ভগবান। ভগবান সত্য, মঙ্গল এবং ন্যায়ের প্রতীক। তিনি এমন কোন ধর্ম বা আচারের অনুমোদন করিতে পারেন না যদ্দারা আমাদের বিপুল জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই অদ্ভুত উৎকট ধারণা তোমরা বর্জন কর,—এই আমি চাই। অশুচি কাজের সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতা থাকিবেই; ইহা সকল মানুষের প্রতিই প্রযোজ্য। যে মুহূর্তে আমরা ধূলা বা ময়লা ধুইয়া নিজেদের পরিষ্কার করি তখনই সেই অশুচিতা দূর হইয়া হায়। কোন কাজ বা আচরণ কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষকে চিরকালের জন্য অস্পৃশ্য করিয়া রাখিতে পারে না।

আমরা সকলেই পাপী—কেহ কম, কেহ বা বেশী। আমাদের প্রত্যেকটি ধর্মগ্রন্থ—গীতা, ভাগবত, তুলসী রামায়ণ—স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়াছে, যে তাঁহার শরণ নেয়, যে তাঁহার নাম করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেই সত্য বাক্য সমগ্র মানবজাতির জন্য।

এই প্রশ্নটি আরও সহজ একটি উপায়ে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি। মানব বা মানবেতর প্রত্যেক জাতির

কোন না কোন বিশিষ্ট চিহ্ন আছে ; তদ্দ্বারা তুমি মানুষকে পশু হইতে, কুকুরকে বিড়াল হইতে পৃথক করিয়া চিনিতে পার। তথাকথিত অস্পৃশ্যগণের এমন কোন বিশেষ চিহ্ন আছে কি যদ্দ্বারা তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া চিহ্নিত করিতে পার ? তাহারা আমাদের মতই মানুষ ; কিন্তু মানবেতর প্রাণীদিগকেও আমরা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করি না। কিরূপে এবং কোথা হইতে এই উৎকট অন্যায়ের, অবিচারের উৎপত্তি ? ইহা ধর্ম ত নয়ই, বরং ঘোরতর রকমের অধর্ম। এখনও যদি তোমাদের সেই পাপ থাকিয়া থাকে তবে তোমরা সেই পাপ ঝাড়িয়া ফেল, এই আমি চাই।

বহুশতাব্দীর অর্জিত এই পাপ ক্ষালনের একমাত্র উপায়— হরিজনদিগকে সহায়তা করা। তাহাদের বাসস্থানে যাও, তোমাদের নিজের সন্তানের মত তাহাদের সন্তানদিগকে আদর কর ; তাহাদের মঙ্গলের জন্য নিজেরা উদ্বুদ্ধ হও ; খোঁজ কর তাহারা যথেষ্ট খাইতে পায় কিনা, তাহারা বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় কিনা, তোমরা স্বাধিকারবলে যে বিশুদ্ধ আলো এবং বায়ু উপভোগ কর তাহারা তাহা পায় কিনা। অন্যদিকে তোমরা সূতাকাটা যজ্ঞ আরম্ভ কর, খাদি পরিধান করিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর। খাদি এই সকল অধোনিমজ্জিত লক্ষ লক্ষ লোককে সহায়তা করে। সূতাকাটা যজ্ঞ তাহাদের সঙ্গে একত্রে মিলিতে মিশিতে কিয়ৎপরিমাণে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। তোমাদের পরিধানের প্রত্যেক গজ খাদি হরিজনদের এবং গরীবদের হাতে কিছু অর্থ যোগাইয়া দিবে।

সর্বশেষ কথা এই, তোমরা যথাসাধ্য হরিজন ফণ্ডে দান কর,—হরিজনের অদৃষ্ট উন্নত করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

[হরিজন, ৩১-৮-'৩৪]

৮৯

নারীগণ অধিকতর শক্তিমতী

প্রশ্ন। অপ্রতিরোধ বুদ্ধিবশে চলিতে গেলে কি সবলের বশ্যতা স্বীকার করা হইবে না ?

উত্তর। নিশ্চেষ্ট অপ্রতিরোধ দুর্বলের অস্ত্র। কিন্তু যে প্রতিরোধের আমি একটা সম্পূর্ণ নূতন নামকরণ করিয়াছি তাহা সর্বাপেক্ষা সবলের অস্ত্র। আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য আমাকে এই নূতন শব্দ যোজনা করিতে হইয়াছে। ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য এইখানে যে, যদিও ইহা সবচেয়ে সবলের অস্ত্র, কিন্তু দুর্বলকায়, বৃদ্ধ, এমনকি বালকবালিকারাও এই অস্ত্র চালনা করিতে পারে—যদি তাহাদের দুর্বার সাহস থাকে। "সত্যাগ্রহ" ব্রতে দুঃখবরণের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া এই অস্ত্র নারীদের জন্যও বিশেষভাবে উন্মুক্ত। গত বৎসর আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক স্থলে ত্যাগ এবং দুঃখবরণে নারীগণ তাহাদের ভ্রাতাগণকে অতিক্রম করিয়াছে এবং উভয়ে একযোগে এই সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সত্যাগ্রহ সাধনায় আত্মত্যাগের প্রেরণা

সকলের মধ্যেই সংক্রামিত হয় এবং তাহাদের স্বার্থলেশহীন কাজগুলি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। ইউরোপের নারী এবং বালকবালিকাগণ যদি বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া উঠিত তবে তাহারা পুরুষদিগকে অচিরেই অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিত এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এক এক জাতির সমরস্পৃহা দূরীভূত করিয়া দিত। অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই,—নারী, শিশু এবং অন্যান্য সকলেরই আত্মা এক এবং তাহাদের প্রসুপ্ত কর্মশক্তি একই প্রকারের। সত্যের অসীম শক্তিরাশির স্ফুরণই মুখ্য বিষয়।

৯০

সমাজে নারীর স্থান

প্রশ্ন। নাগরিক এবং রাজনৈতিক চেতনা জাগরিত হওয়ায় ভারতীয় নারীদের চির-আচরিত গৃহকর্মাদি এবং তাহাদের সামাজিক কর্তব্য এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি কোন নারী সর্বসাধারণের কাজে যোগদান করে তবে তাহার পক্ষে সন্তানসন্ততি এবং গৃহকর্ম অবহেলা করা সম্ভবপর। এই উভয় সঙ্কটের সমাধান কি?

উত্তর। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নারীর সময় অত্যাবশ্যক গৃহকর্মাদিতে ব্যয়িত না হইয়া তাহার প্রভুর আত্মসর্বস্ব ভোগবিলাস সাধনে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় বিলাসিতার জন্যও ব্যয়িত হয়। গৃহমধ্যে নারীর এই দাসীপনা আমাদের বর্বরতার প্রতীক বলিয়া আমার নিকট মনে হয়।

আমার মতে রান্নাঘরের এই দাসীবৃত্তি মুখ্যতঃ বর্বরতার চিহ্ন। আমাদের নারীজাতিকে এই ভূতের হাত হইতে মুক্তিদান করিবার প্রকৃত সময় আসিয়াছে। গৃহকর্ম নারীর সমগ্র সময় গ্রাস করিবে ইহা অবৈধ, অসঙ্গত।

[হরিজন, ৮-৬-'৪০]

৯৭

নারীর উপর অত্যাচার

আজ সমগ্র পৃথিবীর পরীক্ষা হইতেছে। যুদ্ধের প্রভাব কেহ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। যদিও রামায়ণ এবং মহাভারত কবির কল্পনাপ্রসূত, তবু বলা যায় ইহাদের কবি কেবল কাব্যপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন সত্যদর্শী ঋষি। তাঁহারা যাহা চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন আজও আমাদের চক্ষের সম্মুখে তাহা ঘটিতেছে। রাবণেরা পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত। তাহারা অসীম শক্তি প্রদর্শন করিয়া আকাশ হইতে তাহাদের সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনপ্রকার বীরত্বের কাজই তাহাদের শক্তি বা কল্পনার অতীত নয়।

মানুষ এইভাবে যুদ্ধ করিতে পারে না—দেবতাদের ত কথাই নাই। শুধু পশুরাই এরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে। শারীরিক বলে উন্মত্ত সৈনিক দোকান লুট এবং স্ত্রীলোকদের

প্রতি আক্রমণ করিতেও লজ্জিত হয় না। যুদ্ধকালে রাষ্ট্র-পরিচালকগণ এই সকল অত্যাচার থামাইতে পারেন না। সৈন্যদল তাহাদের মূখ্য উদ্দেশ্য—দেশরক্ষা—সাধন করে বটে; কিন্তু তাহাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতি অন্যায় কার্যগুলি রাষ্ট্রনায়কেরা দেখিয়াও দেখেন না। যখন কোন জাতি সমগ্র-ভাবে সমরলিপ্সায় মত্ত হইয়া পড়ে তখন সামরিক জীবনের রীতিনীতি সেই জাতির সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। সেই-জন্যই সৈনিকদের এইরূপ বর্বররোচিত ব্যবহার নিন্দনীয় হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সেইরূপ অবস্থায় নামিতে বহু পুরুষ অতীত হইয়া যাইবে।

সেইজন্য জনৈকা ভগিনীর প্রেরিত নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি আসিয়া পড়ে ঃ—

"(১) কোন সৈনিক নারীর প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে বলা যায় কি না?

(২) সমাজ এই প্রকারে ধর্ষিতা নারীকে দণ্ডিত বা সমাজবহির্ভূত করিবে কি না?

(৩) এরূপ অবস্থায় নারীগণ এবং জনসাধারণ কি করিতে পারে?"

যদিও সেই নারী প্রকৃতপক্ষে তাহার সতীত্ব হারাইয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে কোনরূপে দণ্ডিত বা সমাজচ্যুত করা যায় না। সে আমাদের সহানুভূতির যোগ্য, কারণ তাহার প্রতি নির্দয়-ভাবে অত্যাচার করা হইয়াছে। আমরা কোন আহত ব্যক্তিকে যেরূপভাবে সেবা করি, সেই নারীর বেদনাও আমরা সেইভাবে দূর করিব।

কেবল যখন কোন নারী স্বেচ্ছায় আপন সতীত্ব নষ্ট হইতে দেয়, সে, নিন্দার যোগ্য। কোন ক্ষেত্রেই ব্যভিচার এবং বলাৎকার একপর্যায়ভুক্ত নহে। এইভাবে বিচার করিলে আমরা এই সকল অত্যাচারের কাহিনী, সমাজে পূর্বে যেমন গোপন রাখা হইত তেমন গোপন না করিয়া সমাজের গোচরীভূত করিতাম। নারীর প্রতি পুরুষের এইরূপ দুর্ব্যবহারের প্রতিকূলে এইভাবেই জনমত গঠিত হইত এবং তাহার শক্তি এই সকল অত্যাচার প্রতিরোধ করিত।

যদি সংবাদপত্রে ক্রমাগত আন্দোলন চালানো যায় তবে সাদা কিংবা কালো সকল সৈনিকই এইরূপ আচরণ করিতে বিরত হইবে। তাহাদের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ এইরূপ অন্যায় আচরণ থামাইতে বাধ্য হইবেন।

নারীদিগের প্রতি আমার উপদেশ এই—তাহারা শহর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে যাউক ; সেখানে সেবার বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাহাদের জন্য রহিয়াছে। গ্রামে তাহাদের উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। তাহারা সহজ জীবন যাপন করিবে এবং গরীবদের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। যদি তাহারা রেশমী শাড়ী এবং সাটিনে সজ্জিত হইয়া এবং বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া তাহাদের ধনের গর্ব প্রদর্শন করে তাহা হইলে এক বিপদ এড়াইতে গিয়া তাহারা দ্বিগুণ বিপদের সম্মুখীন হইবে। অবশ্য যাহারা কর্তব্যানুরোধে শহরে বাস করিতে বাধ্য, এই উপদেশ তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

কিভাবে সকল ভয় হইতে নির্মুক্ত হওয়া যায় তাহার বিষয় জানিয়া রাখা নারীদের প্রধান কর্তব্য। আমার দৃঢ় মত এই, যে নারী নির্ভীক এবং যাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে তাহার পবিত্রতা তাহার আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বর্মাচ্ছাদন, সে কখনও ধর্ষিত হইতে পারে না। সেই মানুষ যতবড় পশুপ্রকৃতিরই হউক না কেন, তাহার পবিত্রতার জলন্ত শিখার সম্মুখে সে লজ্জায় মাথা নোয়াইবে। বর্তমান যুগেও নারীগণ নিজদিগকে এইরূপে রক্ষা করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লিখিতে লিখিতে আমার দুইটি ঘটনার বিষয় মনে পড়িল। কাজেই যে সকল নারী এই প্রবন্ধ পাঠ করিবে তাহাদিগকে এই সৎসাহস অনুশীলন করিতে বলিব। আক্রমণের চিন্তাতেই আজ তাহারা ভয়ে কাঁপিতে থাকে। এই ভাবটি দূর করিতে পারিলেই তাহারা নির্ভীক হইবে। সাহসের পরীক্ষার জন্য নারীর পক্ষে কোন তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্য নাই। এই সকল ঘটনার অভিজ্ঞতা ভগবানের কৃপায় সৌভাগ্যক্রমে লক্ষের বা হাজারের সম্মুখেও আসে না। সৈনিকমাত্রই পশু নয়। তাহাদের অতি অল্প-সংখ্যকই শ্লীলতার জ্ঞান একেবারে ভুলিয়া যায়। সর্পজাতির মাত্র শতকরা কুড়িভাগ বিষাক্ত এবং ইহাদের কতগুলি শুধু কামড়ায়। পদদলিত না হইলে ইহারা আক্রমণও করে না। যাহারা ভীতু এবং সাপ দেখিলেই কাঁপিতে থাকে, এই জ্ঞান তাহাদের কোন উপকারে আসে না। পিতামাতাগণ এবং পতি ও অভিভাবকবর্গ নারীদিগকে কি ভাবে নির্ভীক হইতে হয় সেই কৌশল শিক্ষা দিবেন। ভগবানে জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকিলে ইহা

শিক্ষা করা যায়। তিনি অদৃশ্য হইয়াও সকলের রক্ষক— সর্ব কালে এবং সর্ব অবস্থায়—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস যাহার আছে সে সকলের চেয়ে নির্ভীক।

একদিনে এইরূপ বিশ্বাস বা সাহস অর্জন করা যায় না। ইতোমধ্যে আমাদের অন্য উপায়ও উদ্ভাবন করিতে হইবে। যখন কোন নারীর উপর আক্রমণ হয় তখন হিংসা-অহিংসার বিচারে তাহার আবশ্যক নাই। তাহার একমাত্র কর্তব্য আত্মরক্ষা। তাহার নিজ ধর্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার মনে যে কোন উপায় বা প্রণালী উদিত হয়, সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে। ভগবান তাহাকে নখ এবং দাঁত দিয়াছেন। সে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেগুলির ব্যবহার করিবে এবং আবশ্যক হইলে এই চেষ্টায় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিবে। যে পুরুষ বা নারী মৃত্যুর ভয় দূর করিতে পারিয়াছে সে শুধু নিজেকে নয়, অন্যকেও নিজের জীবন দিয়া রক্ষা করিতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা মৃত্যুকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করি এবং সেইজন্য আমরা শেষ পর্যন্ত প্রবলতর শারীরিক শক্তির নিকট পরাভূত হই। কেহ আক্রমণকারীর নিকট নতজানু হইবে, কেহ তাহাকে ঘুষ দিতে চাহিবে, কেহ মাটিতে শুইয়া হামাগুড়ি দিবে অথবা অন্যান্য লাঞ্ছনা বরণ করিতে স্বীকৃত হইবে এবং কোন কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করিয়া এমনকি নিজের দেহই বিলাইয়া দিবে; আমি কূট সমালোচনার মনোভাব লইয়া ইহা লিখিতেছি না। আমি শুধু মানবপ্রকৃতির উদাহরণ দিতেছি। আমরা মাটির উপর শুইয়া হামাগুড়িই

দিই বা পুরুষের কামনা পূরণের জন্য নারী নিজকে সমর্পণই করুক—ইহা আমাদের কোনমতে প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছাই সূচিত করে এবং জীবনের প্রতি এই আসক্তিই আমাদিগকে যে কোনপ্রকার গ্লানিকর লাঞ্ছনা সহ্য করিবার প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। কাজেই যে নিজের জীবন হারাইয়া ফেলে, সেই প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া থাকে (সত্যের জন্য, আত্মসম্মানের জন্য ত্যাগের মন্ত্রে যে জীবন উৎসর্গীকৃত হয় সেই জীবনই অমরতা লাভ করে)। * "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। জগতের সবই তিনি, এই উপলব্ধিতে ভোগবাঞ্ছা পূর্ণ কর অথবা তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ কর। প্রত্যেক পাঠক এই অতুলনীয় মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিবেন। শুধু মুখে বলিলেই ইহার সার্থকতা হইবে না। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে ইহা যেন গভীরভাবে প্রবেশ করে। জাবন উপভোগ করিতে হইলে জীবনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সত্য আমাদের প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত থাকা চাই।

নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিলাম। কিন্তু যে পুরুষ এইরূপ অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা? ইহার উত্তর পূর্বের কথার ভিতরই রহিয়াছে। তিনি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হইতে পারিবেন না। সেই নারীকে তাঁহার রক্ষা করিতেই হইবে। তিনি পুলিশের সাহায্যের জন্য দৌড়াইবেন না; গাড়ীতে বিপদসূচক শিকল টানিয়াই তুষ্ট থাকিতে

* বাইবেল

ঈশোপনিষৎ, ১ম মন্ত্রাংশ

পারিবেন না। যদি তিনি অহিংস-নীতি পালনে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তিনি নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়া সেই বিপন্না নারীকে রক্ষা করিবেন। যদি অহিংস-নীতিতে তাঁহার আস্থা না থাকে অথবা সেই নীতির ব্যবহার তিনি না জানেন, তাহা হইলে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করিয়া সেই নারীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আমি অথর্ব এবং দন্তহীন বৃদ্ধ; আমি যদি অহিংস-নীতি প্রচার করি এবং কোন ভগিনীর উপর অত্যাচারের নিরুপায় সাক্ষিমাত্র হই, তবে আমার তথাকথিত মহাত্মাগিরি উপহাসের এবং অপমানের বিষয় হইবে এবং তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইবে। যদি আমি বা আমার মত সকলে মাঝে পড়িয়া আমাদের জীবন অহিংসভাবেই হউক বা হিংসভাবেই হউক বিসর্জন দিই, আমরা নিশ্চয়ই সেই বিপন্নাকে রক্ষা করিতে পারিব; আর যদি তাহা না পারি, তবুও জীবিত অবস্থায় তাহার অত্যাচারের সাক্ষী আমরা হইব না।

প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য এই বলা হইল। যদি এই সৎসাহসের ভাব আমাদের দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং যদি ইহা সকলের বিদিত থাকে যে কোন ভারতবাসী নারীর উপর অত্যাচার সহ্য করা হইবে না, আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, কোন সৈনিকই আর নারীদিগকে স্পর্শ করিতেও সাহস করিবে না। এইরূপ ভাব যে আজ নাই, ইহা আমাদের লজ্জার বিষয়।

যদি এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য লোক প্রস্তুত হইতে থাকে, তবেও কিছু করা হইতেছে মনে করিব।

গবর্নমেন্টের নিকট যাঁহাদের প্রতিপত্তি আছে তাঁহারা চেষ্টা করিবেন যেন উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেন। কিন্তু আত্মনির্ভরতাই সবচেয়ে বড় সহায়। বর্তমান অবস্থায় আমাদিগকে শুধু ভগবানের দয়া এবং আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

রেলগাড়ীতে ওয়ার্দার পথে, ১৯-২-৪২

[হরিজন, ১-৩-'৪২]

৯২

নারীগণ

প্রশ্ন। আপনি অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহরের নারীদিগকে গ্রামে যাইতে উপদেশ দিয়াছেন; আমাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন সাহসের সহিত এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইবে না, ইহা কি আপনি মনে করেন? বস্তুতঃ যদি সর্বদাই নারীদিগকে বিপদের সম্মুখীন হইতে না দিয়া দূরে রাখা হয় তবে তাহারা সাহসী বা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। যদি সাহস দেখাইয়া একজনও মৃত্যু বরণ করে, তাহাতে কি নারীদের সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধানের সহায়তা করিবে না? এই আশঙ্কা হয় যে আমাদের বালিকাদের

পিতামাতাগণ তাহাদিগকে বর্তমানে আবার ঠেলিয়া পর্দার আড়ালে নিতেছেন।

উত্তর। অবশ্য যাহাদিগকে শহরে থাকিতেই হইবে তাহারা, যাহাই ঘটুক না কেন, নিশ্চয়ই থাকিবে এবং সররকম বিপদের সম্মুখান হইবে। তবে বাহাদুরী দেখাইয়া কিছু করিতে নাই। গ্রামে পর্দার কোন বালাই নাই। এই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র গোলকটি নিয়া দুই দলে ফুটবল খেলিতে শুরু করিয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই থাক না কেন, সব স্থানেই সকলকে প্রাণপণে কাজ করিতেই হইবে এবং বিপদের সম্মুখীনও হইতে হইবে। পর্দার দিন চিরতরে চলিয়া গিয়াছে।

সেবাগ্রাম, ২-৩-'৪২

[হরিজন, ৮-৩-'৪২]

৯৩

যমনালালজী এবং নারীগণ

[ওয়ার্দা মহিলা-আশ্রমে প্রদত্ত অভিভাষণ হইতে]

বিশেষতঃ মহিলা-আশ্রমের সভ্যগণ তাঁহার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সেই ঋণ কি ভাবে তাহারা শোধ করিতে চায়? বৃথা অশ্রুজল ফেলিয়া লাভ নাই। সেবাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতর্পণ। আত্মার মৃত্যু নাই; শুধু দেহেরই বিনাশ হয়। যমনালালজীর ন্যায় সকলেই মানুষের হৃদয়ে

চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিবে না। ওয়ার্দাকে আদর্শ নগরে পরিণত করিবার জন্য মহিলা-আশ্রমের ছাত্রীগণ এবং পরিচালকগণ তাহাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিবে। শহর পরিষ্কার কর, অস্পৃশ্যতা দূর কর, খাদির মন্ত্র প্রচার কর, মূর্খতা দূর কর এবং নারীদিগের সেবা কর। তারপর তোমরা সকলেই গো-সেবাসঙ্ঘের সভ্য হইতে পার এবং আরও সভ্যসংগ্রহে সহায়তা করিতে পার। প্রতিজ্ঞাপালন খুব কঠিন নয় এবং যদি গো-মাতাকে তোমরা ভালবাস তবে স্বেচ্ছায়ই এই প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করিবে। সর্বশেষে উর্দু ভাষা রহিয়াছে—তাহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। তোমাদের প্রত্যেককে উর্দু অক্ষরের পরিচয় শিক্ষা করিতে হইবে। হিন্দি এবং উর্দুর সংমিশ্রণে আমার স্বপ্নের সুন্দর হিন্দুস্থানী ভাষা। যাহারা এই উভয় ভাষাতেই অভিজ্ঞ হইবে, সময়ে তাহারাই হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি করিবে যাহা একদিন ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইয়া উঠিবে।

যমনালালজী নারীকর্মী গঠন করিবার জন্য মহিলা-আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্ততঃপক্ষে তোমাদের প্রত্যেককে তাঁহার মত সেবার মনোবৃত্তি অর্জন করিতে হইবে। এবং বিস্তৃত জীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিবার সময় এই মনোবৃত্তিকে তোমাদের বর্মস্বরূপ সঙ্গে লইবে। তোমাদের অনেকেই বিবাহ করিবে। ইহা স্বাভাবিক ; আমি যমনালালজীকে পরিহাস করিয়া বলিতাম যে সর্বদাই ঘটকালি করিয়া তিনি বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং "বিবাহের রেজিস্ট্রার" উপাধি তাঁহারই উপযুক্ত। আমাদের অনেক বালিকা অবিবাহিতা থাকিয়া তাহাদের চেয়ে কম

সৌভাগ্যশালী ভগিনীদের সেবা করুক, এই বিষয়ে আমাপেক্ষা তিনি কম উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু এইরূপ নারী বিরল। যাহা হউক, আমি চাই তোমরা সেবা করিয়া যাইবে এবং বিবাহ করিলে তোমরা দুইজন হইবে এবং তখন চতুর্গুণ সেবা করিবে। বিবাহিত জীবন ইন্দ্রিয়পরিচর্যার জন্য না হইয়া যদি প্রকৃতপথে সদ্ভাবে যাপিত হয় তবে দেখা যাইবে অনেক বিষয়ে তাহা ব্রহ্মচর্য হইতেও কঠোর।

যমনালালজীর মত লোক সচরাচর দেখা যায় না। সেবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি আজীবন সকলেরই সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দোমনাভাবে কোন কাজই করিতেন না। তাঁহার শ্রমশীলতা ছিল বিস্ময়কর। তাঁহার দুগ্ধবতী গাভীকে তিনি স্বয়ং পরিচর্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাজ এতই পরিপাটি হইত। আমরা যেমন ভাবিতাম, কাজের মধ্যে থাকিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকে তাঁহাকে প্রত্যেক বিষয়ে অনুকরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যিনি তোমাদের জন্য এত করিয়াছেন তাঁহাকে যদি তোমরা প্রকৃতই ভালবাসিয়া থাক তবে তাঁহার জীবন হইতে একটি শিক্ষা গ্রহণ করিবে। প্রাণপণে কাজ করিয়া যাও এবং নারীজাতির যে সকল উচ্চ আদর্শ তিনি তোমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন সেই সকল কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিজেদের জীবন নিঃশেষে উৎসর্গ কর।

[হরিজন, ১৫-৩-'৪২]

দাম্পত্য জীবন

একটি নিপুণা ভগিনী-কর্মী সুচারুরূপে দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য কুমারী জীবন যাপনের সংকল্প করিয়া, পরে তাঁহার মনোমত সঙ্গী পাইয়া সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন। এখন তাঁহার মনে হইতেছে, কাজটা ভাল করেন নাই এবং তাঁহার জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়াছেন। এই ভ্রান্তি আমি তাঁহার মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেবার জন্য মেয়েদের অনূঢ়া থাকা অতি ভাল কথা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ মেয়ে লক্ষের মধ্যেও একজন পাওয়া যায় না। বিবাহ জীবনের একটি স্বাভাবিক অবস্থা এবং কোনভাবে ইহাকে হেয়মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। যখন কেহ কোন কাজকে অধঃ-পতন বলিয়া মনে করে, যতই চেষ্টা করুক না কেন তাহার পক্ষে সেই ধারণা দূর করা অত্যন্ত কঠিন। বিবাহকে একটি ধর্মানুগত সংস্কার মনে করিয়া দাম্পত্য জীবন আত্মসংযমশীল হইয়া যাপন করাই বিবাহের প্রকৃত আদর্শ। হিন্দুধর্মে বিবাহ চারটি আশ্রমের অন্যতম। অন্য তিনটি ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান যুগে বিবাহ কেবল শারীরিক সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্য তিনটি আশ্রমের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়।

উক্ত ভগিনী এবং যাঁহাদের চিন্তার ধারা তাঁহার মত, তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে বিবাহকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া উহা ধর্ম-

জীবনের একটি অঙ্গ হিসাবে দেখিয়া বিবাহের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া। তাঁহারা উপযুক্ত আত্মসংযম অভ্যাস করিলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের সেবার শক্তি বহুপরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। সেবাই যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি স্বভাবতঃই তদ্রূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন জীবনসঙ্গী বাছিয়া লইবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের যুক্ত সেবা হইবে দেশের বিশেষ লাভ।

ইহা গভীর দুঃখের বিষয় যে, সাধারণতঃ আমাদের বালিকাদিগকে মাতৃত্বের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। যদি বিবাহিত জীবন ধর্মানুমোদিত কর্তব্য হয় তবে মাতৃত্বও নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে। আদর্শমাতা হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া সন্তানপ্রজননে অগ্রসর হইতে হইবে। গর্ভসঞ্চারের মুহূর্ত হইতে সন্তানের জন্মকাল পর্যন্ত তাঁহার কর্তব্য কি তাহা মাতাকে জানিতে হইবে। যিনি বুদ্ধিমান, সুস্থ এবং সুশিক্ষিত সন্তান দেশকে উপহার দেন, তিনি নিশ্চয়ই দেশের সেবা করিতেছেন। এই সন্তানগণ যখন বড় হইবে, তাহারাও সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। প্রকৃত কথা এই, যাঁহারা সেবার মনোবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত, জীবনে তাঁহারা যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহারা সর্বদাই সেবা করিয়া যাইবেন। সেবার কার্য ব্যাহত করে এমন ভাবের জীবন তাঁহারা কখনই যাপন করিবেন না।

সেবাগ্রাম, ৩-৩-'৪২

[হরিজন, ২২-৩-'৪২]

ইন্দিরা নেহরুর বিবাহসম্বন্ধ

ফিরোজ গান্ধীর সহিত ইন্দিরার বিবাহসম্বন্ধ বিষয়ে কয়েকখানা ক্রুদ্ধ এবং অসংযত ভাষায় লিখিত নিন্দাপূর্ণ চিঠি পাইয়াছি এবং আর কয়েকখানাতে যুক্তিরও অবতারণা করা হইয়াছে। সজ্জন হিসাবে ফিরোজ গান্ধীর বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তাঁহাদের মতে তাহার একমাত্র অপরাধ যে সে জাতিতে পার্শী। বিবাহের জন্য দুই পক্ষের কেহ ধর্ম পরিবর্তন করিবে, আমি সর্বদাই এই মতের ঘোর বিরোধী ছিলাম এবং বর্তমানেও আছি। ধর্ম এমন জিনিস নয় যে ইচ্ছা করিলেই পোশাকের মত তাহা ত্যাগ করা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে ধর্ম-পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন উঠে নাই। ফিরোজ গান্ধী বহু বৎসর ধরিয়া নেহরু পরিবারের একজনরূপে বিবেচিত ছিল। কমলা নেহরুর পীড়ার সময় সে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে। তিনি তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ইউরোপে ইন্দিরার পীড়ার সময় সে তাহার যথেষ্ট পরিচর্যা করিয়াছে। স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। এই বন্ধুত্ব সম্পূর্ণরূপে অনিন্দ্য ছিল। ইহা ক্রমে পরস্পরের প্রীতি-ভালবাসায় পরিণতি লাভ করে। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর অনুমতি এবং আশীর্বাদ ব্যতীত কোন বিবাহের বিষয় চিন্তাতেই আসিতে পারিত না। উভয়ের এই ভালবাসা যথার্থ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার পর তিনি সম্মতি দিয়াছেন। নেহরু পরিবারের সহিত

আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় সকলেই জানেন। উভয় পক্ষের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। এই বিবাহে অমত করিলে নির্মমতার কাজ হইত। সময়ের অগ্রগতিতে এইরূপ সম্বন্ধ ক্রমশঃ নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে সমাজেরও উপকার হইবে। বর্তমানে সমাজ এমন অবস্থায় আসে নাই যেখানে পরস্পর পরস্পরের বিভিন্ন মতের প্রতি সম্পূর্ণ উদারতা পোষণ করিতে পারে। কিন্তু এই উদারতা যখন এক ধর্ম অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইবে, এইরূপ বিবাহ লোকে বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। সে ধর্ম সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ যাহা বিচারসহ নহে। অদূর ভবিষ্যতে সমাজের পুনর্গঠনের পর তেমন ধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে না। কারণ তখন সামাজিক প্রথাদির মর্যাদার মান পরিবর্তিত হইবে। তখন গুণের বিচার হইবে ধন, উপাধি, আভিজাত্য দ্বারা নহে, শুধু চরিত্রের উৎকর্ষ দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হইবে। আমি হিন্দুধর্ম সমন্ধে যে ধারণা পোষণ করি তাহা কোন সংকীর্ণ মতবাদ নয়। ইহা সামাজিক ক্রমোন্নতির একটি অপূর্ব সনাতন ধারা। জরওয়াস্টার, মোজেজ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক এবং অন্যান্য যে সকল ধর্মগুরুর নাম করিতে পারি তাঁহাদের শিক্ষা ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহার সংজ্ঞা এইরূপে দেওয়া হইয়াছে—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত॥

উহাকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া জানিবে যাহা জ্ঞানিগণ এবং সন্তজন

২২

এবং সর্বদা রাগদ্বেষবর্জিত মহাত্মাগণ মানিয়া চলেন এবং যাহা হৃদয়ে অনুরাগের উদ্রেক করে।

যদি ইহা সেরূপ না হয়, ইহার ধ্বংস নিশ্চিত।

যাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন তাঁহাদিগকে উত্তর না দেওয়ার অপরাধ তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি তাঁহাদিগকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আগামী বিবাহে আশীর্বাদ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের চিঠি হইতে অজ্ঞানতা, পরমতসহনে অনুদারতা এবং স্বকীয় পূর্বসংস্কারপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে। এই সকলও একপ্রকার অস্পৃশ্যতার পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং ভীতিজনক; কারণ সেগুলির কোন শ্রেণীবিভাগ করা সহজ নয়।

[হরিজন, ৮-৩-'৪২]

৯৬

বালক-বালিকাদের সম্বন্ধে

প্রশ্ন। সমাজ যতই অগ্রসর হইবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং আদরণীয় হইবে, এই বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের ধর্মপরিত্যাগ করার আবশ্যকতা নাই, এই যুক্তিও ঠিক। কিন্তু সন্তানদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তাহারা পিতামাতার মধ্যে কাহার ধর্মানুযায়ী শিক্ষালাভ করিবে এবং লালিত-পালিত হইবে?

উত্তর। এই শ্রেণীর বিবাহে অনুমান করিয়া নেওয়া যায় যে পিতামাতা একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করিবে। যদি তাঁহারা ধর্মপ্রাণ হন, সন্তানগণ অজ্ঞাতসারেই যাহা ভাল মনে করে তাহাই গ্রহণ করিবে এবং পিতামাতা হইতে কোন বাধা না পাইয়া নিজেদের ধর্ম নিজেরা বাছিয়া লইবে। যদি পিতামাতা ধর্মবিষয়ে উদাসীন হন তাহা হইলে সম্ভবতঃ সন্তানগণও উদাসীন হইবে এবং যে কোন প্রকারে নিজেদের পরিচয় দিবে। এইরূপ বিবাহে আমি এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। পিতামাতার মধ্যে সন্তানদের শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ হইলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

[হরিজন, ২৯-৩-'৪২]

৯৭

অনুগ্রহপ্রার্থী হইও না

প্রশ্ন। নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকসংখ্যায় নারী প্রতিনিধি মনোনীত করিতে কংগ্রেস অনিচ্ছুক। বিভিন্ন মণ্ডলীতে আরো অধিকসংখ্যক নারী নির্বাচিত করা নিশ্চয়ই উচিত এবং আবশ্যক। এই প্রশ্নের মীমাংসা কি ভাবে করিবেন?

উত্তর। এই সকল বিষয়ে সমানুপাত বা অন্য কোন হারাহারি অনুপাতের জন্য আমার কোন মোহ নাই। যোগ্যতাই

একমাত্র বিবেচ্য। আমরা দেখিতে পাই যে নারীকে ছোট করিয়া দেখা পুরুষের একটা অভ্যাসে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমান যোগ্যতা থাকিলে পুরুষকে মনোনীত না করিয়া নারীকে মনোনীত করিলে বিপরীত প্রথায় গিয়া পড়িতে হয়; এইক্ষেত্রে এমনও হইতে পারে যে নারীগণ পুরুষের স্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিবে। শুধু পুরুষ কি নারী, ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সত্য নির্বাচন করিতে জেদ করিলে ব্যাপার হইবে আরো গুরুতর। নারীগণের, এমনকি যে কোন মণ্ডলীর পক্ষে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা ঘৃণিত বলিয়া মনে করা উচিত। তাহারা অনুগ্রহ যাচ্ঞা না করিয়া ন্যায়বিচারের দাবী করিবে। কাজেই নারী এবং পুরুষ সকলের পক্ষেই উপযুক্ত কাজ হইবে প্রাদেশিক মাতৃভাষায় নিজেদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা; ইংরেজী বা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা নহে, সাধারণভাবে এইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যদ্দারা তাহারা নাগরিকদের অসংখ্য কর্তব্য পালনে অবহিত এবং যোগ্য হইতে পারে। পুরুষ যদি এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারে অগ্রণী হয়, ইহা নারীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না হইয়া তাহাদের প্রতি বিলম্বিত ন্যায়বিচারই হইবে।

উরুলীকাঞ্চন
প্রশ্নের বাক্স হইতে, ৩০-৩-'৪৬

[হরিজন, ৭-৪-'৪৬]

নারীদিগের সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য

"যথেষ্ট সংখ্যক নারীকে সরকারী চাকুরীর জন্য মনোনীত বা নির্বাচিত করা হয় না—এই অভিযোগের আপনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। আপনি উত্তরে বলিয়াছেন, প্রার্থিগণের মনোনয়নে যোগ্যতাই হইবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। আপনার এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং চিন্তাশীল নারী এবং পুরুষ সকলেই তাহা স্বীকার করিবে। একটা কথা আছে—'বয়স বা স্ত্রীপুরুষ ভেদ শ্রদ্ধার বস্তু নয়, যোগ্যতাই একমাত্র আদরণীয়।' বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি তার বিপরীত। ইহা আপনার অজানিত নয় যে উক্ত নীতিবাক্য বাস্তবক্ষেত্রে পালিত না হইয়া লঙ্ঘিতই হয় বেশী। প্রার্থিনির্বাচনে মন্ত্রিমণ্ডলীতে বা ব্যবস্থাপক সভাতে বা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয় না। বর্ণ, সম্প্রদায় এবং প্রদেশের প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারাই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। এই কার্যের অনুকূলে বলা হয়, এই সব বিশেষ বিশেষ স্বার্থ উপেক্ষা করা যায় না যদি এই যুক্তি সত্য হয় তবে নারীদের স্বার্থের কি হইবে? উক্ত নীতিবাক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্বাচনের মূলনীতিগুলি আরো পরিষ্কারভাবে বলা দরকার।"

—কোন শ্রদ্ধেয়া ভগিনীর চিঠি হইতে উপরের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগিনীর যুক্তি শেষ পর্যন্ত গিয়া এই দাঁড়ায়, যেখানে সব বিষয়ই ভ্রান্তপথে চলিয়াছে, আর একটি ভ্রম সেখানে করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি আমরা এইরূপ করিতে

থাকি তবে অন্যায় বাড়িয়াই চলিবে এবং আমরা নিরুপায়ভাবে একটি কুটিল ধাঁধায় পড়িয়া ঘুরিতে থাকিব। কাজেই নারী-দিগের প্রতি আমার নিবেদন এই, তাঁহারা বুদ্ধিমত্তার সহিত ত্যাগের প্রতিমূর্তিস্বরূপ হইবেন এবং তাহা হইলে শুধু নারীজাতির নয়, সমগ্র জাতিরই তাঁহারা অলঙ্কারস্বরূপ হইবেন এবং নারীসমাজ এবং জাতির মর্যাদাও বাড়াইয়া দিবেন। যতদিন জাতি ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিষয়কে আমরা গুরুত্বপ্রদান করিব এবং সেইমত নির্বাচন পরিচালিত হইবে ততদিন নারীগণ এই সকল হইতে দূরে থাকিবেন এবং ইহাতে তাঁহাদের গৌরব এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে—তাঁহাদের প্রতি আমার এই উপদেশ। প্রশ্ন হইতেছে, ইহা করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কি? আজ অতি অল্পসংখ্যক নারীই রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিতেছেন এবং তাঁহাদের অনেকেই নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন না। তাঁহাদের পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ প্রতি-পালন করিয়াই তাঁহারা নারীর অধিকারের জন্য চিৎকার করিতেছেন। এইরূপ না করিয়া নারীকর্মিগণ নারীদিগকে ভোটদাত্রীর তালিকাভুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদান করিবেন, তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইবেন, জাতিবর্ণগত যে সব শৃঙ্খল তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছে তাহা হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবেন এবং এইভাবে নারীগণের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন ঘটাইবেন যাহা ত্যাগে এবং আত্মোৎসর্গে নারীর শক্তি এবং ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পুরুষকে বাধ্য করিবে এবং নারীকে তাঁহার সম্মানিত আসন

দিতে তাহাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। তাঁহারা এইরূপ করিতে পারিলে বর্তমান সামাজিক অপবিত্র পরিবেশ বিশুদ্ধ করিতে পারিবেন। নারীদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা গেল।

পুরুষের সম্বন্ধে এই বলা যায়, অপবিত্র পরিবেশ হইতে বাহিরে চলিয়া আসা তাহাদের কর্তব্য। জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত সংস্কার তাহাদের মন হইতে নির্বাসিত হইলে এই সকল সংস্কারের দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইবে না। যদি পুরুষ এবং নারী কর্মক্ষেত্রে জয়ী হইতে চায়, তাহাদের উভয়কেই সমাজের নিম্নতম স্তরে হরিজনদের মধ্যে, এমনকি ভাঙ্গি বা মেথরের সমাজে নামিয়া আসিতে হইবে। উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সহজ উপায় এই।

যদি যোগ্য, শক্তিমতী নারীগণ বাদ পড়িয়া যান, পুরুষ তাহার ভ্রম সংশোধন করিবে। নারীগণকে এইরূপ ভাবে উৎসাহিত করা কর্তব্য যেন তাঁহারা গৌরবে পুরুষকে নিষ্প্রভ করিতে পারেন। এই উপদেশমতে উভয় পক্ষ কাজ করিলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পবিত্র ও নির্মল হইয়া উঠিবে। পুরুষ করুক বা না করুক, আমার মতে নারীর কর্তব্য সুস্পষ্ট।

নতন দিল্লী, ১২-৪-'৪৬

[হরিজন, ২১-৪-'৪৬]

বলপূর্বক বিবাহদান

প্রশ্ন। জনৈকা ভগিনী লিখিতেছেন—

যদি কোন মেয়ে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না থাকে এবং তাহার পিতামাতা বিবাহ করিতেই হইবে বলেন, অথবা বিবাহ না করিলে গৃহত্যাগ করিতে বলেন, তবে সেই বালিকার কি করা কর্তব্য? তাহার নিজ জীবিকা উপার্জন করিবার মত শিক্ষা যদি সে না পাইয়া থাকে তবে সে যাইবে কোথায়? সে কাহার আশ্রয় নিবে?

উত্তর। এইরূপ প্রশ্নে মনে বড়ই দুঃখ হয়। জোর করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতামাতার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায় এবং কন্যাদিগকে নিজের জীবিকা উপার্জনের উপযোগী শিক্ষা না দেওয়াও পিতামাতার পক্ষে অন্যায়। বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে কন্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবার অধিকার কোন পিতামাতার নাই। আশা করি এই শ্রেণীর নির্মম উদাহরণ অতীব বিরল। কথিত বালিকার প্রতি আমার উপদেশ এই—স্বহস্তে আবর্জনা পরিষ্কার করা পর্যন্ত কোন পরিশ্রমের কাজই তাহার পক্ষে মর্যাদা-হানিকর বলিয়া সে মনে করিবে না। নারীকে অশ্রয়ের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই। পুরাকালের দ্রৌপদীর ন্যায় তাহাকে নিজের চরিত্রবল, নিজের শক্তি এবং সর্বোপরি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। নূতন দিল্লী, ৬-৯-'৪৬

[হরিজন, ১৫-৯-'৪৬]

নারীর অগ্নিপরীক্ষা

অন্য এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুই বড় বিষয় নয়, কিভাবে মৃত্যুবরণ করা হয় তাহাই মূখ্য।" ভ্রাতার হস্তে জীবন বিসর্জন বিশেষ সৌভাগ্য, যদি সাহসের সহিত মৃত্যুর সম্মুখান হইতে পার। কিন্তু যে সকল নারীকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া নেওয়া হইতেছে এবং জোর করিয়া ধর্ম্মান্তরিত করা হইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কি কর্তব্য? কাহাকেও জোর করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করানো যায়, এই প্রসঙ্গ এ স্থলে অবান্তর। "ভারতের নারীগণ নিজদিগকে এত অসহায় মনে করিবে কেন? সাহস কি শুধু পুরুষেরই একচেটিয়া? ঝান্সীর রাণী অস্ত্রধারণ করিয়া রণকৌশলে তাঁহার সমসাময়িক সকল যোদ্ধা হইতে অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যদিও নারীগণ সাধারণতঃ অস্ত্রধারণ করে না। তথাপি সকলেই ঝান্সীর রাণী হইতে পারে না। কিন্তু সকল নারীই সীতার আদর্শ অনুকরণ করিতে পারে। প্রবল পরাক্রান্ত রাবণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও সাহস পায় নাই। কিন্তু ঝান্সীর রাণীর ন্যায় রমণীগণ পরাভূত হইতে পারে।" তৎপর তিনি আরো বলিলেন, "সীতার দৃষ্টান্ত যেন কেহ শুধু আষাঢ়ে গল্পের বিষয় মনে না করেন" এবং ওলিভ্ ডোকের (Olive Doke) দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তিনি কোন অত্যাচার অবমাননার জন্য ভীত না

হইয়া মধ্য আফ্রিকার নগ্ন আদিম নিগ্রো অধিবাসিগণের নিকট যাইতে এবং তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ভারতের নারীজাতি এইরূপ উচ্চস্তরের সাহসের অনুশীলন করুক, এই তাঁহার ইচ্ছা। সৈন্যগণ ও পুলিশ তাঁহাদিগকে অপহরণ হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাঁহারা অপহৃত হইয়াছেন বা হইতে পারেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কি কর্তব্য? মাথার একটি চুল স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাঁহাদিগকে মৃত্যুবরণ করিবার শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে, নারীর পক্ষে শ্বাসনিরুদ্ধ করিয়া বা জিহ্বা দংশন করিয়া প্রাণনাশ করা সম্ভবপর।

ধর্ষণের পূর্বে মৃত্যুবরণ

পরের দিন সন্ধ্যায় গান্ধীজীকে উল্লিখিত কৌশল সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। ডাক্তার সুশীলা নায়ার তাঁহার বক্তৃতা পূর্বদিন শুনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, নিজে নিজে শ্বাসরোধ করিয়া বা জিহ্বাদংশন করিয়া কেহ মরিতে পারে না। গান্ধীজীকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পরের দিন সকালে দেখিতে আসেন, তিনিও ডাক্তার সুশীলা নায়ারের মত সমর্থন করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে জানা যায়, সদ্য আত্মহত্যার একমাত্র উপায় একদাগ উগ্র বিষপান। গান্ধীজী অতঃপর বলেন, যদি তাহাই হয় তবে যাহারা বিপন্ন, ধর্ষিত হইবার পূর্বেই তাহারা বিষপান করিবে। যাহারা যোগশাস্ত্রের প্রক্রিয়াসকল জানে তাহাদের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে, এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা জীবন-

নাশ করা যায়। তিনি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। এই বিষয়ে তাঁহার মত শুধু একটি ভাবমাত্রই নয়। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি কার্যে পরিণত করাইতে চান। ধর্ষিত না হইবার পূর্বে নিজের মৃত্যুর জন্য সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলেই বাধাপ্রধান করিবার সাহস জন্মিবে। আমাদের দেশের নারীগণ এই শিক্ষাই পাইয়াছে যে, স্বামীর সাহচর্যে থাকিতে পারিলেই অথবা স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিতে পারিলেই তাহার মঙ্গল। বক্তা ইহা বলিয়াছেন যে, তিনি দেখিতে চান ভারতের নারীগণ নিজদিগকে নিরুপায় মনে না করিয়া বরং অস্ত্রচালনা বিদ্যা শিক্ষা করে। ছুরিকা এবং রিভলবার সঙ্গে রাখিবার অভ্যাস নারীদের ভিতর বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু তিনি ইহা জানেন যে প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে মান-ইজ্জৎ রক্ষা করিতে হইলে অস্ত্রের ব্যবহার নগণ্য প্রতিষেধক বলিয়াই বিবেচিত হয়। অস্ত্র আত্মশক্তির পরিচয় না দিয়া নিজের দুর্বলতাই প্রতিপন্ন করে। অস্ত্র কাড়িয়া লইলে আত্মসমর্পণ ছাড়া সাধারণতঃ আর কোন উপায় থাকে না।

প্যারীলালের সাপ্তাহিক পত্র হইতে

[হরিজন, ২৭-১০-'৪৬]

অপহৃতা বালিকাগণ

প্রশ্ন। বলপূর্বক যে সকল বালিকাকে হরণ করা হইয়াছে এবং যাহাদের নিজের কোন দোষ নাই তাহাদের প্রতি আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের কোনরূপ দণ্ডবিধান করিতে গেলে সমাজের পক্ষে অন্যায় হইবে ; এই বিষয়ে আরও একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক মনে হয়। এইরূপ অত্যাচারিত ও বিড়ম্বিত মেয়েদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি জোর করিয়া তথাকথিত কোনরূপ বিবাহ করিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহা দ্বারা কি তাহারা কোনরূপে বাধ্য হইবে ? উদারতার পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করা কি সমাজ এবং পরিবারের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইবে না ? যে সকল অনূঢ়া মেয়েকে অপহরণ করা হইয়াছে বা এইরূপ কোন মিথ্যা বিবাহক্রিয়াতে লিপ্ত হইতে বাধ্য করা হইয়াছে তাহাদিগকে শুধু উদ্ধার করা নয়, স্বাভাবিকভাবে তাহাদিগের বিবাহকার্যে সহায়তা করার জন্য সমাজ কি বিশেষ চেষ্টা করিবে না ? ইহা করিতে পারিলে তাহাদিগেরও মানসম্ভ্রম রক্ষা হইবে এবং তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে ফিরিয়া আসিতে কোন বাধা হইবে না।

উত্তর। আপনার উক্তি সত্য। আমার যে সকল মন্তব্যের বিষয় আপনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে আপনার উল্লিখিত সবগুলি বিষয়ই অনুমিত হয়। আমার কোন সন্দেহ নাই যে,

অপহৃতা বালিকাগণ কোন অপরাধে অপরাধী নহে অথবা কোনরূপে নিন্দার্হ হয় নাই। প্রত্যেক বিবেচক লোকের সহানুভূতি এবং প্রকৃত সহায়তা তাহারা পাইবার যোগ্য। স্নেহ ও আদরের সহিত তাহাদিগকে নিজ নিজ ঘরে ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং বিনা আয়াসে যাহাতে তাহারা উপযুক্তরূপে বিবাহিত হইতে পারে তাহা করিতে হইবে।

নূতন দিল্লী, ২৪-১০-'৪৬

[হরিজন, ৩-১১-'৪৬]

১০২

নির্ভীক হও

আমাদের নারীগণ সহজেই ভয়ে পলায়ন করিল। সমগ্র জগতেই এইরূপ ঘটিয়াছে—কম আর বেশী। আমাদের নারীগণ সাহসী হউক, ইহাই গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন। নিজদিগকে ধর্ষিত হইতে না দিয়া আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ—তাঁহার এই বাণী সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে নারীগণ আত্মরক্ষার জন্য ছুরিকা সঙ্গে রাখিতে পারেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের জোর বা সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইলে ছুরিকা কোন উপকারেই আসিবে না। এইরূপে লাঞ্ছিত বা ধর্ষিত হইবার পূর্বে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার উপদেশ তিনি দিয়াছেন। সর্বদা বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিলেই

সাহসী হওয়া যায়। মৃত্যুয় ভয় যে নারীর নাই তাহাকে কেহ অত্যাচার করিতে পারে না। তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় দুইটি—অপরকে মারিয়া নিজেও মরা অথবা প্রতিপক্ষকে না মারিয়া নিজে মরা। শেষের বিষয়টিই তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিতেন, অপরটি নহে। সর্বোপরি তাহারা সাহসী হউক এই তিনি চাহিতেন। কাপুরুষতার ন্যায় পাপ নাই।

প্যারীলালের সাপ্তাহিক পত্র হইতে

[হরিজন, ৩-১১-'৪৬]

১০৩

নারীদের প্রতি উপদেশ

চণ্ডীপুর (চাঁদপুর ?) বাসাবাড়ীর প্রাঙ্গণে সমবেত নারী-গণকে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন যে, নারীগণ ভগবানের উপর নির্ভর করিবেন এবং অন্যের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখিবেন। তাঁহাদের 'আরও সাহসী হওয়া এবং আত্মশক্তিতে আরও বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। যদি তাঁহারা ভীত হন তাহা হইলে দুর্বৃত্তগণ সহজেই তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আসিবে।

ভারতবর্ষের নারীগণ "অবলা" নন। অতীতের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যের জন্য তাঁহারা বিখ্যাত। সেই সকল কাজ তাঁহারা

অস্ত্রের সহায়তায় করেন নাই, করিয়াছিলেন কেবল নিজ চরিত্র-বলে। আজও জাতিকে তাঁহারা নানা উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহারা অনেক ফলপ্রসূ কাজ করিতে পারেন, যদ্দারা নিজে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই, পরন্তু জাতীয় প্রগতিরও বিশেষ সহায়তা হইবে। তদ্দারা দেশেরও ইপ্সিত উদ্দেশ্যলাভ বিলম্বিত হইবে না।

গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার জন্য নোয়াখালীর কেবল পুরুষেরাই দায়ী নহেন, নারীগণও সমানভাবে দায়ী। তিনি তাঁহাদের সকলকেই ভয়শূন্য হইতে বলেন এবং অতীতের গৌরবময়ী সীতা এবং দ্রৌপদীর মত ভগবানে স্থির বিশ্বাস রাখিতে বলেন।

তিনি আরো বলিয়াছিলেন, অস্পৃশ্যতা দূর কর। যদি এইভাবে অস্পৃশ্যদিগকে তাঁহারা অস্বীকার করিয়া বর্জন করিতে থাকেন তবে তাঁহাদের কপালে আরো দুঃখ আছে। শ্রোত্রী-মণ্ডলীকে তিনি প্রত্যহ একজন হরিজনকে তাঁহাদের সঙ্গে আহারে নিমন্ত্রণ করিতে বলেন। যদি তাঁহারা তাহা না করিতে পারেন তবে আহারের পূর্বে একজন হরিজনকে ডাকিয়া তাহাকে পানীয় জল এবং খাদ্য স্পর্শ করিতে বলিবেন। অস্বাভাবিক জাতিভেদ প্রথায় যে বিভিন্নশ্রেণীর লোকের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ করিলে সেই ভেদজ্ঞান ক্রমশঃ মন্দীভূত হইবে। এইভাবে তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিতে পারিলে তাঁহাদিগকে আরও গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

[হরিজন, ২৬-১-'৪৭]

নারীর সমস্যা

প্রশ্ন। দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নারীগণ কী করিবে? পলায়ন করিবে, না, বলপ্রয়োগ করিয়া বাধা দিবে? পলাইবার জন্য নৌকা তৈয়ারী রাখিবে, না, অস্ত্রদ্বারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবে?

উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কোন বলপ্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া আমার মত নয়। অহিংসার জন্যই সকলপ্রকারে প্রস্তুত হইতে হইবে, যদি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরকমের সাহস সঞ্চয় করিতে চাও। কাপুরুষতার চেয়ে বলপ্রয়োগ সর্বদাই শ্রেয়ঃ এবং ভীরুতা বর্জন করিবার জন্য ইহার আশ্রয় নেওয়া যাইতে পারে। কাজেই, বিপদ উপস্থিত হইলে পলাইবার জন্য আমার নৌকা তৈয়ারী রাখার দরকার হইবে না। অহিংস ব্যক্তি আকস্মিক বিপদ কি জানে না। পক্ষান্তরে, সে নীরবে গৌরবের সহিত মৃত্যুবরণে প্রস্তুত থাকে। সেইজন্য কোন অহিংস পুরুষ বা নারী সহায়হীন হইলেও মৃত্যুকে গ্রাহ্য করিবে না। ভগবানই প্রকৃত সহায়। আমি এর বেশী কিছু প্রচার করিতে পারি না এবং যাহা প্রচার করি তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এইরূপ কোন সুযোগ আমার আসিবে কিনা অথবা আমাকে দেওয়া হইবে কিনা তাহা আমি জানি না। যে সকল নারী দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অস্ত্রব্যবহার

ব্যতীত আত্মরক্ষায় অসমর্থ তাহাদিগকে অস্ত্র সঙ্গে রাখিবার উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা নিজেরাই তাহা করিবে। প্রায়ই এই প্রশ্ন করা হয়—অস্ত্র সঙ্গে রাখা উচিত কিনা। এই প্রশ্নের ভিতর কোথাও গোল আছে। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীন হইতে লোকে চেষ্টা করিবে। অহিংসাই প্রকৃত-পক্ষে কার্যকরীভাবে বাধা দিতে সমর্থ—এই মূলনীতি স্মরণ রাখিলে তাহাদের চরিত্র সেইভাবে গঠিত হইবে। পৃথিবীর সকল লোক নিজেদের অজ্ঞাতসারেই উক্ত নীতি মানিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে। অহিংসা হইতে যে সাহস জন্মে তাহার স্থান সকলের উপরে; অস্ত্রাদি বহন করিলে যে সাহস জন্মে তাহা সেইরূপ নয় এবং এই সাহসের ফলে শেষ পর্যন্ত আণবিক বোমার সাহায্যও লইতে হয়। হিংসাবৃত্তি নিষ্ফল। যাহারা আণবিক বোমার নিষ্ফলতাও বুঝিবে না তাহারা স্বভাবতঃই তাহাদের শক্তি অনুসারে অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পর জ্ঞাতসারে এবং প্রতিনিয়ত অহিংস-নীতিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারই ফল আমরা দেখিতেছি।

প্রশ্ন। আত্মসমর্পণ না করিয়া নারীকে নিজের প্রাণনাশ করিতে উপদেশ দেওয়া যায় কি ?

উত্তর। এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। নোয়াখালী যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে দিল্লীতে আমি ইহার উত্তর দিয়াছি। নিশ্চয়ই নারী আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবে। সহজ কথায়, আমার কল্পিত জীবনযাত্রার পথে

আত্মসমর্পণের স্থান নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কি উপায়ে প্রাণত্যাগ করা যায়। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, সে উপায় নির্দেশ করা আমার কাজ নয়। পূর্বোক্ত অবস্থায় আত্মহত্যা সমর্থন করার মূলে রহিয়াছে এই বিশ্বাস যে, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত তাহার বাধা দিবার মানসিক শক্তি এবং সাহস এবং অন্তরের পবিত্রতা এত বেশী যে তদ্দারা সে আক্রমণকারীকে পরাভূত করিতে পারিবে। যুক্তিটিকে আর বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই, কারণ ইহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। ইহা বাস্তব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে এবং আমি স্বীকার করি, সেই প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

প্রশ্ন। নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া অথবা আক্রমণ-কারীকে হত্যা করা, এর মধ্যে কোন্‌টি আপনার মতে শ্রেয়ঃ?

উত্তর। নিজকে হত্যা করা অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা করা, এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটিই যে গ্রহণীয় তাহাতে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পাল্লা, ২৭-১-'৪৭

[হরিজন, ৯-২-'৪৮]

পণপ্রথা বিলোপ এবং বাল্যবিবাহ বর্জন

প্রশ্ন। নমঃশূদ্র বালিকাদের সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়; পূর্বে সাধারণতঃ ৮।৯ বৎসরের সময় হইত। কন্যার জন্য বরকে দেড় শত টাকা পণ দিতে হয়। উভয়ের মধ্যে বয়সে গড়ে ১২ হইতে ১৫ বৎসরের ব্যবধান থাকে। এর ফলে নমঃশূদ্র সমাজে বিধবার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। এই জাতির কোন কোন গোষ্ঠীতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। যাহাদের মধ্যে উহা প্রচলিত নাই তাহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর মনে করায় তাহাদের অনুকরণে অপর শ্রেণী এই প্রথা উঠাইয়া দিতেছে।

বাল্যবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আপনার উপদেশ কি?

উত্তর। ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, এই বিষয়ে তাঁহার মত অতি সুস্পষ্ট। সর্বপ্রথমে বালবিধবা হওয়ার সম্ভাবনা দূর করিতে হইবে। তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী। এই কুপ্রথা নমঃশূদ্রগণ সম্ভবতঃ তথাকথিত উচ্চজাতিদের নিকট হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রহণ করিয়াছে।

গান্ধীজী পণপ্রথারও বিরোধী। ইহা কন্যাবিক্রয় ছাড়া আর কিছু নহে। নমঃশূদ্রদের মধ্যেও আবার জাতিবিভাগ আছে। ইহা দুঃখের বিষয়। তাহাদিগকে সর্বপ্রকার জাত্যভিমান দূর করিতে তিনি উপদেশ দেন। এই বিষয়ে

বক্তা পূর্বে যাহা অনেকবার বলিয়াছেন এবং এখনও বলিতেছেন তাহা তাহারা স্মরণ রাখিবে।—সর্বপ্রকারের জাতিভেদ দূর করিয়া সকলকে এক "ভাঙ্গি" জাতিতে পরিণত হইতে হইবে এবং সকল হিন্দুই শুধু "ভাঙ্গি" বলিয়া অভিহিত হইতে গৌরব বোধ করিবে। নমঃশূদ্রদের প্রতিও ইহা প্রযোজ্য।

বাল্যবিবাহ দূর করিতে পারিলে স্বভাবতঃই বালবিধবা থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা খুব কম হইবে। সাধারণতঃ, তাঁহার মতে, পুরুষেরা জীবনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবে না এবং নারীও জীবনে দ্বিতীয়বার স্বামিবরণ করিবে না। তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীগণ প্রথামূলেই বাধ্যতামূলক বৈধব্যে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পুরুষের পক্ষে নিয়ম ঠিক বিপরীত। গান্ধীজী ইহাকে কলঙ্ক বলিয়াছেন, কিন্তু যতদিন সমাজ এই শোচনীয় অবস্থায় থাকে ততদিন বালিকা এবং তরুণী বিধবাগণের পুনর্বিবাহ তিনি সমর্থন করিয়াছেন। স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেই সমান, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তাহাদের সমান অধিকারের বিষয় চিন্তা করিতেন।

গান্ধীজীর পদব্রজে ভ্রমণকাহিনী হইতে

[হরিজন, ১৬-৩-'৪৭]

১০৬

সামাজিক সংস্কারে নারী

প্রশ্ন। আমাদের ভিতর যে অসংখ্য সামাজিক কুপ্রথা বর্তমান আছে তৎসম্বন্ধে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি যে আছে ইহা স্বীকৃত। কিন্তু পুরুষেরা যদি আবশ্যকীয় সামাজিক সংস্কার করিতে অনিচ্ছুক হয় তবে এতৎসম্বন্ধে নারীদের কর্তব্য কি?

উত্তর। নারীগণ পুরুষের অধীন অথবা পুরুষ হইতে নিম্নস্তরের—ইহা ভাবিবার তাহাদের কোন কারণ নাই। সকল ভাষাতেই উচ্চকণ্ঠে বলা হইয়াছে, নারী পুরুষের অর্ধাংশ এবং একই যুক্তিতে পুরুষও নারীর অর্ধাংশ। তাহারা দুইটি পৃথক বস্তু নহে, একই বস্তুর দুইটি সমান ভাগ। ইংরেজী ভাষা আরো অগ্রসর হইয়া নারীকে বলিয়াছে, "পুরুষের শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশ"। সেইজন্য সর্বপ্রকার অবাঞ্ছিত এবং অসঙ্গত বাধানিষেধের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ করিবার জন্য গান্ধীজী উপদেশ দিয়াছেন। বিধিব্যবস্থাদি সমাজের হিতজনক হইতে গেলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া চাই। শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহের ফলে কোন ক্ষতি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। পবিত্রতা এবং যুক্তিপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যতীত ইহা হইতে পারে না।

গান্ধীজীর পদব্রজে ভ্রমণকাহিনী হইতে

(হরিজন, ২৩-৩-'৪৭)

সমাপ্ত